অন্ধ যোদ্ধা

মঞ্জু সরকার

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সন্ত্রাস সমাজে আধিপত্য কায়েম করেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময় থেকেই। এবাদ ডাকাত এই আধিপত্যের একটি নাম। গ্রামের সরল এক মুক্তিযোদ্ধা রূপান্তরিত হয়েছিল দুঃসাহসী অন্ধ যোদ্ধায়। সর্বহারা এবাদবাহিনীর লিডার হিসেবে উত্তরবঙ্গের তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলে জীবন্ত কিংবদন্তীর মতো উত্থান ঘটেছিল এবাদ ডাকাতের। এ সময়ের শক্তিমান কথাশিল্পী মঞ্জু সরকারের দক্ষ হাতে 'অন্ধ যোদ্ধা' হয়ে উঠেছে যেমন সময়ের বিশ্বস্ত দলিল, তেমনি একজন এবাদ ডাকাতের উত্থান ও পতনের মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনী।

শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযানে গিয়ে বড়বাড়ির চৌকির নিচে এবাদ আবিষ্কার করেছিল পলাতক কিশোরী মুক্তাকে। মুক্তার আতঙ্ক-বিহ্বল রূপ মুহূর্তের জন্য ভাবান্তর এনেছিল হিংস্র ডাকাত-সত্তায়। বরাভয় দিয়ে ভালবেসে চুম্বন করেছিল এবাদ সেই অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরীকে।

আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের এই মধুর স্মৃতিকে ভুলতে পারে নি এবাদ। জেল থেকে বেরুনোর পর যুবতী মুক্তার প্রতিবাদী রূপ দেখে মুক্তার প্রেমে অন্ধ এবাদ মুক্তাকেই জীবনসঙ্গী করার জন্য জীবনকে বাজি রেখেছিল। সন্ত্রাসী কায়দায় মুক্তাকে অপহরণ এবং বিয়েও করেছিল। কিন্তু মুক্তা মেনে নিতে চাইলেও সমাজ কি মেনে নিতে পারে এমন অসঙ্গত জবরদস্তিমূলক মিলন ?

চোখ উপড়ে নেওয়ার পরও এবাদ ডাকাত তাই এখনও মুক্তাকেই খুঁজে বেড়ায়...

www.pathagar.com

অন্ধ যোদ্ধা

www.pathagar.com

অন্ধ যোদ্ধা

মঞ্জু সরকার

অন্যপ্রকাশ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০০

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

কম্পিউটার গ্রাফিক্স | লিটিল এম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৭০ টাকা

Andha Joddha | By Manju Sarker
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk 70 only

ISBN : 984-8160-97-3
www.pathagar.com

কথাশিল্পী মাহমুদুল হক
শ্রদ্ধাভাজনেষু

বসন্ত কুসুমের দিনে
বাসন্তি শুভেচ্ছাসহ
স্নেহাস্পদ
সোহেলকে
দুলাভাই
আলম
০১.১১.১৪০৬
১৩.০২.২০০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এবাদ ডাকাতকে দেখার জন্য গাঁয়ের মানুষ যেভাবে ছুটে আসছে, তা দেখে এবং বিস্মিত মানুষের ভয় ও কৌতূহলমাখা নানারকম মন্তব্য শুনে স্বয়ং এবাদও নিজ বাড়িতে দুর্ধর্ষ এবাদ ডাকাতের স্বাভাবিক জীবন দেখে অবাক হতে লাগল।

টগবগে যৌবনের আটটি বছর কেটেছে আন্ডারগ্রাউন্ডে এবং জেলখানায়। বাড়ির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার জন্য আজ যখন বাড়িতে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছে, ঘর-সংসারের অবস্থা আগের মতো স্বাভাবিক নেই আর। বউ ছিল এবাদের— শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী বউ। বিয়ের বছর না ঘুরতেই নতুন বউকে বাড়িতে রেখে সেই যে মুক্তিযুদ্ধে গেল এবাদ, দেশ স্বাধীন হবার পরও বউ নিয়ে নিরাপদ ঘর-সংসার করার সুখ জোটে নি আর। কারণ স্বাধীনতার বছর না ঘুরতেই খুন ও ডাকাতির আসামি হিসেবে পুলিশের খাতায় নাম উঠেছিল। তখন গ্রাম ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় ছিল না এবাদের। নিরপরাধ বউটিও স্বামীর ঘর-সংসার ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। একদিকে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর ভয়, অন্যদিকে শাশুড়ির অত্যাচার। বাপের বাড়ি থেকে আর ফিরে আসে নি। জেলে থাকতেই ছোট ভাই কোবাদের মুখে স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিল এবাদ। অকাল মৃত্যুর কারণ ও পটভূমি নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানতে চায় নি। অভিশপ্ত সংসার জীবনের একমাত্র সাক্ষী ও স্মৃতি হিসেবে একটি সন্তান রেখে গেছে। নানার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে ছেলেটা। ডাকাত পিতার সঙ্গে তার এখনো সাক্ষাৎ ঘটে নি।

সন্তান ছাড়াও দায়িত্ব পালনের জন্য বাড়িতে মা এবং ছোট ভাইবোন রয়েছে দু'টি। এবাদের অবর্তমানে ছোট ভাই কোবাদ শক্ত হাতে হাল ধরেছিল সংসারের। নিজের বোকামি কিংবা ভালমানুষি স্বভাবের জন্য বড় ভাইয়ের প্রাপ্য নির্যাতন কোবাদ ভোগ করেছে অনেকখানি। পঁচাত্তরে রক্ষীবাহিনী এবাদকে ধরতে না পারার আক্রোশ মেটাতে কোবাদকেও সর্বহারা এবাদ বাহিনীর একজন সদস্য ভেবে ধরে নিয়ে যায়। মা নিরপরাধ ছোট ছেলেকে বাঁচানোর জন্য জমি বিক্রি করেছে। দেওয়ানী মাতব্বরদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়াও নিজেই ছোটাছুটি করেছে থানা-পুলিশ এবং উকিলের কাছে।

ছোট বোন পেয়ারি নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছিল। ডাকাতের বোনকে কেউ বিয়ে করবে না, ডাকাত ভাই বোনকে কখনো বিয়ে দিতে পারবে না ভেবে প্রতিবেশী বাড়ির লজিং মাস্টারকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিল। ধরা পড়েছিল ইচ্ছে করেই। গঁয়ের লোকজন সমাজ রক্ষার জন্য সেই ছেলেকে ধরে বেঁধে বিয়েটা দিয়েছে। বিয়েতে কোবাদের খরচ হয় নি। কিন্তু ছেলের বাবা এবাদ ডাকাতের বোনকে ঘরে তোলা দূরে থাক, ছেলেকেও ত্যাজ্য করেছে। ফলে বোন ও তার স্বামী এবং তাদের অনাগত সন্তানকেও পালতে হচেছ। এতোসব ঝামেলার মধ্যেও কোবাদ লেখাপড়া বন্ধ করে নি। বি.এ পাশ করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে এখনও।

এবাদ জেল খেটে ঘরে ফেরায় মা যতটা না খুশি, দাগি আসামি ছেলের কারণে সংসার তছনছ হওয়ার দুঃখ এবং আতঙ্কটা প্রকাশ করে তারচেয়েও বেশি। এবাদের জন্যে দুই বিঘা জমি বেচতে হয়েছে। বাড়িভিটা ছাড়া যেটুকু সম্পত্তি টিকে আছে এখনও, এবার নিশ্চয় তাও

www.pathagar.com

ধ্বংস হবে। ভাইয়ের কারণে পথের ভিখিরি হবে কোবাদ। কারণ খুন-খারাবির পলিটিক্স করে ডাকাত হিসেবে এবাদের নাম দেশে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন ভালো মানুষ সেজে বাড়িতে শত বছর নামাজ রোজা পড়েও কি নামের কলঙ্ক ঘোচাতে পারবে এবাদ ডাকাত ? কখনো নয়। এবাদ জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে শুনে দলে দলে মানুষ দেখতে আসছে তাকে। অন্যদিকে চেয়ারম্যান, জোতদারসহ এলাকার ধনী গেরস্থরা সতর্ক হয়েছে। তোফাজ্জল চেয়ারম্যান নাকি এবাদের ভয়েই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে আবার । অতএব সন্দেহ নেই— এবাদকে জেলে ঢোকানোর জন্য নতুন করে চক্রান্ত করবে তারা। কোথাও চুরি-ডাকাতি হলে এক নম্বর আসামি হবে এবাদ ডাকাত। তার মানে আবার থানা পুলিশ, আবারো জেলজুলুম। ভালো হয়েছে বললেই কি এবাদ ডাকাতকে বিশ্বাস করবে কেউ ? আর ভালো মানুষ সেজে বাড়িতে বসে বসে এবাদ করবেই বা কী ? লেখাপড়া তেমন শেখে নি যে কোথাও চাকরি পাবে। সময় থাকতে হাল-গেরস্থালি কাজে মন দেয় নি। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করার পর এখন পরের ক্ষেতে কামলা খাটা ছাড়া এবাদ ডাকাতের আর উপায় কী ?

ডাকাত ছেলের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে মায়ের বগর বগর শুনে, তার মুখে সারাক্ষণ উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার ছায়া দেখে এবাদ বিরক্ত হয়। এক সময় মাকে ধমক দিয়ে বলে, এতো বছর পর বাড়ি ফিরে আসতে না আসতেই তুই কি আমাকে আবার বাড়ি ছাড়া করতে চাস মা ? তোর বগবগানির জ্বালায় খোদেজা এ-বাড়িতে টিকতে পারে নাই। একটা মাত্র নাতি, তাকেও নিজের কাছে রাখতে পারিস না তুই।

ডাকাত ছেলের কারণে গাঁয়ে এবাদের মা জান্নাতিরও কম বদনাম হয় নি। আড়ালে সবাই কটাক্ষ করে— যেমন ছেলে তেমন মা। সরাসরি 'ডাকাতের মা' বলেও সম্বোধন করে কেউবা। কাজেই ছেলের কারণে ভেতরে যত ক্ষোভ-দুঃখ সঞ্চিত ছিল, ছেলেকে নাগালের মধ্যে পেয়ে আজ তা বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়ে। যে এবাদকে দেখে ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় এলাকার ক্ষমতাবান পুরুষদের, চেলাকাঠ হাতে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না জান্নাতি। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে মুখ চালাতে হয় বলে হাতখানা অচল রাখে আপাতত।

ওরে ডাকাইতের বাচ্চা ডাকাইত! মায়া-ছাওয়ার জন্যে এলায় যে দরদ উছলায় ওঠে, ডাকাইতের দলে ভিড়ি সংসারটা তছনছ করার সময় তোর এত দরদ কোণ্ঠে ছিল রে হারামজাদা ? বেটার জন্যে তোর এত দরদ! ঠিক আছে, আজকেই তোর বেটাকে আনি দিম মুই। দেখিম, তোর বেটাকে নিজের কাছে থুইয়া কেমন মানুষ বানাইস তুই।

মায়ের অন্তর্দাহ এবাদের মনে পাল্টা ক্রোধ জাগায় না। হারানো স্ত্রী ও সন্তানের কথা ভেবে বুকের ভেতরটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। মায়ের কাছেও সে আজ ঘৃণ্য ডাকাত। বুকচেরা দীর্ঘশ্বাসে হতাশা ও অভিমান ঝরে যায়। কিন্তু ঝগড়াটে মেজাজ ও তর্জনগর্জনের আড়ালে মায়ের স্নেহসমুদ্র ঠিকই দেখতে পায় সে। ডাকাত ছেলেকে জেলমুক্ত করার জন্য জমি বেচতেও দ্বিধা করেনি মা। এবাদ তাই শপথ উচ্চারণের দৃঢ়তায় মাকে এবং নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, মোর কারণে সংসারে যত ক্ষতি হয়েছে মা; সুদেআসলে এবার তা সব পূরণ করে দেব আমি। চিন্তা করিস না তুই।

খুশি হওয়ার বদলে এবাদের মা আঁতকে ওঠে। চিৎকার করে সতর্ক করে ছেলেকে, ফের যদি চুরি-ডাকাতির পথে যাইস, নিজের হাতে তোকে জবাই করিম মুই। এই যে আল্লার কসম

www.pathagar.com

খাইনু মুই।

এবাদ হেসে বলে, মোর জন্যে নয়, তোর মেজাজখানের জন্যে মানুষে তোকে ডাকাইতের মা কয়। আমি যদি ডাকাইত হইতাম, সরকার কি আমাকে জেল থেকে মুক্তি দিত ?

কিন্তু চুরি ডাকাতি না করে টাকা রোজগারের জন্য এবাদ কী করবে ? মায়ের এ প্রশ্নের জবাব দেয় না সে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে গম্ভীর কণ্ঠে বলে শুধু, পালিয়ে থেকে আর কিছু করব না। যা করার এখন প্রকাশ্যেই করব।

এবাদের মা জান্নাতি বেগমের দুঃশ্চিন্তা তবু কমে না। এবাদ যখন পুলিশের কাছে ধরা দেয়, লোকজন খুশি হয়ে মন্তব্য করেছিল, জেল থেকে এবাদ আর কোনোদিন ফিরবে না। বিচারে তার যাবজ্জীবন জেল কিংবা ফাঁসি হবে। কিন্তু তিন বছর না ঘুরতেই এবাদ বুক ফুলিয়ে বাড়ি ফিরে এল। শত্রুদের মুখ চুন হয়েছে। কিন্তু যারা তাকে দেখার জন্য বাড়িতে ছুটে আসছে, সবাই কি তারা এবাদ ডাকাতের ভক্ত ? সামনাসামনি তার নিন্দা করে না কেউ। জেল খাটার পরও এবাদ ডাকাতের শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে অবাক হয় সবাই, মুখে প্রশংসা করলেও মনে মনে ভয় পায় নিশ্চয়। এবাদের অতীত কাণ্ডকীর্তি ও বর্তমান মতিগতি বুঝতে চায় লোকেরা। কিন্তু এবাদ অন্তরের কথা কাউকেই বলে না। মা হয়েও ছেলের মতিগতি বুঝতে পারে না জান্নাতি। অথচ কিছু না বুঝেও কতো কথা বলে গাঁয়ের লোকে!

অনেকের ধারণা, এবাদ ডাকাত আসলে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে হাত করেছে থানা-পুলিশকে। জেল থেকে শুধু ভয়ঙ্কর ডাকাত চেহারা নিয়ে ফেরে নি এবাদ, সঙ্গে গেপন অস্ত্র ছাড়াও নগদ টাকা-সোনা-দানা এনেছে প্রচুর। কারণ জেলে যাওয়ার আগে সারাদেশে বাছাই করা ধনীদের বাড়িতে ডাকাতি করেছে সর্বহারা এবাদ বাহিনী। ডাকাতির মাল, নগদ টাকা, সোনাদানা— সব কি আকালের সময় গাঁয়ের গরিবদের মধ্যে বিলিয়েছে এবাদ ? নিশ্চয় না। দলের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার পরও নিজের ভাগটা কোথাও জমিয়ে রেখেছে সন্দেহ নেই। আবার কেউ কেউ বলে, টাকা রোজগার এবাদ ডাকাতের আসল লক্ষ্য নয়। এলাকার কয়েকজন পুরনো শত্রুকে ক্ষতম করার জন্য গাঁয়ে ফিরেছে সে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এবং জেলে থাকার সময় যারা এবাদের মা-ভাই-বোনকে অপমান করেছে, এবাদ ডাকাত তাদেরকেও এবার উচিত শিক্ষা দেবে। এমনি আরো কত শত কথা যে কানে আসে জান্নাতি বেগমের। ঝগড়া করে ক'জনের মুখ বন্ধ করবে সে ?

ছেলেকে ফিরে পেয়েও তাই দুর্বোধা আশঙ্কায় জান্নাতির বুক কাঁপে। কখন যে আবার কোন অঘটন ঘটে কে জানে!

মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে দেশ স্বাধীন করে রাইফেল হাতে যেদিন বাড়িতে ফিরে এলো এবাদ, মুক্তিযোদ্ধা ছেলেকে দেখে গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। রাইফেল হাতে দলবল নিয়ে দিনরাত বাইরে ছোটাছুটি করত এবাদ। তবু ভয় ছিল না জান্নাতির। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই সম্মান করত। তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের মতো মান্যগণ্য মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের ওঠা-বসা। সেই চেয়ারম্যানের সঙ্গে একদিন রিলিফ নিয়ে ঝগড়া করে এবাদ হয়ে উঠল তার প্রধান শত্রু। লোকে বলে, চেয়ারম্যানের চক্রান্তে মুক্তিযোদ্ধারা অছির হাজিকে হত্যা করেছিল এবং বাড়ি ডাকাতি করেছিল তার। কিন্তু চেয়ারম্যান সব দোষ চাপিয়েছে এবাদের ঘাড়ে। অছির হাজির ছেলেকে দিয়ে মামলা ঠুকেছিল, এক নম্বর আসামী ছিল এবাদ। অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে এবাদকে মেরে ফেলারও চক্রান্ত করেছিল। বাধ্য হয়ে বাড়িঘর

www.pathagar.com

ছেড়েছিল এবাদ। গোপনে ডাকাতের দল গড়েছিল। সেই দলের নাম রেখেছিল সর্বহারা এবাদবাহিনী।

এবাদবাহিনী তোফাজ্জল চেয়ারম্যানকে মারতে পারে নি সত্য, কিন্তু তার মতো বহু রিলিপচোর চেয়ারম্যান ও শেখ মুজিবের দলের লোককে নাকি খুন করেছে। পুলিশের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছে। গরিবের শত্রু ধনী লোকদের বাড়ি ডাকাতি করে এবাদ নাকি চেঁচিয়ে নিজের পরিচয় দিতো— 'সর্বহারা এবাদবাহিনী জিন্দাবাদ'। ডাকাতির মাল গরিবের মাঝে বিলিয়ে দিতো। জান্নাতির ছেলেকে ডাকাত অপবাদ দেয়ার জন্য গাঁয়ের লোকজন এমনি কত শত যে গল্প করত! বিশ্বাস করতে চাইতো না সে। কিন্তু লোকের কথা সত্য না হলে এবাদকে ধরার জন্য পুলিশ ছাড়াও শেখ মুজিবের রক্ষীবাহিনী তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল কেন? পুলিশ সারা দেশ খুঁজেও তাকে ধরতে পারে নি। দূর-দূরান্তরে ডাকাতি ও খুনের খবর শুনলে লোকে বলত, নিশ্চয়ই এবাদবাহিনীর কাজ। শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হওয়ার খবর শুনে প্রতিবেশী বউ-ঝি অনেকেই বলেছিল, 'ও বাহে ডাকাইতের মাও, এ নিশ্চয় তোমার এবাদ বাহিনীর কাম।' কোথায় শেখ মুজিব, আর কোথায় ঠাকুর পাড়ার এবাদ ডাকাত! লোকে এবাদের নামে হাজার রকম অকথা-কুকথা বলে তাকে এমন ভয়ঙ্কর ডাকাত করে তুলেছে যে, পেটের ছেলের দিকে জান্নাতি নিজেও এখন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন চিনতে পারে না। অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপে তার।

জান্নাতির ধারণা, পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে এবাদ যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে। কোবাদকে ধরে নিয়ে গিয়ে রক্ষীবাহিনী বিনা দোষে তাকেও কম শাস্তি দেয় নি। তার একমাত্র অপরাধ ছিল— সে এবাদ ডাকাতের ভাই এবং ভাইয়ের হদিশ রক্ষীবাহিনীর কাছে সে বলতে পারে নি। এই অপরাধে মেরে হাড়মাস একাকার করে দিয়েছিল কোবাদের। পানি চাইলে পেসাব খেতে দিয়েছিল। এক মাস হাজত খেটে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। রক্ষীবাহিনীর নির্মম অত্যাচার এখনও তার মাথায় মাঝেমধ্যে অসহ্য ব্যথার মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নিরীহ কোবাদকেও সরকারি বাহিনী কিলিয়ে হাতের সুখ মিটিয়েছিল। ডাকাত সর্দার এবাদকে তারা কীরকম খাতির-যত্ন করেছে— কল্পনা করতে কষ্ট হয় নি গ্রামবাসীদের। কিন্তু জেলফেরত এবাদকে দেখে সবাই তাজ্জব। পুলিশের কিলগুতো খেয়ে ডাকাতটা আরো মোটাতাজা হয়েছে। দুঃখ-দুর্ভোগের কোনো চিহ্ন নেই শরীরে। বরং হাসি দেখলে এবাদকে আরো বেপরোয়া মনে হয়। জান্নাতি রাগ করে বলেছিল, পুলিশের ডাণ্ড আর পেশাব খায়াও হায়া হয় নাই তোর? এবাদ হেসে জবাব দিয়েছে, পুলিশ ডাণ্ডাবে কেন? পুলিশ আমাকে দেখলে সালাম দেবে। এবাদের এধরনের কথা ও হাসির রহস্য বুঝতে পারে না জান্নাতি। তার শুধু ভয় করে।

কোবাদ বার বার মাকে আশ্বস্ত করেছে, জেল থেকে বেরিয়ে ভাই অস্ত্র নিয়ে আগের মতো ডাকাতি করবে না। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে থাকতে হবে না আর। সরকারি দলের নেতা কোনো এক মেজরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে এবাদের। তার চেষ্টাতেই সব মামলা থেকে মুক্তি পাবে এবাদ। মুক্তি পাওয়ার পর এবাদ সরকারি দল করবে। এবাদ নিজ মুখে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তার সম্পর্কে কোবাদের দেয়া সব তথ্য বিশ্বাস করেছে জান্নাতি। কিন্তু ডাকাতের জীবন পরিত্যাগ করেও এবাদ যদি আবার দলাদলি করে বেড়ায়, সংসার চলবে কীভাবে? পরের উপকার করে বাকি জীবনটা কাটাবে ভালো কথা, কিন্তু তার নিজের পেটের ভাত আর বিড়ি-সিগারেট ফোঁকার পয়সা আসবে কোত্থেকে? এ প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে কোবাদও মায়ের

www.pathagar.com

মনকে শান্ত করতে পারে নি।

উড়নচণ্ডি স্বভাবের ছেলেকে সংসারি করে তোলার জন্য ম্যাট্রিক ফেল করার পরই বিয়ে দিয়েছিল জান্নাতি। কিন্তু সে বউ স্বামীকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারে নি। ডাকাত স্বামীর ঘর করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। আল্লা তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে তার পণ রক্ষা করেছে। এ বাড়ির একমাত্র বংশধরকে বাপের বাড়িতে রেখে গেছে বউটি। নানার বাড়িতে থেকে এবাদের ছেলে নানা-নানীর এমন ন্যাওটা হয়েছে যে, বংশের কাউকে আর আপন ভাবতে পারে না। জান্নাতি নাতিকে নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঐটুকু ছেলে দাদিকেও ডাকাত ভাবে, কাছে ঘেষার বদলে নানীর কাছে ছুটে পালায়। এ বাড়িতে থেকে এবাদের ছেলে কি ডাকাত পিতাকে মানুষ বানাতে পারবে ? নাকি ডাকাত বাপ পারবে ছেলেকে মানুষ করতে ? জান্নাতি মনে ভরসা পাওয়ার আগেই কোবাদ অবশ্য ছুটে গেছে ভাইয়ের ছেলেকে নিয়ে আসার জন্য।

বাড়িতে ফিরে আপন সন্তানকে দেখামাত্র চিনতে পারে এবাদ। না চেনার চমক নিয়ে তবু চেঁচিয়ে ওঠে, এইটা কে ? ও মা, এই ছেলে কে ? হ্যাঁ, কী নাম তোমার ?

বাবাকে দেখে বালকটি চাচার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। গা-মাথায় লোকটার আদরের জবাবে কাঠ হয়ে দঁড়িয়ে থাকে। চোখে জ্বলজ্বলে ভয়।

এবাদের মা ও ভাই-বোনেরা বাপ-বেটার মিলন উপভোগের জন্য উৎসাহ যোগায়। একের কাছে অপরের বিস্তারিত পরিচয় দিতে থাকে। সোহরাবের বয়স আট হয়েছে। মোল্লা নানার কাছে কায়দা পড়া শিখেছে। নামাজ রোজা করে, আবার স্কুলেও যায়। দফের মোল্লা ভাটির দেশের মানুষ, বাড়িঘর করার ত্রিশ বছর পরও এই এলাকার স্থানীয় ভাষা বলতে পারে না এখনও। কিন্তু সোহরাব এরই মধ্যে নানার দেশের ভাষা-ভঙ্গি ভাল শিখেছে। বাপের কথা শুনেও সে এবাড়িতে আসতে চায় নি। কোবাদ ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে।

সন্তানের দিকে তাকিয়ে মৃত স্ত্রীর মুখ দেখতে পায় এবাদ। সোহরাব-রোস্তম পালা দেখার স্মৃতি স্মরণ করে ছেলের নাম রেখেছিল সে সোহরাব। কিন্তু সোহরাব যোদ্ধা পিতার চেহারা ও স্বভাব কোনোটাই পায় নি। মায়ের মতো লাজুক ও রুগ্ন হয়েছে ছেলেটি।

বউ-বাচ্চাকে শেষবার একত্রে দেখার স্মৃতি মনে পড়ে এবাদের।

সোহরাব তখন দু'আড়াই বছরের শিশু। শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে খোদেজা বাপের বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছিল। বহুদিন পর স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে রাত কাটাবার অদম্য পিপাসা নিয়ে, ধরা পড়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও, এক রাতে চোরের মতো শ্বশুরবাড়ির আঙিনায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবাদ।

ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ি তখনও জেগে ছিল। কিন্তু বাড়িতে জামাইয়ের উপস্থিতি ঘোষণা শুনে মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের কথাবার্তার আওয়াজ। রাত নয়টাতেই মধ্যরাতের স্তব্ধতা গ্রাস করে নিয়েছিল বাড়িটাকে। এবাদ স্ত্রী ও সন্তানের নাম ধরে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেছে, ভদ্রভাবে দরজাও ধাক্কা দিয়েছে— খোদেজা তবু সাড়া দেয় নি। ভীত-সন্ত্রস্ত শাশুড়ি সাড়া দিয়েছিল প্রথম।

আপনে কেডা গো ? এত রাইতে ডাক পাড়েন ক্যা ? হায় আল্লা জামাই! পুলিশ আপনেরে ধরবার লাইগা আমাগো বাড়িতেও আইছিল, জলদি পলায় যান।

www.pathagar.com

জামাইকে বাড়িতে স্বাগত জানাতে আপত্তি ও ভয়ের কারণ বুঝতে পেরেছিল এবাদ। হেসে অভয় দিয়েছিল, পুলিশ আসার কথা আমি জানি আম্মাজান। পুলিশ আর এ গ্রামে আসবে না অন্তত এক মাসের জন্য। খোঁজ-খবর নিয়েই এসেছি আমি। রাতটা আজ এবাড়িতেই থাকব।

দরজা খুলে প্রথমে বেরিয়ে এসেছিল এবাদের শ্বশুর দফের মোল্লা। ভয়ে কিংবা রাগেও হতে পারে, কম্পিত কণ্ঠে সাফ সাফ জবাব দিয়েছিল সে।

না বাপু, তুমি এই দণ্ডে চইলা যাও। এবাড়িতে আর কুনোদিন আইস না তুমি।

আব্বাজান এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? বললাম তো পুলিশ আসবে না।

থানা-পুলিশের লগে আমাগো চৌদ্দ পুরুষের কুনো সম্পর্ক আছিল না। তোমার কারণে পুলিশ আমার বাড়িতেও ঢুকল। বেগানা পরিবারের মুখ দেখল। আবার কতো হুমকি ধামকি দিল। ঘুষ না পাইলে আমার নির্দুষ মাইয়াটারেও ধইরা নিয়া যাইত। পুলিশরেও আমি শেষ কথা কইয়া দিছি— স্যার, এবাদ যদি আমার মাইয়ারে তালাক না দেয়, তবে কোর্ট কাছারি কইরা আমার খোদেজাই তারে তালাক দিব। তবু ডাকাইত স্বামীর ঘর করব না আমার মাইয়া।

পিতার ঘোষণার আগেই খোদেজা সম্ভবত স্বামীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। তাই স্বামীর মুখ দেখতে কিংবা নিজের মুখ দেখাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নি। অথচ তার কোলে এবাদের সন্তান। সন্তানের মুখ না দেখেই ফিরে যাবে এবাদ ? বিয়ের পরপরই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়েছিল। বিয়েতে ডিমান্ড হিসেবে জামাইকে সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও দেয়ার কথা। কিন্তু বিয়ের পর শুধু ঘড়িটা পেয়েছিল এবাদ। বাকি দেনাপাওনা নিয়ে এবাদের মা ছেলের শ্বশুর, শাশুড়ি এবং বউকেও যথেষ্ট কথা শুনিয়েছে। তবে জামাই নিজে ডিমান্ড পূরণ না হওয়ায় স্ত্রী বা শ্বশুরের সঙ্গে কটূক্তি করে নি কখনো। জামাইকে সাইকেল দিতে পারে না যে শ্বশুর, ঠেলায় পড়ে তার পুলিশকে ঘুষ দেয়ার দুঃখটাও এবাদ বোঝে। কিন্তু তা বলে আঙিনা থেকে জামাইকে তাড়ানোর দুর্ব্যবহার সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি সে। দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিয়েছিল, আপনি আমার মুরব্বি মানুষ। এবাদ ডাকাইতের বউ-বাচ্চা কাইড়া নিতে চায়, এমন কথা আর কেউ কইলে তারে উচিত শিক্ষা দিতাম আমি।

হ্যা-আ-আ! কী করবা তুমি ? আমারেও কি খুন করতে চাও ?

চিল্লা-হাল্লা করবেন না। আজ রাতটা আমি এবাড়িতে বউ-বাচ্চার সাথে কাটাব। ব্যবস্থা করেন, না হইলে ভাল হবে না বললাম।

নিজে খুন হওয়ার ভয়ে না যতটা, তার চেয়ে বেশি জামাইয়ের মেয়ের সঙ্গে শোয়ার বেশরম ইচ্ছে দেখেই সম্ভবত, লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দফের মোল্লা। কোনো ভাল মানুষ জামাই শ্বশুরকে এমন নির্লজ্জ প্রস্তাব দিতে পারে ? শাশুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার স্বামীকে বাঁচানোর জন্য। জামাই-আদর দেখিয়ে এবাদকে ঘরে আহবান করেছিল, আসেন বাবা, ঘরে আপনার পোলা বউ ঘুমায় রইছে। পুলিশ দেইখা আপনের হউরের মাথার বেরেন আউলায় গেছে গা।

ঘরে ঢুকে বিছানায় ঘুমন্ত স্ত্রী-সন্তানকে একত্রে দেখতে পেয়েছিল এবাদ। সোহরাবের প্রকৃত ঘুম সারারাতেও ভাঙ্গে নি। ভোরবেলা বিদায় নেয়ার আগে ঘুমন্ত সন্তানের কপালে চুমু দিয়েছিল সে।

www.pathagar.com

বাবার আদর এবং বাবাকে দেখার স্মৃতি নিশ্চয় মনে নেই সোহরাবের। কিন্তু মায়ের কথা বোধহয় এখনও ভুলতে পারে নি সে। মাকে হারানোর শোকেই কি ছেলেটা এমন শুকিয়ে গেছে ? বাবাকে দেখেও মুখে বিন্দুমাত্র খুশির আভা নেই, সরাসরি তাকাতেও লজ্জা পাচ্ছে সে।

এবাদ জিজ্ঞেস করে, আমারে কোনো দিন দেখ নাই ?

সোহরাব মৃদু মাথা নেড়ে 'না' বলে। চাচার কাছে চুপি চুপি জানতে চায়, আমার লাইগা কি আনছে ?

কোবাদ হেসে ভ্রাতুষ্পুত্রের জিজ্ঞাসা ফাঁস করে দেয় এবং জানায় যে, মেলা কিছু পাওয়ার লোভ দেখিয়েই তাকে এবাড়িতে আনতে পেরেছে সে। এবাদ ছেলেকে বুকে তুলে নেয়। ছেলের স্পর্শ পেয়েই যেন কান্নার মতো কী একটা ভারী জিনিস গলতে চাইছে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কথা বলে সে, কী নেবা বাবা তুমি ? তোমার নতুন জামা-প্যান্ট, চকলেট, বিস্কুট সব দেব আমি। এখন থেকে তুমি এবাড়িতে আমার কাছে থাকবা। এবাড়ি থেকে স্কুলে যাবা।

সোহরাব বাবার কোল থেকে নামার জন্য ছটফট করে। ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকায়। তারপর বাবার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ামাত্র হঠাৎ ছুটে পালায়। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পিছু ফিরে বলে, ডাকাইতের বাড়িতে আমি থাকুম না। তাইলে পুলিশে আমারেও ধইরা লইয়া যাইবো। আমি নানার বাড়িতে থাকুম।

পলায়নপর সোহরাবকে ধরার জন্য কোবাদ হেসে পিছু ছোটে। কিন্তু এবাদ গম্ভীর হয়ে বাধা দেয়, এখন যাউক নানার বাড়ি। সময় হলে ওকে নিয়ে আসব আমি।

রাতে খেতে বসলে মা আবার নাতির প্রসঙ্গ তুলে আক্ষেপ করে, আহারে! সোহরাবটা কতোদিন বাদে বাড়ি আসিয়াও খালি মুখে গেল। চ্যাংড়াটাকে এক ঠোলা বিস্কুট কিনি দিতে পারলি না ? বাপ বেটাকে কিছুই দেয় নাই শুনলে ওর নানা-নানী এলা কী কইবে ?

এবাদ জবাব দেয় না। মুক্তি পাওয়ার পর এরই মধ্যে জানা হয়েছে তার, সে গ্রামে ছিল না কিন্তু এবাদ ডাকাতের নাম লোকের মুখেমুখে ছিল। কেবল নিজের এলাকার ধনী-গেরস্থরা নয়, সর্বহারা এবাদ বাহিনীর নামে আতঙ্কিত ছিল জেলার তাবত ধনী শ্রেণীর মানুষ। নিজের অজান্তে এত বড় বিখ্যাত একজন ডাকাত হয়েছে এবাদ, অথচ সন্তানকে বিস্কুট কিনে দেয়ার পয়সা নেই তার পকেটে আজ। আগামীকাল ছোট ভাইয়ের কাছে হাত না পাতলে সিগারেট খেতে পারবে না। মায়ের কথা মতো— দু'সের চাল মজুরি পাওয়ার জন্য পরের ক্ষেতে কামলা খাটা ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই এবাদের। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার মাশুল দিতে গিয়ে এই বাস্তবতা কি মেনে নিতে পারবে সে ? মন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, অসম্ভব। বহুদিন পর, নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় চুলার পাড়ে পিড়িতি বসে আপনজনদের সঙ্গে শুধু পাটশাক আর ঠাকড়ি কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ার স্বাদ অমৃত সমান ঠিকই, কিন্তু এবাদ জানে, এই স্বাভাবিকতা তার বেশিদিন ভাললাগবে না। কারণ জেলখানায় রাজবন্দির মর্যাদায় নিয়মিত ডিম-মাছ-গোসত খাওয়ার পর বাড়ির একঘেয়ে গরিবি খাবার সে মানিয়ে নিতে পারবে হয়তো, কিন্তু এবাদ ডাকাতের শরীরে সইবে না।

তাছাড়া নিজেকে সর্বহারা গ্রুপের নেতা ঘোষণা করেছিল সে দারিদ্রকে মেনে নেয়ার জন্য নয়। বিপ্লবী রাজনীতি বোঝার আগেও ধনী-গরীবের বৈষম্য অসহ্য লাগত। শেখ মুজিব

www.pathagar.com

বলেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র হবে। কিন্তু স্বাধীন দেশে তার দলের লোকের লুটপাট, অন্যদিকে গরিবের না খেয়ে মরার দৃশ্য অনেক দেখেছে এবাদ। গরিবের পক্ষে ন্যায্য কথা বলার কারণে তোফাজ্জল চেয়ারম্যান তাকে জেলে ঢোকানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছিল। আত্মগোপন করে বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নবজন্ম ঘটেছিল এবাদের। অতঃপর শ্রেণীশত্রু খতম এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার জন্য একের পর এক অপারেশনে খুন-ডাকাতি করাটা হয়ে উঠেছিল এবাদের জন্য স্বাভাবিক পথ। তার অনেক অপারেশনের খবর খবরের কাগজে বেরিয়েছে। এর মধ্যে 'দুঃসাহসিক ডাকাত' শিরোনামে একটি খবর নিজেও পড়েছে এবাদ। সেই খবরে তাকে সর্বহারা দলের সদস্য হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এরপর প্রতেকটা সফল অপারেশনে সর্বহারা এবাদ বাহিনী হিসেবে নিজের দলকে নিজেই চিনিয়ে দিয়েছিল এবাদ। জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তার নতুন রাজনৈতিক দলের নেতা মেজর ইকবালের সঙ্গে যোগাযোগ এবং যথাসময়ে আত্মসমর্পণ না করলে রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা পাওয়া দূরে থাক, এতদিনে হয়তো প্রকৃত সর্বহারা কিংবা ডাকাত দলের হাতে জান খোয়াতে হতো স্বঘোষিত সর্বহারা এবাদবাহিনীর লিডার এবাদকে।

খেতে খেতে যখন পুরনো দিনের স্মৃতি-ভাবনা মনে উঁকি দেয়, হঠাৎ দূরে কোথাও মোটরযানের আওয়াজ শুনে খাওয়া বন্ধ করে এবাদ। আণ্ডারগ্রাউন্ড-জীবনে যেমন বাতাসে বিপদের গন্ধ শুঁকত, পদশব্দে চমকে উঠত সহসা, তেমনি অজানা বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সে। ছোট ভাই কোবাদের কাছে জানতে চায়, কীসের আওয়াজ রে ?

কোবাদ সহ আঙিনার সবাই কান পাতে, কিন্তু এবাদের মতো চমকে ওঠার মতো কোনো আওয়াজ কারো কানে ধরা দেয় না। জান্নাতি বলে, কই কোষ্ঠে কীসের আওয়াজ শুনলু ?

মোটর সাইকেল নিয়া কে আইসে ?

উৎকর্ণ স্তব্ধতা চিরে মোটর সাইকেলের ক্রমঅগ্রসরমান আওয়াজ এবার সবাই শুনতে পায়। এবাদের প্রশ্নের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শঙ্কা ছিল, তা মায়ের কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ফের পুলিশ আইসে নাকি ?

পুলিশ আসবে কেন ? স্বগত প্রশ্নের সদুত্তর ঠাণ্ডা মাথায় খোঁজার অবকাশ পায় না এবাদ। মোটারসাইকেলখানা তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে, সম্ভবত এবাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। ছোট ভাইকে জরুরি আদেশ দেয় সে, দেখ বাইরে গিয়ে কে আসছে।

জান্নাতি আতঙ্কিত কণ্ঠে বাধা দেয়, না। মনে হয় পুলিশ আসতোছে। গতবার তোর বদলে কোবাদকে ধরি নিয়া গেছিল। জামাই, তোমরা বারায় দেখতো বাবা পুলিশ আইল নাকি ?

জান্নাতির ঘরজামাই ভাতের থাল আঁকড়ে ধরে কম্পিত গলায় বলে, আম্মাজান, ভাইজানের বদলে পুলিশ যদি আমাকেও ধরে ?

এবাদ ভাতের থালে পানি ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, পুলিশ না কে দেখ জলদি। অচেনা কেউ আমাকে খুঁজতে আসলে বাড়িতে আছি চট করে বলার দরকার নেই।

বাড়ির খুলিতে মোটর সাইকেলের আওয়াজ এবং আলো থেমে গেলে এবাদ গা ঢাকা দেয়ার জন্য যখন আঙিনার কোণে সরে যায়, তখন বাইরে থেকে পরিচিত কণ্ঠ ভেসে আসে, কোবাদ আলি বাড়িতে আছিস নাকি ? তোর ভাইয়ের সঙ্গে দেখ করতে চেয়ারম্যান সাব নিজে আসল। এবাদ নাই বাড়িতে ?

www.pathagar.com

কোবাদ বাইরে ছুটে যায় এবং ফিরে এসে ভাইকে অভয় দেয়— তাদের গ্রামের সুরেশ বাবু এবং ইউনিয়নের নতুন চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন এসেছে। অতিথিদের বসার জন্য ঘরের চেয়ার টেবিল আঙিনায় বিছিয়ে দেয় কোবাদ।

পলতাক জীবনে ঘুমে জাগরণে সারাক্ষণ সতর্ক থাকার পুরনো অভ্যাসে এবাদ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল সশস্ত্র শত্রুদের উপস্থিতি কল্পনা করে। কিন্তু এবাদের ভয়ে যাদের পালিয়ে থাকার কথা, দেখা করার জন্য তারা এবাদের কাছে ছুটে আসবে, এতটা ভাবতে পারে নি সে। সুরেশ বাবু বিশেষ পরিচিত হলেও শামসুদ্দিন চেয়ারম্যানের সঙ্গে তার তেমন আলাপ-পরিচয় নেই। স্থানীয় শ্রেণীশত্রুদের উপস্থিতি মনে যে ভয় জাগিয়েছিল, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কিংবা হতে পারে ভয় দেখানোর পাল্টা প্রতিশোধ নিতে এবাদ ঠাট্টার ভঙ্গিতে কথা বলে, শিকার নিজেই ধরা দেয়ার জন্য শিকারীর কাছে ছুটে আসে— এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার! আমি তো জেলে থাকতেই টার্গেট করে রেখেছি, মুক্তি পাওয়ার পর আমাদের সুরেশ কাকা আর নতুন চেয়ারম্যানের বাড়িতে হানা দেব প্রথম। তার আগেই আপনারা আমার বাড়িতে এসে হাজির। মতলব কী বাহে কাকা ?

হামাকে শিকার করো আর অস্বীকার করো, তোমাকে আমি কখনও পর ভাবি নাই এবাদ। তোমর বাপ সামাদ ভাই আমাকে আপন বড় ভাইয়ের মতো জ্ঞান করতো। এবাদ বাহিনী যখন আমার বাড়ি ডাকাতি করল, আমি কি তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের মতো কেস দিছিলাম তোর নামে ? দেই নাই। তুই জেলে যাওয়ার পর কোবাদ আলীকে যতটা পারি, সাহায্য করার চেষ্টা করছি। কী বাহে কোবাদ, আমি কি মিথ্যে কথা বলতেছি ?

কোবাদ ও তার মা কিছু বলার আগে শামসুদ্দিন চেয়ারম্যান গলা খাকারি দেয়। কথা বলে এবাদের দিকে তাকিয়ে, আসলে তোমার সাথে দেখার করার হাউস আমার অনেক দিন থেকে। যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন তোমরা, তখনও তোমার সাথে একবার সাক্ষাত করার চেষ্টা নিছিলাম। তোমার মুক্তির খবর শুনিয়া তাই বাবুকে সাথে নিয়া আমি নিজেই ছুটি আসলাম এবাদ।

তা এবাদ ডাকাইতকে দেখার এত হাউস কেন চেয়ারম্যান সাহেবের ?

হাউস নয় খালি, এটা আমার দায়িত্ব। চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে ইউনিয়নের সব মানুষ এলাও চেনে না, কিন্তু সর্বহারা এবাদ ডাকাইতের সুনাম মুল্লুক জুড়ে। মুক্তিযোদ্ধা সর্বহারা এবাদ তো আমার কাছে ডাকাইত নয়, সে আমাদের এলাকার গর্ব। তাছাড়া সর্বহারা এবাদ না থাকলে আমিও চেয়ারম্যান হইতাম না, তোফাজ্জল ভূঁইয়াও নয় হাজার ভোটের ব্যাবধানে ডিবিট খাইত না। কী কন দাদা ?

শামসুদ্দিন চেয়ারম্যানকে সমর্থন করার জন্য সুরেশ বাবু ছাড়াও এবাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কয়েকজন আঙিনায় এসে জড়ো হয়েছে। জেল থেকে ফিরতে না ফিরতেই এবাদের বাড়িতে মোটর সাইকেল ছুটে আসার রহস্য খুঁজতেই ছুটে এসেছে তারা। কিন্তু চেয়ারম্যানকে দেখে, তার কথা শুনে গত ইলেকশন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে সবাই।

এবাদ ভোটের রাজনীতি কখনও করে নি। ভোটযুদ্ধের সময় গ্রামে উপস্থিত ছিল না সে। শামসুদ্দিন চেয়ারম্যানের কথা শুনে মনে ধন্ধ জাগে। কথার আড়ালে অতিথিদের আসল মতলব ধরার চেষ্টা করে সে। এলাকার দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির মুখে আপন ক্ষমতা ও খ্যাতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শুনতে খারাপ লাগে না। তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের সঙ্গে তার বিরোধের

www.pathagar.com

পরিণতিতে মানুষটা এখনও জানে বেঁচে থাকলেও, তার প্রতিপত্তি কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শেখ মুজিব ও তার দলের অন্ধ সমর্থক সুরেশ রায় এবাদের মনে নতুন সন্দেহ জাগায়।

ও বাহ কাকা, আপনি নতুন চেয়ারম্যানকে নিয়ে আসলেন। কিন্তু আপনার পুরনো দোস্ত তোফাজ্জল ভুঁইয়াকে ছাড়ি আসলেন যে! তাকে দেখার আমারও খুব হাউস।

ওই শয়তানটার কথা আমাকে আর কইস না বাবা। ওই খবিজ তোকে যেমন গ্রামছাড়া করিছে, আমাকেও তেমনি দেশছাড়া করার বহু ষড়যন্ত্র করছে।

কিন্তু আমি তো শুনেছি শেখ মুজিবকে উৎখাতের খবর শুনিয়া কাঁদতে কাঁদতে আপনারা ইন্ডিয়া পালাবার জন্য রেডি হইছিলেন। গ্রামে না থাকলেও আপনাদের সবার খবর আমি রাখতাম কাকা।

শেখ মুজিব নিহত হবার খবর শুনিয়া আমি কাঁদিছি— খবরটা সত্য এবাদ। তোর বাহিনীর লোকেরা তোকে ভুল খবর দেয় নাই। কিন্তু পাকিস্তান ভাঙার জন্য খালি হিন্দুরাই কি মুজিবের নৌকায় ভোট দিছে ? মুজিবের নামে তোমরাগুলো মুক্তিযুদ্ধ করেন নাই ? মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর মুজিব হিন্দুদের কি বিশেষ সুবিধাটা দিছে বল। মুজিবের শাসন আমলে আমার বাড়ি কতবার চুরিডাকাতি হইল, আকালের সময় আমার মতো গেরস্ত পর্যন্ত পেট ভরা ভাত খাইতে পারে নাই। মুজিব উৎখাত হবার পরই বরং দেশটায় শান্তি ফিরে আসছে।

শামসুদ্দিন চেয়ারম্যান সুরেশ বাবুর কথা কেড়ে নিয়ে মন্তব্য করে, শেখ মুজিব বাকশাল গড়িয়া দেশের সমস্ত টাকশাল দখল করতে চাইছিল। আর কয়েক বছর সে ক্ষমতায় থাকলে খালি সুরেশ বাবু নয়, হামাকেও দেশ ছাড়ি পালাইতে হইত। আর তা না হইলে জালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবাদ বাহিনীতে নাম লেখাইতে হইত। ঠিক সময়ে প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতা নিয়া রক্ষা করছে দেশটাকে।

জিয়া নিজে দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করছে। দেশের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের টানটাই আলাদা।

যেমন হামার এবাদ। মানুষ তাকে ডাকাইত কয়, কিন্তু আমি মানুষকে কই এবাদ ডাকাইতই হইল আসল মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীন করার পরও রিলিপচোরদের খতম করার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে সে।

এই ধরনের প্রশস্তি ও রাজনৈতিক আলাপচারিতার আড়ালে আগন্তুকদের আসল স্বার্থ বুঝতে পারে না এবাদ। মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে মনে যে ভয়টা জেগেছিল, সেই ভয়টা মনে আবার ফিরে আসে। কারণ এবাদের হাতে এখন অস্ত্র নেই, দল নেই, পকেটে সিগারেট ফোঁকার মতো পয়সা নেই এবং তার সামনে অপেক্ষা করছে প্রকৃত সর্বহারার হতদরিদ্র জীবন। দুর্ধর্ষ এবাদ ডাকাতের এই পরিণতি দেখলে শত্রুপক্ষ এবাদকে আর ভয় পাবে না। তোয়াজ করতে বাড়িতেও ছুটে আসবে না আর। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কথা বলে সে।

চেয়ারম্যান সাহেব দেখছি আমার অনেক খোঁজখবর রাখেন, কিন্তু আমার একটা প্রতিজ্ঞার কথা বোধহয় জানেন না।

কী সেই প্রতিজ্ঞা ?

লোকে আমাকে ডাকাইত ভাবুক, আর মুক্তিযোদ্ধা বলুক, সর্বহারাদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত

www.pathagar.com

আমার লড়াই থামবে না।

কিন্তু আমরা যে শুনলাম সরকারি দলে নাম লিখিয়েছে এবাদ। সে কারণে সরকার তাকে এত জলদি মুক্তি দিয়েছে।

সরকার জেলে আমাকে রাজবন্দির মর্যাদা দিয়েছে। এখনও যদি সেরকম মর্যাদা দেয়, সাধারণ মানুষের পক্ষে থাকে, তাহলে অবশ্যই সরকারকে সাপোর্ট করব। সরকার বিরুদ্ধে গেলে এ সরকারকেও উৎখাত করার জন্য আমার বাহিনী অস্ত্র নিয়া লড়াই চালাবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে টার্গেট করতে না পারি, কিন্তু আমাদের কিছু পুরনো শ্রেণীশত্রুকে তো খতম করতে পারব।

ওসব খুন-খারাপির পলিটিক্স এবার ছাড়ি দে এবাদ। শুনলেও আমার ভয় লাগে।

ভয়! ভয় যে কী জিনিস কাকা, সেইটাই এখনও বুঝলাম না। বউ-সংসার ফেলে রেখে যেদিন মুক্তিযুদ্ধে গেলাম, সেদিনই জীবনের মায়া ত্যাগ করেছি আমি। তারপর আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলাম, দল করলাম, জেলও খাটলাম। জেলে বেশ আরামেই ছিলাম বাহে। এখন মনে হইতেছে, তাড়াতাড়ি দুই-চারটা খুনখারাপি করি আবার আগের জীবনে ফিরে যাই।

তোমাকে আর আমরা জেলে যাইতে দেব না, গ্রামছাড়াও হইতে দেব না এবাদ। তুমি আমাদের যাই ভাব, তোমাকে আমাদের দরকার আছে।

দরকারি কথাটাই কিন্তু এখনও কইলেন না চেয়ারম্যান সাহেব।

কথা অবশ্য আর একটা আছে। কিন্তু সেটা সবার সামনে বলা যাবে না। চলো একটু বাইরে চলো। চলেন বাবু, উঠি আমরা।

কোবাদের আনা পান-সুপারি খেয়ে এবাদকে নিয়ে বাইরে যায় তারা। খুলির অন্ধকারে মোটর সাইকেলের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ারম্যান চাপা স্বরে কথা বলে, জেল হইতে সরাসরি বাড়িতে ফিরেছ, নিশ্চয় হাতখালি। সেই জন্য ভাবলাম যাই একটু, এবাদের খোঁজখবর নিয়া আসি। এই টাকাটা এখন রাখ এবাদ।

কেন টাকা দিচ্ছে চেয়ারম্যান, এবাদ জানতে চায় না, অবাকও হয় না। সন্তানের শুকনো মুখ চকিতে মনে পড়ে। টাকাটা হাতে নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে সে, যাক, এবাদ ডাকাতকে খালি হাতে দেখতে আসেন নাই। আপনার কাণ্ডজ্ঞান আছে চেয়ারম্যান সাহেব। আমি তো ভাবছিলাম কিছু টাকার জন্য সুরেশ কাকার কাছে যাব।

তোকে যেতে হবে না হারামজাদা, আমি নিজেই দিয়ে যাব। চেয়রাম্যানকে তো সেই জন্যেই আজ টানি আনলাম।

খুশি হইলাম কাকা। চেয়ারম্যান সাহেব, আপনার মোটরসাইকেলখানও একদিন দিতে হবে। ভয় নাই, একদিন পরেই ফেরত পাবেন।

একদিন কেন, এক মাসের জন্য নিলেও তোমার জন্য কোনো না নেই এবাদ। যখন যা দরকার, আমাকে বলিও।

বিদায় নেয়ার আগে চেয়ারম্যান হাত মেলায়। সুরেশ বাবু এবাদের গা-মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ জানায়। তারপর ভয় ধরানো মোটর সাইকেলখানা এঁকেবেঁকে যেন নিজেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অতিথিদের নিয়ে পালাতে থাকলে এবাদের মুখের হাসি প্রসারিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

অনেক বছর পরে, রাতে নিজের বাড়িতে শুয়েও এবাদের ঘুম আসে না। চোর-ডাকাতরা অবশ্য রাতে কাজ করে, দিনে ঘুমায়। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পর এবাদও নিয়মটা মানতে শুরু করেছিল। দিনের বেলা ক্যাম্পে ঘুমাত, রাতে বের হতো গেরিলা অপারেশনে। জেলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়মটা প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবাদের। কিন্তু জেলে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে, মুক্তি পাওয়ার পর পুকুরচুরি, লুটপাট, রাহাজানি যাই করুক, সামাজিক ও স্বাভাবিক মানুষের মতো দিনের বেলাতেই সব করবে এবাদ। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাবে। এ জন্যে চাকরি, ব্যবসা ও সরকারি লাইসেন্স পারমিট যোগাড়সহ নানা ধরনের উপায়ের কথা ভেবেছিল সে। কিন্তু আজ চেয়ারম্যান-বাবুরা বাড়িতে এসে সর্বহারা এবাদ ডাকাতকে নগদ সেলামি দিয়ে সম্মান দেখানোর পর, এবাদের পুরনো পরিচয়টা মনে প্রবল হয়ে ওঠে। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ফেরারি জীবনের নানা ছবি।

নিজের এলাকায় বড় ধরনের অপারেশনে একবার মাত্র এসেছিল এবাদ। সঙ্গে ছিল পনের জনের সশস্ত্র বাহিনী। পয়লা লক্ষ্য ছিল চেয়ারম্যান তোফাজ্জল ভূঁইয়া ও তার দোসর সুরেশ রায়কে খতম এবং তাদের বাড়ি লুট করা। প্রস্তুতি ও আক্রমণ পরিকল্পনার মধ্যে কোনো খুঁত ছিল না। কিন্তু গোটা বাড়ি তছনছ করেও সে-রাতে প্রধান শত্রু তোফাজ্জল ভূঁইয়াকে খুঁজে পায় নি এবাদ। তবে নিজের প্রতিহিংসা ও আত্মপরিচয়ের স্বাক্ষর প্রবলভাবে রেখে গিয়েছিল নিজের এলাকায়। বিশেষ করে সজনা গাঁয়ের তোফাজ্জল ভূঁইয়ার বাড়িতে।

তিন ভাইয়ের ঘর-সংসার একই ভিটায় অবস্থানের কারণে ভূঁইয়াদের বাড়িটি বেশ বড়। বড় বাড়ি কিংবা চেয়ারম্যানের বাড়ি বলে গাঁয়ের লোকজন। অপারেশনের সময় চেয়ারম্যান যাতে বাড়ি থেকে কোনো দিক দিয়ে পালাতে না পারে, সেজন্য বাড়ির সব প্রবেশ-পথ, আঙিনা ও অন্য কয়েকটি ঘরের দরজায় পাহারা বসিয়েছিল এবাদ। বাড়িতে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চত হয়েই অপারেশনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করেছিল সে। আর রিলিফচোর মিথ্যাবাদি তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের মৃত্যু ঘোষণা দু'বছর আগেই দিয়েছিল এবাদ। মিথ্যে খুনের মামলার আসামি হিসেবে গ্রাম ছাড়ার সময় প্রকাশ্যে শপথবাণী উচ্চারণ করেছিল, স্বাধীন দেশে তোফাজ্জল চেয়ারম্যান হবে মুক্তিযোদ্ধা এবাদের প্রথম টার্গেট। মৃত্যুভীতি তোফাজ্জলের বুকে খোদাই করে রাখার জন্য স্বনামে চিঠি পাঠিয়েছিল এবাদ, 'মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে নে তোফাজ্জল। মঙ্গলবার রাতে আজরাইল তোর বাড়িতে যাবে।' দু' বছর আগে লেখা চিঠিখানার কথা স্মরণ করে অপারেশনের সময় মঙ্গলবার রাতই ঠিক রেখেছিল এবাদ।

দরজা ভাঙার আগে নির্দিষ্ট ঘরে তোফাজ্জল ভূঁইয়ার উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল এবাদ। হত্যা করে রাস্তার ধারে গাছে লটকে রাখার ইচ্ছেটি কার্যকর করার জন্য মাথাটিও ছিল বেশ ঠাণ্ডা। কারণ চেয়ারম্যানের সঙ্গে পুরনো শত্রুতার সম্পর্কটি ততদিনে রাজনৈতিক ভিত পেয়েছে। ফেরারি জীবনে এক সর্বহারা কমিউনিস্ট নেতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়ে বিপ্লবী রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল এবাদের। মার্কস-লেনিন, চারু মজুমদার-সিরাজ

www.pathagar.com

শিকদার, রাশিয়া ও চীনের সমাজতন্ত্র, বাঙলাদেশের সামাজিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে শোনা কথাগুলো নিজের মতো করে আওড়াতে পারত, এমনকি মাও সে তুং-এর দু'তিনটি কোটেশন মন্ত্রের মতো মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে শুধু তোফাজ্জল চেয়ারম্যান নয়, তার দল, নেতা ও ক্ষমতাসীন সরকারকে সর্বহারার শ্রেণীশত্রু ভাবতে এক সেকেন্ডও চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল না আর। শ্রেণীশত্রু খতম করার জন্য দীর্ঘদিনের সাধনায় নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলেছিল সে। অনেকগুলো অপারেশনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর টার্গেট করেছিল পুরনো শত্রু তোফাজ্জল চেয়ারম্যানকে। এ কারণে দরজা ভাঙার আগে এবাদ চেঁচিয়ে আত্মপরিচয় ঘোষণা করেছিল— তোফাজ্জল ভূঁইয়া, সর্বহারা এবাদ বাহিনী তোর দোরাগাড়ায়। বাঁচতে চাইলে দরজা খুলে বেরিয়ে আয়।

জবাব পাওয়ার আশা করে নি এবাদ। গোটা বাড়ি আরো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঢেঁকিঘর থেকে তুলে আনা ঢেঁকিটি দিয়ে চারজন মিলে দরজায় দু'বার আঘাত করতেই ভেঙে পড়েছিল দরজা। তখন ঘরের ভেতরে নারী ও শিশু কণ্ঠের তীব্র চিৎকার— ও আল্লারে... বাঁচাও বাহে... আগান বাহে... এবাদ ডকাইত হামাক মারি ফেলাইল রে...। অন্যদিকে এবাদ ডাকাত দলের হুঙ্কার— চোপ। কোথায় চেয়ারম্যান?

টর্চের আলোয় ঘরের অন্ধকার তঝনছ করেও শিকার খুঁজে পায় না এবাদ। ঘাড়ের কাঁটা রাইফেল উঁচিয়ে চেয়ারম্যানের স্ত্রীর কাছে এবাদ নিজে জানতে চায়, বল, তোর স্বামী কোথায়? নইলে সবাইকে গুলি করবো। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও ভয়ে কম্পমান মহিলা জোর গলায় মিথ্যে গল্প বলে, উনি বাড়িতে নাই। সকালে টাউনে গেছে, রাতে আর ফেরে নাই।

তারপরও এবাদের হাতের টর্চ খাটের তলায়, আনাচে-কানাচে, ঘরের টিনের বেড়ায়, ছাদে ও যত্রতত্র অন্ধকার ফালাফালা করে শিকার খোঁজে। চৌচালা টিনের ঘরটার ওপরে অর্ধেক অংশ জুড়ে বাঁশের চাটাই বানানো হালকা ছাদ। চেয়ারম্যানের মতো একজন ভারি মানুষ যে চোখের পলকে সিঁড়িবিহীন সেই ছাদে ইঁদুরের মতো উঠতে পারে এবং ছাদের মাঝখানে মড়ার মতো শুয়ে থাকতে পারে, চিন্তাটা মাথায় একবারও আসে নি। সে রাতে আল্লা তার বান্দার জান বাঁচাবে বলেই হয়তো সন্দেহটা ডাকাত দলের মাথায় ঢুকতে দেয় নি। ছাদে মাকড়সার জাল দেখে এবাদ ভাবে, চেয়ারম্যান নিশ্চয় অন্য ঘরে পালিয়ে আছে। সঙ্গী দু'জন চেয়ারম্যানের স্ত্রীর কাছে চাবি নিয়ে আলমারি ও বাক্সের তালা খুললে, এবাদ ছুটে যায় অন্য ঘরে।

বাড়িতে মুখোশধারী সশস্ত্র দাকাত দলের উপস্থিতির খবর ততক্ষণে বড়বাড়ির প্রত্যেক ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। গ্রামবাসী লোকজনের ছুটে আসা ঠেকাতে এবাদ বহিনীর গাদা বন্দুক বিকট আওয়াজ করেছে খুলিতে। দলের প্রত্যেকের তৎপরতা আবারও নিস্তব্ধ করে দিয়েছে গোটা বাড়িকে। মূল শত্রুকে হত্যা করতে না পারার ব্যর্থতা পুষিয়ে নিতে বড়বাড়িকে সর্বশান্ত করার জন্য নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ও দামি জিনিসপত্র লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দলের সবাই। কিন্তু দলনেতা হিসেবে এবাদ তখনও মরিয়া হয়ে শিকার খুঁজছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস, বড় বাড়িরই কোনো না কোনো ঘরে লুকিয়ে আছে শয়তানটা।

চেয়ারম্যানের ছোট ভাই মোফাজ্জল ভূঁইয়ার ঘরে ঢুকে এবাদ তার কাছে অগ্রজের সন্ধান চায়। জানি না— জবাব শুনে তার পাছায় লাথি কষে মারে, হুমকি দেয়, বল তোর চেয়ারম্যান ভাই কোথায় লুকিয়ে আছে। বল, নইলে তোকেই আজ খতম করব শালা। মোফাজ্জল ভূঁইয়া হাউমাউ করে কাঁদে, এবাদের পা জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে প্রাণে মারেন

www.pathagar.com

না ভাই, ওই শয়তানের খবর আমি জানি না। জানলে নিজে ধরায় দিতাম। এরপর মোফাজ্জল ভূঁইয়া ও তার ঘরের ধন-সম্পদ দলের অন্য দু'জন সদস্যের জিম্মায় রেখে এবাদ ছুটে যায় ছোট তরফ— আফজাল ভূঁইয়ার ঘরে।

দু'বার লাথি মারতেই দরজা খুলে যায় বাড়ির পশ্চিম দিকের টিনের ঘরটির। ভেতরে আফজাল ভূঁইয়া বা অন্য কোনো পুরুষ মানুষ ছিল না। টেবিলের ওপর হারিকেন জ্বলছিল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা সশস্ত্র ডাকাত সর্দারকে দেখেও আফজাল মিয়ার স্ত্রী অদ্ভুত রকম শান্ত। ঘুমন্ত শিশুকে বুকে নিয়ে আলমারির সামনে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আলমারির পাল্লা খোলা। সাত-আট বছরের একটি মেয়ে ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে। ডাকাতকে চেয়ে দেখার সাহস পর্যন্ত নেই তার। কিন্তু বউটি যেন ডাকাতকে স্বাগত জানিয়ে কথা বলে, ভাই, আমার স্বামী চাকরি করে, টাউনে আমাদের বাসা— সেখানেই আমাদের সবকিছু। এখানে আমাদের কিছুই নাই।

আফজাল ভূঁইয়ার স্ত্রীর খালি কান, গলা, হাত, খোলা আলমারি এবং মিষ্টি কথা মনে খচখচে সন্দেহ জাগায়। তীব্র এবং বিকৃত কণ্ঠে হুঙ্কার দেয় এবাদ, চেয়ারম্যান কোথায়?

উনি তো মাঝখানের বড় ঘরটায় থাকেন। আমাদের সাথে তার শত্রুতা। জমিজমার ভাগ ঠিক মতো দেয় নাই। আবার মামলাও করেছে। ওনাকে মাঝখানের বড় ঘরটায় খোঁজেন।

বড়বাড়ির মধ্যে ছোট মিয়ার বউ শুধু দেখতে সুন্দর নয়, চালাকচতুরও বটে। কিন্তু মুগ্ধ হওয়ার বদলে এবাদের সন্দেহ প্রবল হয়ে ওঠে। প্রধান শত্রু না থাকুক, নেয়ার মতো দামি জিনিসপত্র এ ঘরে নিশ্চয় যথেষ্ট আছে। সেই জন্যে আলমারি আগলে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। কিংবা আলমারি খুলে ইতিমধ্যে দামি জিনিসপত্র অন্যত্র সরিয়েছে, বন্ধ করারও সময় পায় নি। হাতের পাঁচ ব্যাটারির লম্বা টর্চ তুলে এবাদ সহিংস কণ্ঠে ধমক দেয়, 'যা মাগী, তোর ভাসুরকে খুজে বের কর। না হলে তোর ভাতারকেও খতম করব।

পিঠে টর্চ লাইটের গুতো দিয়ে আণ্ডাবাচ্চাসহ আফজালের বউকে বাইরে বের করে দেয় এবাদ। টর্চের আলো ঘরের চারদিকে ঘুরে খোলা আলমারিতে স্থির হয়। আশ্চর্য, আলমারিটা একেবারের ফাঁকা! স্নো-পাউডারের কৌটা, শিশি-বোতল, খাতা— এ ধরনের কিছু ফালতু জিনিসপত্র। ঘরে ডাকাত ঢোকার আগে মহিলা নিজের সম্পদ নিজেই ডাকাতি করেছে নাকি? তোফাজ্জল চেয়ারম্যানও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। দীর্ঘ অপেক্ষা, প্রস্তুতি ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান চালিয়েও জীবনের প্রধান শত্রুকে আজও শেষ করতে পারল না। ব্যর্থতার আক্রোশ নিয়ে এবাদ চেয়ারম্যানের ঘরে আগুন দেয়ার কথা ভাবে। কিন্তু বড় বাড়িতে আগুন জ্বাললে দশ গ্রামের মানুষ রৈরৈ করে ছুটে আসবে। আজ রাতের পরবর্তী অপারেশনও ব্যর্থ হবে। আগুন দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করলেও এবাদ অন্তরের হিংস্র আগুন দমাতে পারে না। টেবিলের জ্বলন্ত হারিকেনটা সজোরে উঠানে ছুড়ে দেয়। অন্ধকার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে, ঘরের কোথাও উহ গোছের চাপা আর্তনাদ শুনে ঘুরে দাঁড়ায় সে। হাতের লাইট দ্রুতগতিতে চারদিক ঘোরে।

নিচু হয়ে খাটের নিচে লাইট ফোকাস করতেই চমকে ওঠে এবাদ। দুই হাঁটু ও হাতের ওপর ভর দিয়ে বেড়ালের মতো ঘাপটি মেরে আছে একটি মেয়ে। তার পাশে কাপড়চোপড়ের একটি বড় পোটলা। আলোর ঝলকানিতে মেয়েটা আর্তনাদ করে এবং এক হাতে মুখ ঢেকে ধরে। মুখে আড়াল রচনার আগেই তার সুন্দর মুখের শ্রী এবং জ্বলজলে চোখ দেখে এবাদের

www.pathagar.com

ভেতর যে চমক সৃষ্টি হয়েছিল, মেয়েটি মুখ ঢাকার পরে সেইরকম চমক এবাদকে কাঁপিয়ে দেয়। কেননা মেয়েটির ভিন্নতর এক সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পায় সে। মাটিতে উবু হয়ে থাকায় মেয়েটার মাথা, মুখ, চিবুকের মতো গায়ের ফ্রকটিও নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। ফলে গলার নিচে দুই স্তনের মাঝ দিয়ে সুড়ঙ্গপথ তৈরি হয়েছে। এক হাতে মুখ ঢাকার পর সুড়ঙ্গ পথটি আরো প্রশস্ত হয়ে ওঠে। এবাদের টর্চের আলোয় মেয়েটির বক্ষদেশ এতটা নগ্ন হয়ে পড়ে যে, কচি ফলের মতো ঝুলন্ত স্তন দু'টি, স্তনের খয়েরি বোঁটা পর্যন্ত দেখতে পায় সে। দেখে ডাকাত সর্দার এবাদেরও বুকে অদ্ভুত শিহরণ জাগে। কোনো মেয়ের বুকের সৌন্দর্য এভাবে দেখার সুযোগ পায় নি আগে, স্ত্রীর বুকও এমন স্পষ্টতায় দেখে নি কখনও।

খাটের তলায় হাত বাড়িয়ে এবাদ মেয়েটির হাত ধরে। মেয়েটি তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার অঙ্কুরেই স্তব্ধ করে দেয় এবাদের ধমক, চোপ।

অতপর খুব টানা-হ্যাঁচড়া করতে হয় না। খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটি অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং আকুল ফরিয়াদ জানায়, আমাকে মারবেন না প্লীজ। খাটের তলায় আম্মু যা রেখেছে, সব নিয়ে যান।

এবাদ টর্চ জ্বালে। পা থেকে মুখ পর্যন্ত আলোয় উদ্ভাসিত মেয়েটির খোলা বুক এবং চুল দেখে যত বড় মনে হয়েছিল, মেয়েটি আসলে তত বড় নয়। কিশোরী বলা চলে। শক্ত মুঠোয় বন্দি হাতখানা থেকে তার শরীরের থরথর কম্পন ও উষ্ণতা একই সঙ্গে টের পায় এবাদ। আলোর ঝলকে চোখ বন্ধ হলেও কিশোরীর কাঁপা কণ্ঠ থেকে আতঙ্ক ঝরে পড়ে, আমাকে মারবেন না প্লীজ।

ভয় নেই। তোমাকে মারব না। কে তুমি ?

আমি মুক্তা। আফজাল সাহেবের বড় মেয়ে।

তোমার চেয়ারম্যান জ্যাঠা কোথায় পালিয়েছে ?

আমি জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

এবাদ তবু কিশোরীর হাত ছাড়ে না। শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেলে যে প্রতিহিংসা বুকে তোলপাড় করে, সেরকম এক আবেগ লকলক করে জেগে উঠছে। বুক ধকধক করছে এবাদের। অথচ মেয়েটিকে নিয়ে সে কী করবে ভেবে পায় না। এক হাতে তার হাত ধরে, অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। চোখ বন্ধ করে মেয়েটি ডাকাতের শাস্তি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে আর হাঁপাচ্ছে। জামা ফুড়ে জেগে ওঠা কচি বুক ওঠানামা করছে দ্রুত। আলো মুখ থেকে নিচে নামতেই মেয়েটি আবার চোখ খোলে। কান্নার গলায় অনুনয় করে, আমাদের যা আছে সব নিয়ে যান। আমাকে ছেড়ে দিন প্লীজ।

ভয় নেই মুক্তা। তোমাকে মারব না। তোমাকে... তোমাকে... আমি ভালবাসব।

অপারেশনে এসে মেয়েদের শ্লীলতাহানি দলে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবাদ। কিন্তু মুক্তাকে অভয়দানের মধ্যেও তার আদর্শবাদ যেন টলে যায়, মুক্তাকে ভালবাসার চাপা ইচ্ছে নিজের কানেও কেমন যেন বিকৃত শোনায়। আর মুক্তার চোখ আতঙ্কে নাকি বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয় কে জানে। ডাকাতের কালো মূর্তির দিকে অপলক তাকায় সে।

তোমাদের কিছুই নেব না। তোমাকে শুধু একটু আদর করব। ঠিক আছে ?

www.pathagar.com

এবাদের ফিসফাস প্রস্তাবের জবাবে মুক্তা মৃদু মাথা নাড়ে। হাতের আলো নিভিয়ে এক টানে মুখোশ সরিয়ে ফেলে এবাদ। মুক্তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু দেয়। এই সময়ে বাইরে কারো কণ্ঠে মরণ চিৎকার শুনতে পায় এবাদ, আগান বাহে... ডাকাইত... ডাকাইত... মুক্তাকে ছেড়ে দিয়ে এবাদ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

হুইসেল বাজিয়ে সংকেত দেয় দলের সবাইকে। মিনিট খানেকের মধ্যে বাড়ির বাইরে এসে জড়ো হয় দলের সবাই। স্তব্ধতা চিরে গাদা বন্দুকের বিদায়ী আওয়াজ ওঠে— গুম। তারপর মকবুলের স্লোগানের সাথে গলা মেলায় সবাই, সর্বহারা এবাদ বাহিনী— জিন্দাবাদ। দুনিয়ার সর্বহারা— এক হও। রিলিপ চোর— খতম করো।

বন্দুকের আওয়াজ, ডাকাত-পড়া বাড়ির লোকজনের ত্রাহি চিৎকার এবং এবাদ বাহিনীর স্লোগানের আওয়াজ শুনেও গাঁয়ের একটি মানুষও চেয়ারম্যানের বাড়িতে ছুটে আসে নি। অথচ পলাতক খুনের আসামি এবাদ নিজের নতুন পরিচয় সাড়ম্বরে প্রকাশের জন্য এলাকায় ফিরে এসেছিল। এলাকাবাসীর কাছে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার গরজ ও সাহস এতেটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, প্রথম দিনের বেলায় চেয়ারম্যানের বাড়ি আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল সে। এই সময় চেয়ারম্যানকে ঘিরে রাখত সর্বহারা শ্রেণীর শত শত লোকজন। তারা রিলিপ চায়। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামের কাজ চায়। স্বাধীনতার তিন বছর না ঘুরতেই তখন কার্তিকমাসী মংগা চরম আকার ধারণ করেছে। দেড় দুই টাকা সেরের চাল দশ টাকা হয়েছে। গাঁয়ের সচ্ছল গেরস্তদেরও তখন পেটে পাথর বাঁধার দশা। সরকারি রিলিপ পাওয়ার জন্য চেয়ারম্যান-মেম্বারদের পিছে পিছে ঘোরাটা হয়ে উঠেছিল অনেকের জন্য বাঁচার একমাত্র পথ। রিলিপচোর তোফাজ্জল ভূঁইয়াকে খুন করার জন্য সময়টা ছিল অনুকূল। প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে খুন করে, রিলিপ না পাওয়া অসংখ্য বুভূক্ষ মানুষের জন্য চেয়ারম্যানের গোলাঘর খুলে দেয়ার কথা ভেবেছিল সে। কিন্তু তার আদেশ মেনে চেয়ারম্যানবাড়ি লুট করার বদলে যদি রিলিপপ্রার্থী মানুষের ভিড় সর্বহারা এবাদ বাহিনীর অপারেশনে বাধার সৃষ্টি করে? বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডারদের এই আশঙ্কা এবাদের মনে প্রবল হয়ে উঠলে দিবালোকে এলাকায় আত্মপরিচয় প্রকাশের পরিকল্পনা বাতিল করেছিল সে। তবে এলাকায় এবাদ বাহিনীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রচারের জন্য স্থানীয় আরও সাতজন যুবককে দলে নিয়েছিল এবাদ। অভিযানে অংশ নিয়ে তাদের দায়িত্ব ছিল বড়বাড়ি এবং সুরেশ বাবুব ধানের গেলা লুট করা এবং লুণ্ঠিত ধানচাল গোপনে অনাহারী মানুষদের মাঝে বিতরণ করা।

শক্র খতম না হলেও সেই রাতের অভিযান সফল হয়েছিল। লুটের মাল নিয়ে চেয়ারম্যান-বাড়ি থেকে ফেরার পথে কোনো বাধা পায় নি এবাদ বাহিনী। সাত জনের মাথায় ছিল ধানচালের সাতটি বস্তা। বাহিনীর মূল সদস্যের প্রত্যেকের কাছে সহজে বহনযোগ্য দামি জিনিসপত্র। চেয়ারম্যান ও সুরোশ বাবুর বাড়ি ডাকাতির পর আস্তানায় পৌছে লুণ্ঠিত টাকা, সোনা, ঘড়ি, রেডিও, দামি শাল, শাড়ি, এমনকি হাতের আংটিটা পর্যন্ত দলের লিডারের কাছে জমা করেছিল সবাই। কিন্তু এবাদ পুরনো শক্রর বাড়ি থেকে যে অমূল্য মুক্তাটি এনেছিল, তার ভাগ দলের কাউকে দেয় নি। মুক্তাকে পাওয়ার সাধ স্মৃতি একান্ত নিজের জন্য সঞ্চয় করেছিল। দলের কাউকে কথাটা বলে নি পর্যন্ত। দলের প্রত্যেকে বিশ্বাস করত, শোষক শ্রেণীর ধনসম্পদ নিজের জন্য সঞ্চয়ের বদলে শোষিত সর্বহারাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে এবাদ বেশি আনন্দ পেত। অপারেশনে গিয়ে নগদ টাকা, বা দামি জিনিসপত্র হাতানোর

www.pathagar.com

বদলে শত্রু নিধনকে অধিক গুরুত্ব দিত। আর মেয়েমানুষের ইজ্জত লুট করাটা তার কাছে ক্ষমাহীন অপরাধ। একাত্তরের ঘৃণ্য পাকবাহিনীর উদাহরণ দিয়ে নিজস্ব বাহিনীর চরিত্র ও আদর্শ অটুট রাখতে সর্বদাই সজাগ থাকত এবাদ।

তোফাজ্জল ভূঁইয়াকে খুন করতে গিয়ে তার অচেনা ভাইঝিকে ভালবাসার ইচ্ছেটি নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর মনে হয় এবাদের। অথচ ডাকাতি শেষে বড়বাড়ি থেকে বেরুনোর পর সেই চুমুর স্বাদ ও স্মৃতি বুকের ভেতর প্রতিক্রিয়া শুরু করেছিল । সজনা থেকে নিজগ্রাম ঠাকুরপাড়া সুরেশ বাবুর বাড়ি গন্তব্য ছিল তাদের। দুই মাইল মাত্র পথ। পথ ছেড়ে ফাঁকা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল তারা। মাথার ওপর শরতের পরিষ্কার আকাশ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল চরাচর। চাঁদের দিকে তাকিয়ে খাটের তলায় লুকানো মুক্তার মুখ ও বুকখানা মনে পড়েছিল। ঘনঘন ঠোঁট চাটছিল এবাদ। সুরেশ বাবুর বাড়ি পৌছার আগে বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিল সে, আসল শত্রু পালিয়েছে। আজ রাত্রে আর কারও রক্ত ঝরাবে না। বাবুর বাড়ির ধানচাল টাকা পয়সা লুট করে গ্রামের সর্বহারাদের মাঝে বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করে জলদি বিদায় হবে তারা।

ঘনবসতি ও রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে হাঁটলেও এবাদ বাহিনীকে সেই রাতে গাঁয়ের অনেকেই দেখতে পেয়েছিল। চাঁদনী রাতে তাদের পরনের পোশাক, কালো মুখোশ, ঘাড়ে ঝোলানো রাইফেল-বন্দুক, হাতে লম্বা টর্চ ও চকচকে রাম দা, চাপাতি এমনকি ডাকাত দলের নেতা এবাদকেও নাকি কেউ কেউ স্পষ্ট দেখেছে। দুই সারি হয়ে হাঁটছিল তারা। এবাদ ছিল একদম সামনে। সংখ্যায় ছিল তারা বিশ থেকে একশো জনের মধ্যে— একেকজন একেকরকম দেখেছে। অথচ নিজের গ্রামে ঢুকেও পথে পরিচিত কাউকে দেখতে পায় নি এবাদ। মাঠে প্রাকৃতিক কর্ম করতে এসে কাছে থেকে শুধু দেখেছিল একজন। ভূত দেখার আতঙ্ক নিয়ে সে ছুটে পালিয়েছে। পরিচিত এক বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ায়ার সময় চেনা কণ্ঠে হাঁক উঠেছিল, কে যায় ? কোন মানুষ বাহে ? জবাব না পেয়ে মুহূর্তেই বোবা হয়ে গিয়েছিল লোকটা।

সুরেশ বাবুর বাড়িতে ঢুকে দরজা ভাঙতে হয় নি। সজনায় চেয়ারম্যান বাড়িতে গুলির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বাবুর। লোকমুখে খবর শুনে মূল্যবান মালপত্রসহ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। দরজা খোলা এবং জনশূন্য ছিল বড় ঘরটি। অন্যান্য ঘরে লোকজন যারা ছিল, বাধা দেয়ার বদলে তারা বরং ডাকাত দলকে সহযোগিতা করেছে। হুকুম দেয়া মাত্র গোলাঘর খুলে দিয়ে নিজেরা সব গোয়াল ঘরে ঢুকে গরুদের সঙ্গে মিলেমিশে চুপচাপ ছিল অপারেশনের পুরো সময়টা।

নির্বিঘ্নে লুটপাট চালাবার পর, মধ্যরাতের নিস্তব্ধ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে এবাদ বাহিনী যথারীতি ফাঁকা গুলির আওয়াজ করেছে। আত্মপরিচয় ঘোষণা করে সমবেত কণ্ঠে স্লোগান দিয়েছে। এবাদের নাম শুনেও পরিচিত কেউ দেখার জন্য এগিয়ে আসে নি। বাড়ির কাছাকাছি এসেও মাকে দেখার জন্য নিজের বাড়িতে ঢোকার সাহস হয় নি এবাদের। নিজের গোপন নিষিদ্ধ জীবনের সঙ্গে পরিবারকে কোনোভাবে জড়াতে চায় নি সে। কোবাদের ওপর বিপদ নেমে আসতে পারে ভেবে, গাঁয়ের বিশ্বস্ত লোকজনের সঙ্গেও যোগাযোগ করে নি। সেই একবার মাত্র নিজের এলাকায় অপারেশন চালিয়েছে এবাদ। কিন্তু স্বাধীনতার পর এলাকায় যত বড় ধরনের চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই হয়েছে, সেএইসব দুষ্কর্মের সঙ্গে এবাদবাহিনীকে জড়িয়ে গাঁয়ের লোক বিখ্যাত করে তুলেছে এবাদ ডাকাতকে।

www.pathagar.com

তোফাজ্জল ভুঁইয়াকে খতমের অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার পর, দ্বিতীয় অপারেশনের পরিকল্পনা করার আগেই নিজের জেলা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবাদ। কারণ দলের এক সশস্ত্র ক্যাডার ধরা পড়ায় কিংবা ধরা দেয়ায় তিস্তার চরের গোপন আস্তানা আর নিরাপদ ছিল না। পুলিশ ছাড়াও এবাদ বাহিনীকে খুঁজে বের করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল রক্ষী বাহিনী। নিজের এলাকা ত্যাগের আগে, স্ত্রী-সন্তানকে শেষ দেখা দেখার জন্য, জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বাইসাইকেলে চেপে শশুরবাড়ি গিয়েছিল সে।

অনেকক্ষণ হাঁকডাকের পরও খেদেজা স্বামীকে স্বাগত জানাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে নি। একদিকে পুলিশ ও অন্যদিকে ডাকাত জামাইয়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত শ্বশুর আঙিনা থেকে বিদায় দিতে চেয়েছিল জামাইকে। কিন্তু বউ-বাচ্চাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছেটা এমন জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, শ্বশুরকেও হুমকি দিতে বাধেনি। অবশেষে শাশুড়ি ডাকাত-জামাইকে জামাই আদর দিয়ে ঘরে তুলেছিল।

আসলে জামাই-মেয়েকে একত্রে থাকতে দেয়ার মতো আলাদা ঘর ছিল না দফের মোল্লার। বাড়িতে একটি মাত্র টিনের ঘর— যার একদিকে বাঁশের মাচানে ধান-চালের ডুলি, হাঁড়ি-পাতিলসহ নানারকম সাংসারিক জিনিসপত্র; অন্যদিকে পাশাপাশি দুটি চৌকি। একটি বিছানায় ঘুমে বেহুশ ছিল এবাদের শিশুপুত্র। পাশে তার মা খোদেজা। শ্বশুরের সাথে এবাদের কথা কাটাকাটি শুনেও খোদেজার মরঘুম দেখে এবাদ অবাক হয়েছিল। মেয়ের সাথে রাত কাটাবার সুযোগ করে দিতে শাশুড়ি কাঁথা-বালিশ নিয়ে চলে গিয়েছিল বাইরে। আর এবাদ ঘরে ঢোকার পর দফের মোল্লা ঘরে ঢোকে নি একবারও।

দরজা বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে বউ-বাচ্চার পাশে শুয়ে পড়েছিল এবাদ। বউকে ফিসফাস স্বরে অনেক কথা বলেছিল, কোনো কথার জবাব দেয় নি খোদেজা। প্রথমে এক হাতে, পরে দ'হাতে আস্তে এবং জোরে অনেকক্ষণ ধাক্কাখাক্কি করেছিল। তবু ঘুম ভাঙেনি খোদেজার। পাথরের মতো স্থির ও শক্ত করে রেখেছিল শরীর। তখন সহসা ভয় জেগেছিল এবাদের মনে— দফের মোল্লা যদি রাতে চুপিচুপি পুলিশকে গিয়ে খবর দেয়? যদি নিজের গ্রামের লোকজনকে ডেকে বাড়ি ঘিরে ফেলে? ভয়মুক্ত হওয়ার জন্য খোদেজার শরীর আঁকড়ে ধরেছিল এবাদ। ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের মতো চেপে ধরেছিল তার শরীর। এক ঘণ্টা ব্যবধান দু'বার। খোদেজা শুধু চাপা আর্তনাদ করেছে। তার চোখের লোনা জলে ঠোঁট গাল-নাক-মুখ ভিজিয়ে শান্ত হয়েছিল এবাদ। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন জানে না সে।

খুব ভোরে পিঠে খোদেজার ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। স্বামীর উদ্দেশে দুটি মাত্র কথা উচ্চারণ করেছিল খোদেজা, পালাও। পুলিশ আসবে।

বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্র কোমরে গুঁজে দ্রুত চোরের মতো শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। বেরুনোর আগে, ঘুমন্ত সোহরাবের কপালে বিদায় চুম্বন এবং তার পাশে কিছু টাকা রেখেছিল। স্ত্রীকে বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পায় নি। সাইকেলে ওঠার আগে, অনিশ্চিত ভবিষৎতের আশঙ্কা কিংবা প্রচণ্ড অভিমান থেকেও হতে পারে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল শুধু, আমি আর আসব না রে খোদেজা। আর বোধহয় দেখা হবে না।

স্ত্রীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি মনে করে এবাদ আজ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। জেলে বসে খোদেজার কথা ভেবে নিজেকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলার স্বপ্ন দেখত এবাদ। মুক্তি পাওয়ার পর রাজনীতি, দলবাজিতে নিজেকে জড়াবে না আর। ঘোরতর সংসারী হবে, বউ-বাচ্চাকে ঘিরে

www.pathagar.com

আবর্তিত হবে তার দিন-রাত। এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়বে এবাদ। কিন্তু ডাকাত স্বামীর এমন রূপান্তরে বিশ্বাস করা দূরে থাক, তার জেল থেকে বেরুনোর সম্ভাবনাও খোদেজা কল্পনা করে নি হয়তো। সংসারে সুখ-শান্তি না পাওয়ার মনোবেদনা নিয়েই কবরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এবাদ কোথায় আশ্রয় নেবে আজ? বাইরে, তথা সমাজে পাকাপোক্ত আশ্রয় পাওয়ার জন্য সে দলবল কৌশল খুঁজে পাবে হয়তো, কিন্তু ঘরে শূন্য বিছানায় কোনো নারীর কোমল বুকে আশ্রয় পাবে কি কখনও?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই বড়বাড়িতে দেখা কিশোরী মুক্তার মুখ স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। জেলবাসের সময়েও মেয়েটার কথা মনে পড়েছে। কেন— এবাদ ঠিক জানে না। তাকে চুমু খাওয়ার স্মৃতিটা ছিল যেন দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় চাটনির মতো। মনে পড়লে ঠোঁট চাটত এবাদ। ঘৃণ্য শত্রু তোফাজ্জল ভূঁইয়াকে খুন করতে না পারার জ্বালা জুড়াতে তার সুন্দরী ভাইঝি ছিল যেন একমাত্র সান্ত্বনা। মেয়েটাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে সামান্য চুমুতে সীমিত থাকার জন্যে নিজের ওপর রাগ জাগতো কখনোবা। রাতের অন্ধকারে শত্রুকে খুন করার আক্রোশ মেটাতে, চুম্বনের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে মুক্তাকে ছিন্নভিন্ন করার মতো হিংস্র কল্পনায় সমর্পন করত নিজেকে। বাস্তবে এক আতঙ্কময় কালরাতে মুক্তা এবাদের ভালাবাসার প্রস্তাবে মৃদু মাথা নেড়েছিল শুধু, আর জেলখানায় এবাদের কামের আগুন নেভাতে হাসিমুখে বিবস্ত্র হতেও দ্বিধা করে নি। মুক্তাকে একটুখানি পাওয়ার স্মৃতি সম্বল করে মুক্তাকে অনেকখানি না পাওয়ার শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে মেয়েটাকে নিয়ে অলীক কল্পনা করতেও ভাল লাগত। সেইসব কল্পনাবিলাস ছিল জেলখানায় অবসর কাটাবার উপায় বিশেষ।

কিন্তু এখন ফেলে আসা জীবন ও সামনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে হা-হুতাশ করার মানে হয় না এবাদের। মুক্তার এতদিনে নিশ্চয় বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলের মা হয়েছে। অন্যদিকে এবাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন বাস্তব। মা হারানো সন্তান ও নিজের মা-ভাই-বোনের জন্য স্বাভাবিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার কঠিন সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার কোনো পথ না পেয়েই সম্ভবত, পুরনো দিনের নানামুখী স্মৃতিভারে আক্রান্ত এবাদ একসময়, নির্ঘুম রাতের ছটফটে জ্বালা জুড়াতে কিশোরী মুক্তার বুকের সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়ে। আশ্রয় নেয় সেখানে। তারপর নিজেই নিজের শরীর চটকাতে থাকে।

ছেলের চালচলন দেখে তার নামজাদা ডাকাত পরিচয়টা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে জান্নাতির মনে। চোখের আড়ালে থাকার সময় ডাকাতটার কাণ্ডকীর্তি নিয়ে গল্প-গুজব বিশ্বাস হতো না সব। কিন্তু জেল খেটে আসার পরও এবাদের স্বভাব যেন একটুও বদলায় নি। ছেলের দিকে তাকালে অজানা আশঙ্কায় জান্নাতির বুক কাঁপে।

চোর-ডাকতের মতো অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে এবাদ। মাঠে কামলা-কিষাণরা প্রায় এক দুপুর কাজ শেষ করে, সকালের রান্না-বাড়ি শেষে চুলার আগুন নিভে যায়, লোকজন দেখা করতে এসে ফিরে যায়, এবাদের তবু ঘুম ভাঙে না। ঘুম থেকে উঠে বাবুর দীঘিতে

www.pathagar.com

গোসল করতে যায় সে। পানিতে নেমে দুষ্টু ছেলেদের মতো সাঁতার কেটে অত বড় দীঘিটার এপার-ওপার করে খামোখা। পাড়ে বসে লোকজন তার সাঁতার দেখে। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে সাঁতরে তিস্তা নদী পার হওয়ার গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। গোসল সেরে বাড়িতে এসে মায়ের কাছে ভাত চায় এবাদ। তারকারি যাই থাক, প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে অন্তত দুটি ডিম সিদ্ধ থাকা চাই। খাওয়ার পর এবাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসার ঠিক নেই। প্রায় অনেক রাতে,কোনো দিন সারা রাতেও বাড়ি ফেরে না।

বাইরে এবাদ কোথায় ঘোরে, কী করে— জান্নাতি ভেবে শুধু অস্থির হয়। পাড়া-পড়শীরা বলে, নতুন করে দল পাকাচ্ছে সে। পুরনো দুশমন তোফাজ্জল ভূঁইয়াকে উচিত শিক্ষা দেবে এবার। আর এ কারণেই শামসুদ্দিন চেয়ারম্যান ও সুরেশ বাবুর সঙ্গেও এবাদের বেজায় খাতির হয়েছে। তাদের বাড়িতে এক সঙ্গে বসে চা খায়, গল্পগুজব করে, আবার বাজারে চায়ের দোকানে বসেও নাকি গ্রামের ষণ্ডাপাণ্ডা ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল নিয়ে এবাদ শহরে গিয়েছিল দু'দিন। থানার দারোগা পুলিশের সঙ্গেও দেখা করেছে। অনেক অচেনা লোকজন বাড়িতে আসে এবাদের খোঁজে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো এবাদের বাইরে ঘোরাফেরা এবং পলিটিক্স করাটা পছন্দ নয় জান্নাতির। মুক্তিযুদ্ধের পর এরকম দেওয়ানগিরি করতে গিয়েই তো ফেরারি আসামি হয়েছিল সে। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এবাদের সঙ্গী ছিল বড় একটি রাইফেল। আর জেল থেকে ফিরে আসার পরও এবাদ নাকি সঙ্গে পিস্তল-ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পিস্তল কেমন জিনিস জান্নাতি দেখেনি। তবে ছেলের ঘরে চকচকে নতুন একখানি ছুরি দেখে চমকে উঠেছিল।

দিনে কোথায় যেন লুকিয়ে রাখে। আর রাতে ঘুমানোর সময় শিথানে থাকে তার ছুরি-লাঠি, ঘড়ি, টর্চলাইট, সিগারেট,ম্যাচ ইত্যাদি। পিস্তলটাও থাকে কিনা জান্নাতি দেখে নি। তবে এবাদের জামার পকেটে টাকাও থাকে আজকাল। খুঁজতে গিয়ে জান্নাতি গোপনে দশটা টাকা সরিয়েছে। টের পায় নি এবাদ। অবশ্য এভাবে ডাকাত ছেলের পকেট মারার প্রয়োজন হয় না। সারাদিন বাইরে ঘুরে ডাকাতি করুক আর চেয়ারম্যান-মহাজনদের দালালি করুক, সংসারের দিকও মন দিয়েছে এবাদ।

মা ও বোনের শাড়ি, ছেলের জামা-কাপড় কেনা এবং হাট-খরচের জন্য কোবাদকে নগদ টাকা দিয়েছে এবাদ। কত টাকা, টাকা সে কোথায় পেল, এ যাবত কোবাদকে কত টাকা দিয়েছে এবাদ— কোনো ছেলের কাছেই সঠিক তথ্য জিজ্ঞেস করেও জানতে পারে নি জান্নাতি। ডাকাত ছেলের রুজি-রোজগার নিয়ে উচ্চবাচ্য করতেও ভয় হয়। এমনিতে তার এবাদকে নিয়ে সবার মুখে লাগাম ছাড়া কথার অন্ত নেই। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর জান্নাতির সংসারে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে পাড়া-পড়শীরা। এবাদের মায়ের পরনে নতুন শাড়ি দেখে ঠাট্টা করে বলেছিল পাড়ার বছিরন, ডাকাইতের মাও দেখি নয়া শাড়ি পিন্দিয়া নয়া কইনা সাজিছে। ডাকাইত বেটা বাড়ি ফিরছে— তোমার আর অভাব কী।

ঝগড়া করার মেজাজ নিয়ে উঁচু গলায় ঠাট্টার উচিত জবাব দিয়েছে জান্নাতি, এলাও মোকে ডাকাইতের মাও কইস! এত বড় আসপর্দা তোর! জেল থাকি বারায় এবাদ কি কারো বাড়ি চুরি-ডাকতি করতে গেছিল ? প্রমাণ দিতে পারবে কোনো হারামজাদা ? বিড়ি ফোঁকার পয়সা পায় না এবাদ, আর সে দেবে হামাকে নতুন কাপড় কিনিয়া... এবং শাড়ি যে আসলে কোবাদ হাট থেকে কিনে এনেছে এবং জমি বিক্রির অবিশিষ্ট টাকা দিয়ে দু'ভাই বড়লোকি করছে, পড়শীদের এ সত্য বুঝিয়ে ছেড়েছে জান্নাতি।

www.pathagar.com

কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখবে কতদিন ? পুরনো কলঙ্ক ঘুচিয়ে যার চরিত্র রক্ষার জন্য এবাদের মা এত কথা বলে, চিকন বুদ্ধি খাটায়, সেই এবাদ নিজেই মাঝেমধ্যে এমন সব কাণ্ডকীর্তি করে যে, ছেলেকে ডাকাইতের বাচ্চা ডাকাইত বলে গাল দেয়াটাও আর যথেষ্ট মনে হয় না জান্নাতির। মেয়ে পেয়ারি ও ঘরজামাই রহমানকে এবাদ যেভাবে বাড়ি থেকে তাড়ালো, সে ঘটনার কথা ভাবলে আক্কেল গুড়ুম হয় জান্নাতির।

এ কথা সত্য যে, বিয়ের পরও পেয়ারি অকর্মা স্বামী ও পেটের ভিতরে আরেক পেটুককে নিয়ে টানাটানির সংসারে ক্রমে বড় বোঝা হয়ে উঠেছিল। তার চেয়েও বড় কথা, পেয়ারির বিয়ে জান্নাতির কাছে ডাকাত ছেলের তুলনায় কম কলঙ্কজনক ছিল না। ঘরজামাই রহমানকে তাই অসহ্য লাগত জান্নাতির। বাড়ির পোষা গরু-ছাগলের যেটুকু মূল্য, রহমানের তাও ছিল না। ঘেন্না বিরক্তি মাঝেমধ্যে এমন চরমে উঠত যে, মনে হতো যেন একটা ছাগল ঘাড়ের ওপর বসে ভ্যাবাচ্ছে। কিন্তু জামাই বলে কথা। সব সময় জামাইআদর দিতে না পারলেও সরাসরি কখনো কটূক্তি করে নি জান্নাতি। কিন্তু এবাদ এক রাতে বাড়ি ফিরেই রহমানকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। এক কথায় তার ঘরজামাইগিরি ছুটিয়ে দেয়।

শ্বশুরবাড়িতে শুয়েবসে খাইতে শরম লাগে না তোর ? কাইল হইতে এবাড়িতে যেন তোর মুখ না দেখি আমি।

রহমান শরমে ও ভয়ে মুখ নিচু করে ছিল। এবাদ শান্ত স্বরে হুকুম দিয়েছে, কাল ভোরে ফজুর গরুগাড়ি ভাড়া করে আনবি। আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই পেয়ারিকে নিয়া নিজের বাড়িতে রওয়ানা দিবি।

কিন্তু ভাইজান, বাবা যে আমাকে ত্যাজ্য...

চোপ। তোর বাড়িতে গিয়ে তোর বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছি আমি। তাওয়াই সাহেব আমাদের ভাল মানুষ। সব মেনে নিয়েছে। কাজেই কাল সকালে উঠে এ বাড়িতে তোদের মুখ যেন আর না দেখি আমি।

কিন্তু ভাইজান, আমার বাপকে তো চেনেন না আপনি। ভীষণ রাগ তার।

তোর বাপের রাগ কি এবাদ ডাকাইতের রাগের চেয়েও বেশি ?

না, মানে— বউ নিয়া যদি আমাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেয় ?

তা হলে একটা কাজ করিস। একখান কোদাল যোগাড় করিয়া তোদের বাড়িরে সামনের খুলিতে দুইটা কবর খুড়িস। একটা তোর জন্যে, আর একটা তোর বাপের জন্যে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলিস যে, এটা এবাদ ডাকাইতের হুকুম।

রাতে ঘরজামাইয়ের সঙ্গে ঠিক এইভাবে এবং এ পর্যন্তই কথাবার্তা বলেছিল এবাদ। খুশিতে কিংবা অজানা আশঙ্কায় গুনগুনিয়ে কান্না শুরু করেছিল পেয়ারি। জান্নাতিরও ঘুম হয়নি সারা রাত। ভোরে উঠে ফজুর গরুগাড়ি ভাড়া করে এনেছিল রহমান। আর পেয়ারির বিদায়ী কান্না ক্রমে এত সরব হয়ে উঠেছিল যে, জান্নাতির সংসারে নতুন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে ভেবে ছুটে এসেছিল পাড়াপড়শীগণ। এবাদকে ডাকতে হয় নি। পেয়ারির কান্না শুনে নিজেই সাতসকালে ঘুম থেকে উঠেছিল সে। বোনকে বিদায় দেয়ার সময় কণ্ঠ ভারী এবং চোখ দু'টি ছলছল হয়ে উঠেছিল তার। পেয়ারির মাথায় হাত রেখে দোয়া করে বলেছিল, যা রে ময়না, কাঁদিস না আর। আমি ফিরে এসেছি, আর কোনো সমস্যা হবে না তোদের। মন দিয়ে শ্বশুর-

www.pathagar.com

...র খেদমত করিস ।

এবাদ বোনকে হঠাৎ এভাবে বিদায় দেয়ায় গ্রামবাসীর তো বটেই, স্বয়ং জান্নাতির বিস্ময় এখনও কাটতে চায় না। আপোসের অনেক চেষ্টা করেছিল কোবাদ। কিন্তু রহমানের বাপ বড় ত্যাড়া মানুষ। ছেলের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়েও শান্ত হয় নি, আপোসের প্রস্তাব নিয়ে যারা গিয়েছিল, তাদের সকলকে অপমান করে তাড়িয়েছে। শেষে এমন শর্ত দিয়েছিল, সকল বিষয়সম্পতি বেচেও কোবাদের পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। গ্রামবাসী সবাই একবাক্যে রায় দিয়েছিল, জামাইকে সারাজীবন বাড়িতে রেখে পোষা ছাড়া কোনো উপায় নেই জান্নাতির। কিন্তু বাড়িতে এসেই এবাদ কোন জাদুবলে এমন কঠিন সমস্যার সমাধান করল ? কত টাকাই বা দিয়েছে সে রহমানের বাপকে ?

দুইদিন পর পেয়ারিকে দেখার জন্য এক হাঁড়ি মিষ্টিসহ কোবাদকে সে পাঠিয়েছিল। ফিরে এসে কোবাদ হাসিমুখে খবর দিয়েছে, পেয়ারি ভালই আছে। ইনসাল্লাহ সুখেই থাকবে শ্বশুর বাড়িতে।

ঘরজামাই পেয়ারিকে নিয়ে নিজবাড়িতে চলে যাওয়ায় জান্নাতির মাথা থেকে যেন বিশাল এক বোঝা নেমে গেছে। তেমনি বাড়িটাও বড্ড ফাঁকা হয়েছে। বোনকে বিদায় দিয়ে এবাদ সংসারের জন্য এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছে ঠিক, সেই সঙ্গে নিজের ডাকাত-পরিচয়টাও গ্রামে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছে। এবাদ যখন বাইরে থাকে, একা বাড়িতে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে জান্নাতি। কোথাও কাক ডাকলে বুক কাঁপে। মনে হয়, এই বুঝি এক্ষুণি খারাপ কিছু একটা ঘটবে। এই বুঝি এবাদ বাইরে নতুন কোনো অঘটন ঘটিয়ে নতুন বিপদ ডেকে আনে। এইরকম আশঙ্কা শুধু জান্নাতির নয়, কোবাদের মনেও কাজ করে। একদিন ভাইয়ের সামনে সরাসরি তা প্রকাশ করে এবাদ।

গোসল সেরে খেতে বসেছে এবাদ। কোবাদ সকালে সাইকেল নিয়ে ওকড়াবাড়ি এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ভাইকে খবরটা শোনায় সে, গতরাতে ওকড়াবাড়ি গ্রামের শরফ হাজির বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। সিঁধ কেটে ডাকাতরা ঘরে ঢুকেছিল। অনেক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। শরফ হাজি এবং ওকড়াবাড়ির লোকজন বলছে— এটা নিশ্চয় এবাদ ডাকাইতের কাজ।

জান্নাতিও সন্দেহভরা চোখে ডাকাত ছেলেকে দেখে। গতকালও বাড়ি ফিরতে অনেক রাত করেছিল এবাদ। সন্দেহটা আরো গভীর করার জন্য কোবাদ আরো বলে, লোকজনের ডাউট হওয়াটাই স্বাভাবিক। শরফ হাজি তো আবার তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের আত্মীয়। তার ছোট ভাই আফজাল মিয়ার শ্বশুর।

যারা সন্দেহ করে, তাদের বলিস এমন ছিচকে চুরি-ডাকাতি এবাদ কখনও করে নাই, করবেও না।

চুরি-ডাকাতি করিস না, কিন্তু অস্ত্র নিয়া বাইরে ঘুরিস ক্যানে ? এত টাকা তুই পাইস কোণ্ঠে ?

মায়ের রাগ দেখে এবাদ হেসে জবাব দেয়, দলবল আর অস্ত্র না থাকলে সর্বহারা এবাদকে কেউ পুছবে না রে মা। সমাজটা হইল শক্তের ভক্ত।

সর্বহারা নাম নিছিস তুই সর্বহারার মতো থাক। বড়লোকদের পুটকির পাছে মাছির মতো ঘুরিস ক্যানে ? তোর পাপের কামাই হামার দরকার নাই। না খায়া থাকমো, তাও ভালো।

www.pathagar.com

তবু তুই সংশোধন হ বাবা। মানুষ যাতে মোকে আর ডাকাইতের মাও না কয়, সেইভাবে চল।

মায়ের রাগ গভীর দুঃখ হয়ে গলতে থাকলে এবাদ গম্ভীর হয়ে যায়। মাথা নিচু করে চুপচাপ খেতে থাকে।

লোকে যখন তাকে ডাকাইত সর্দার ভাবে, ভেবে ভয় পায়, একটুও খারাপ লাগে না এবাদের। কারণ এ সমাজের প্রকৃত চোর ডাকাত কারা, সমাজতন্ত্রের রাজনীতি শিখে এবাদ তা ভালোভাবে জেনে গেছে। নিজেকে তাই মিথ্যে ডাকাত সর্দার পরিচয় দিয়ে শ্রেণীশত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে আনন্দ পায় সে। অস্তিত্বের মূল্য বাড়ায়। কেড়ে নেয়ার আগে ক্ষমতাবান ধনাঢ্য লোকেরা যখন যেছে এবাদকে টাকা দেয়, সেই টাকা নিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ হয় না তার। কারণ টাকা যে ধনী-গরিবের দুনিয়ের লুটপাটের কাগজ মাত্র, এবং ছলেবলেকৌশলে যে যত এই কাগজ লুটতে পারে, সে ততই বড়লোক হয়— এবাদের চেয়ে এ সত্য কোন সর্বহারা আর বেশি বোঝে? শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতি বোঝার পর শ্রেণীশত্রু খতম এবং তাদের ধনসম্পদ ডাকাতি করেও কখনও পাপবোধ জাগে নি এবাদের। বরং শোষক শ্রেণীকে উৎখাত করে সর্বহারাদের মুক্তি ঘটানোর বিপ্লবী যোদ্ধা ভাবত নিজেকে। কিন্তু এবাদ বাহিনী তো তুচ্ছ, দেশের সকল সর্বহারা, সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট দল এক হয়ে হাজার হাজার শ্রেণীশত্রু খতম করেও কোটি কোটি সর্বহারাদের মুক্তি ঘটাতে পারবে কি? আন্ডারগ্রাউন্ড-জীবনে নিজেকে এ প্রশ্ন অনেকবার করেছিল সে। হতাশ হয়েছে। পারবে না— এই সত্য হাড়ে হাড়ে টের পাওয়ার পরই, খুন-ডাকাতির রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করেছিল এবাদ। প্রেসিডেন্ট জিয়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় মুক্তি পেয়েছে। সরকারি দলে যোগ দিয়েছে সে আত্মরক্ষার গরজে। কিন্তু যতদিন সরকারি দলে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত না হবে, পলিটিক্স করে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হতে না পারবে, ততদিন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ডাকাত পরিচয় এবং এবাদবাহিনীকে কাজে না লাগিয়ে উপায় নেই এবাদের।

মা ও ছাটভাইকে নিজের রাজনৈতিক চিন্তা বোঝাতে চায় না এবাদ। সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলে শুধু, কাঁদিস না মা। মানুষ এখন তোকে ডাকাইতের মাও কয়, একদিন চেয়ারম্যানের মাও কইবে।

জান্নাতি কান্না থামিয়ে ছেলের দিকে অবাক চোখে তাকায়, ঝগড়ার মেজাজ ফিরে পায় মুহূর্তেই।

মানুষ তোর মতো ডাকাইতকে ভোট দিয়া চেয়ারম্যান বানাইবে! গ্রামের মানুষকে চিনিস তুই?

ভোট না দেয় ভোট ডাকাতি করিয়া চেয়ারম্যান হবো। যাতে মানুষ তোকে চেয়ারম্যানের মাও কয়।

ছোটভাই কোবাদও আজ বড়ভাইকে শাসন করার সাহস নিয়ে কথা বলে, ভিলেজ পলিটিক্স বড় নোংরা জিনিস। আল্লা আল্লা করি বি.এ-টা পাশ করলে তোকে আর কিছু করতে হবে না ভাই। যেটুকু জমি আছে, তাই দেখাশোনা করলে আমাদের দিন চলবে। মা, ভাইকে তুই আবার বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। মন দিয়ে ভাই সংসার করুক।

ওই ডাকাইতের বাচ্চাকে কাঁয় বেটি দেবে? দফের মোল্লার বেটির দশা দেখিয়া শিক্ষা পাইছে

www.pathagar.com

সবাই। নিজের বেটা পর্যন্ত ডাকাইত বাপের সঙ্গে থাকতে চায় না।

মৃত স্ত্রী ও সন্তানের প্রসঙ্গ ওঠায় এবাদ হঠাৎ বিরক্ত হয়ে ওঠে। কোবাদকে ধমক দেয়, আমার ঘর-সংসার করা নিয়ে তোর এত চিন্তা কেন রে ? বি.এ-টা আগে পাশ কর। ধুমধাম করে তোর বিয়েটা দিয়া আমি আবার বাড়িছাড়া হবো।

ঘরসংসারের প্রতি তীব্র বিরাগ দেখাতেই যেনবা, এবাদ খাওয়া শেষ করেই জামাটা কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

হাটখোলায়া চায়ের দোকান গন্তব্য করে এবাদ ধান ক্ষেতের মাঝদিয়ে হাঁটতে থাকে। ঠাকুরপাড়া থেকে যারা হাটে যায়, একমাত্র বর্ষার সময়টা আকাবাঁকা পথটার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাদের। অন্যসময় প্রান্তরের মাঝ দিয়ে, অসংখ্য ফসলের ভূঁই চিরে সোজা ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় গিয়ে ওঠে। একজন আগেরজনের পায়ের দাগ ধরে হাটে বলে ক্ষেতের মাঝখানে সিঁথির মতো রাস্তা গজিয়ে যায়। অনেক ক্ষেতের মালিক বড়ই গাছের কাঁটা বিছিয়ে দিয়েও গাঁয়ের মানুষের সোজা চলার গতি ঠেকাতে পারে না। এবাদ পায়ে চলা সেই মেঠো পথ ধরে এমন উদাসীন হাঁটতে থাকে যে, কাঁধের জামাটা গায়ে চাপানোর কথাও খেয়াল হয় না।

ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় উঠে একটি রিক্সা দেখতে পায় এবাদ। গ্রামের কাঁচা সড়কেও আজকাল রিক্সা চলতে শুরু করেছে। খেপ ধরার জন্য খালি রিকসা নিয়ে অনেক কামলাকিষাণ এখন রিকসাওয়ালা সেজে দূরের রেলস্টেশন, এমনকি শহরের পাকা রাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। নাইওর যাওয়ার জন্য এখন অনেক মহিলা গরুর গাড়ির বদলে মানুষটানা রিক্সা ভাড়া নেয়। কিন্তু এই রিকসাখানার যাত্রী ঠিক নাইওরী নয়, সালোয়ার কামিজ পরা এক যুবতী। পায়ের কাছে একটি ব্যাগ। হয়তো স্টেশন থেকে আসছে। গ্রামের কোনো আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাবে। এইটুকু মাত্র ভেবে এবাদ রিক্সার দিকে তাকায় না। অচেনা মেয়েটিকে ঘিরে বাডতি কোনো কৌতূহল জাগে না আর। কারণ গতরাতে খোদেজার স্মৃতি ও শূন্য শয্যা মনকে বড্ড কষ্ট দিয়েছে। ঘুমাতে পারে নি অনেক রাত। আর এখন বাড়িতে মা ও ভাইয়ের কথা শুনে মেজাজটাই বিগড়ে গেছে এবাদের। মেয়েমানুষের সঙ্গে বাকি জীবন সম্পর্কহীন থাকার প্রতিজ্ঞাটি মনে পড়ে। ফলে অচেনা মেয়েটার দিকে তাকাবারও ইচ্ছা হয় না এবাদের। মাথা নিচু করে হাঁটে সে।

রিকসা এবাদের কাছাকাছি পৌঁছলে রিকসাওয়ালাটি চওড়া হাসির সঙ্গে চড়া কণ্ঠে কথা বলে, ভাল আছেন তো এবাদ ভাই ? অনেক বছর পর দেখনু তোমাকে ।

রিকসাওয়ালার দিকে তাকিয়ে তার নামটি মনে করতে না পারলেও সজনা গাঁয়ের মানুষ হিসেবে তাকে সনাক্ত করতে পারে এবাদ এবং একইসঙ্গে মেয়েটির দিকে চোখ পড়া মাত্র চমকে ওঠে। রিকসা ততক্ষণে তাকে অতিক্রম করে এগুচ্ছে। চমক ধাতস্থ না হতেই ঘাড় ঘুরিয়ে এবাদ জানতে চায়, এখান কার রিকসা রে ? কোণ্ঠে যাইস ?

রিকসার প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে আরও চড়া সুরে জবাব দেয় লোকটি, ইকসা মোর নিজের ভাই। গেল বার আড়াইহাজার টাকা দিয়া কিনছি। আর ইকসায় আছে আফজাল মিয়ার মেয়ে। টাডনে থাকে। কলেজে পড়ে। স্টেশন থাকি নিয়া আসনু।

ওই খাড়াও, খাড়াও।

www.pathagar.com

এবাদ ডাকাতের হুঙ্কার শুনে থামবে কি থামবে না— রিকসাওয়ালার এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানে রিকশার গতি খুবই মন্থর হয়ে আসে ।এবাদ দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় রিকসার দিকে। জেল থেকে আসার পর সজনা গাঁয়ের অনেকের সাথে দেখা হয়েছে। কিন্তু বড়বাড়ির কোনো মানুষের সাথে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ এই প্রথম। রিকসার সিট ধরে এবাদ সরাসরি আরোহীর দিকে তাকায়।

খাটের তলায় অন্ধকারে টর্চের তীব্র আলোকছটায় ভেসে ওঠা সেই মুখ ও স্তন, আগ্রাসী ঠোঁটের মধ্যে পাওয়া সেই ঠোঁট ও গাল, অন্ধকারে নিবিড় আলিঙ্গনে পাওয়া ভালবাসার ঘ্রাণ এত বছর পরেও এবাদের বুকে আলোড়ন জাগায়। চোখে পলক পড়ে না। সেদিনের কিশোরী আজ পূর্ণ যুবতী। আগের চেয়ে তার শরীর-সৌন্দর্য অনেক বিকশিত হয়েছে, সারাদিন তাকিয়ে থাকলেও যেন এবাদের চোখ ক্লান্ত হবে না। কিন্তু মুক্তার চোখে সেদিনের মতো অশ্রু-টলমল আতঙ্কের বদলে বিস্ময় ও বিরক্তি স্পষ্ট। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চায় সে, কে আপনি ? এভাবে অভদ্রের মতো রিক্সা আগলে দাঁড়ালেন কেন ?

আমার নাম এবাদ, লোকে বলে এবাদ ডাকাইত।

এবাদ ডাকাত তো জেলে।

জেলে কি এবাদ ডাকাতকে বেশিদিন আটকে রাখা যায় ? বেরিয়ে এসেছি।

মুক্তার অবিশ্বাস, আতঙ্ক ও ভয় কাটাতে রিক্সাওয়ালা এবার জোর গলায় কথা বলে, এবাদ ভাই কয়দিন হইল জেল থাকি মুক্তি পাইছে। সরকার ছাড়ি দিছে। এলায় সরকারি দল করবে। আর চুরি-ডাকাতি করবে না। মানুষের কাছে এইরকম নানান কথা শুনি এবাদ ভাই, সত্য-মিথা আল্লা জানে আর তোমার মন জানে।

এবাদ রিকসাওয়ালার কথা শোনে কিন্তু চোখ মুক্তার দিকে একাগ্র। মেয়েটা বেশ ভয় পেয়েছে সন্দেহ নেই। তাকানো দেখে মনে হয় চোখ ফেটে এখনই অশ্রু ঝরবে এবং বিস্ময় চিরে সেই রাতের মতো সে আর্তনাদ করে উঠবে— আমাকে মারবেন না প্লীজ। এবাদ তাই হেসে তাকে অভয় দেয়।

এবাদ ডাকাতকে দেখে খুব ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে। ভয় নেই।

ডাকাতকে দেখে কি মানুষ খুশি হবে ? আপনি আমার রিকসা আটকালেন কেন ?

সহসা মুক্তার ভয়কে জয় করা সাহস দেখে এবাদই মুহূর্তের জন্য বিব্রত বোধ করে।

দেখো, লোকে আমাকে ডাকাত বলে, আমি আসলে ডাকাত কোনোদিন ছিলাম না, এখনও নই।

তাহলে আপনি কী ?

আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। তারপর আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্স করেছি, যাকে বলে বিপ্লবী রাজনীতি, দেশের গরিব সর্বহারাদের মুক্তির রাজনীতি।

'৭৪ সালে আমাদের বাড়ি ডাকাতি করেছিলেন। আপনিই তো আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন, তাই না ?

কী করে বুঝলে যে আমি তোমাদের ঘরে ঢুকেছিলাম ?

দুনিয়ার সবাই জানে। এখন আমার রিকসা আটকালেন কেন ? এই চাচা, আপনি চালান।

www.pathagar.com

ভয় নেই মুক্তা। সেই ছোটবেলায় তোমাকে দেখেছিলাম। তা তোমাদের বাড়ির সবাই ভাল তো ?

আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ? আর ছোটবেলায় আমাকে কোথায় দেখেছেন আপনি ?

মুক্তিযুদ্ধের আগে তোমাদের বাড়িতে কতবার গেছি।

তখন তো আমাদের বাসা শহরে ছিল।

তাহলে যুদ্ধের পরে দেখেছি বোধহয়।

কোথায় দেখেছেন ? এখন অস্বীকার করছেন কেন— মাত্র কয় বছর আগে আপনিই দলবল নিয়ে আমাদের বাড়ি ডাকাতি করতে গেছিলেন ?

মুক্তার তীব্র জেরার মুখে এবাদ কিছুটা ঘাবড়ে যায়। কারণ মেয়েটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এখন ভয় নেই, লজ্জাও নেই। তার বড় বড় চোখ দুটিতে কী যে রহস্য— এবাদ ঠিক তাও বুঝতে পারে না। চোখ সরিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জাও পায় সে। কাঁধের জামাটা এখন পর্যন্ত পরা হয় নি। গায়ে শুধু গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। এবাদ ডাকাতের চেহারা আপাদমস্তক ভাল করে চিনে নিচ্ছে মুক্তা। এবাদ হাসি ও কথা দিয়ে অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করে।

দেখো, স্বাধীনতার পর গ্রামে যত খুন-ডাকাতি হয়েছে, লোকের ধারণা সবই এবাদ ডাকাত ও তার দল করেছে। ঠিক আছে, যাও। তোমার আব্বা ও জ্যাঠাকে আমার সালাম দিও। শিগগিরই যাব একদিন তোমাদের বাড়িতে।

রিকসা আবার চলতে শুরু করলে, এবাদ রিকসার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাথা ঘুরিয়ে মুক্তা আবার তাকায় এবাদের দিকে। তখন এবাদ আবার ডাক দেয়, এই রিকসা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আরেকটা কথা শোনো মুক্তা।

এবাদ রিকসার কাছে এগিয়ে যায় আবার।

গতরাতে তোমার নানার বাড়িতে শুনলাম চুরি না ডাকাতি হয়েছে। তোমার আব্বা-মাকে বলো, আমকে সন্দেহ করে যেন আবার থানায় কেস না দেয়। অবশ্য থানায় আমার নামে কেস দিতে গেলেও নেবে না। তবু বাড়িতে বলিও, আমাকে অকারণ শত্রু না ভাবে যেন। ঠিক আছে যাও।

রিকসা চলতে থাকলেও এবাদ কিছুক্ষণ ফাঁকা সড়কে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তা আর পিছু ফিরে তাকায় না। এবাদ অকারণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, জামাটা পরে নিয়ে বাজারের দিকে হাঁটতে থাকে। অকারণ দীর্ঘশ্বাসটি যে হতাশা থেকে নয়,বরং খুশির শিস হয়ে বেজেছে, বুকের ভেতরে মন খারাপ করা গ্লানি ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেছে, টের পেতে দেরি হয় না এবাদের। গোঁফের নিচে আপন হাসির আভা নিজেও দেখতে পায় সে। বড় বাড়ির বাইরে মুক্তাকে এভাবে একা পাওয়ার কথা কল্পনাও করেনি এবাদ। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তাকে আবিষ্কার করার আনন্দ, প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি ও মুক্তাকে বুকের মাঝে পাওয়ার রোমাঞ্চ জাগায়। সেই সঙ্গে মুক্তাকে ঘিরে ছোট ও বড়, হালকা ও ভারি, তুচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ নানারকম প্রশ্ন মনে ভিড় করে।

সেই রাতে মুক্তা কি এবাদের মুখ দেখতে পেয়েছিল ? পাওয়ার কথা নয়, এবাদের মুখে ছিল কালো কাপড় আর ঘর ছিল অন্ধকার। ভালবাসার প্রস্তাবে মুক্তা মৃদু এবং লাজুক মাথা নেড়ে

www.pathagar.com

সম্মতি দিয়েছিল কেন ? নিছক ভয়ে নাকি ডাকাতের মুখে মিষ্ট মধুর ভালবাসার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল সে ? চুমু খাওয়ার সময় মুক্তার হাত দুটিও যেন আঁকড়ে ধরেছিল এবাদকে। ধরেনি ? ডাকাত যে মুক্তাকে খাটের নিচ থেকে বের করে চুমু খেয়েছে, বড়বাড়ির সবাই কি জেনে গেছে ব্যাপারটা ? মুক্তা নিজ মুখে বলেছে ? নাকি কেবল মাকে বলেছিল ? বলুক আর নই বলুক, স্মৃতিটা নিশ্চয়ই ভোলে নি মুক্তা। মাঝে মধ্যে মনে পড়ে, নাকি প্রতিদিন ? মনে পড়লে খারাপ লাগে, নাকি আনন্দ হয় ? আজ রাস্তায় দ্বিতীয় সাক্ষাতের স্মৃতিও মুক্তা সহজে ভুলবে না। এবাদের মতো তার মনেও উথাল-পাথাল ভাব জাগছে কি ? দিবালোকে এই প্রথম স্পষ্ট দেখতে পাওয়া এবাদ ডাকাতকে মুক্তা অপলক চোখে তাকিয়ে দেখেছিল কেন ? এবাদ ডাকাতের মাঝে সেই রাতের গোপন প্রেমিককে খুঁজে পাওয়ার বিস্ময় ছাড়া মুক্তার চোখে আর কি ছিলো ? অতক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবাদকে দেখছিল কেন ? আবার চলে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছু তাকাবার মানে ?

মুক্তাকে ঘিরে মনে যত প্রশ্ন জাগে, মুক্তাকে নিয়ে ভাবার উৎসাহ ততই বেড়ে যায় এবাদের। একঘেয়ে এবং এক কেন্দ্রিক প্রশ্নের ঝাক কাবু করতে পারে না। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময় রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস-অর্থনীতি নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করত এবাদকে। উত্তর দিতে পারা দূরে থাক, তার প্রশ্ন শুনলে বিরক্ত বোধ করত এবাদ। কিন্তু সব-জানতা সেই বিপ্লবী নেতা এবাদকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজেই নিজের সব প্রশ্নের জবাব দিত। প্রশ্নগুলোর মতো তার দীর্ঘ জবাব শুনেও বিরক্ত বোধ করত এবাদ। দুর্বোধ্য বই পড়ার মতো ক্লান্তি লাগত। কিন্তু মুক্তাকে ঘিরে জেগে ওঠা প্রশ্নগুলো মনপ্রাণ চাঙ্গা করে তোলে। জবাব খুঁজে পেতে সাগর সেচে মুক্তা পাওয়ার মতো আনন্দ হয়।

হাটখোলায় চায়ের দোকানে বসে এবাদ যখন প্রাণোচ্ছল ও সামাজিক হয়ে ওঠে, লোকজনের কৌতূহল মেটাতে নিজের অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেয়, সমর্থক ও অনুগত ছেলেদের এন্তার চা-পান-সিগারেট বিলায়, তখনও বুকের ভেতরে কাজ করে মুক্তাকে আবিষ্কারের আনন্দ ও আগ্রহ। এরপরে শামসুদ্দিন চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তাকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে থানায় যাওয়া, দারোগার সঙ্গে কথা বলা— সব কিছুর মূলে যেন কাজ করে যায় মুক্তাকে আকস্মিক আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া।

অবশেষে, গভীর রাতে নিজের ওপর ত্যাক্তবিরক্ত এবাদ নিজেকে প্রশ্ন করে, ঘুরেফিরে আজ মুক্তার কথা মনে পড়ছে কেন ? সাত-আট বছর আগে কিশোরী মুক্তাকে ভাল লেগেছিল, যুবতী মুক্তাকে দেখে আজ আরো বেশি ভাল লেগেছে তার। শুধু এ কারণেই কি ? কিন্তু এই মোহমুগ্ধতা নিয়ে ছন্নছাড়া এবাদ ডাকাত কী করবে ?

ভালবাসার প্রস্তাবে সেই রাতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবার দৃশ্যটা বারবার মনে পড়ে। মুক্তাকে এখন আবার ভালবাসতে চাইলে সে কি আবার মৃদুমধুর সম্মতি জানাবে ? আগের চেয়েও পুরুষ্ট হয়ে ওঠা মুক্তার বুক দেখার এবং স্পর্শ করার সুযোগ কি সে পাবে আবার ? এবাদকে সে হয়তো তুচ্ছ চোর-ডাকাত ভাবে, বড়জোর জেলখাটা খুনী আসামি। আজ এবাদের লুঙ্গি, খালি গা দেখে সেইরকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবাদের এই অবস্থার জন্য মুক্তার চেয়ারম্যান জ্যাঠাই যে প্রধান দায়ী— মেয়েটা কি জানে সে ইতিহাস ? খুনডাকাতি করেও এবাদ অসংখ্য গরিবের উপকার করেছে। সাধারণ ডাকাত সে নয়, সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রেণীসংগ্রাম করেছে মাত্র। মুক্তা কি জানে এবাদের এই সংগ্রামী জীবনের

www.pathagar.com

মাহাত্ম্যগাথা ? মুক্তার সঙ্গে আবার দেখা ও কথা না হওয়া পর্যন্ত এবাদ মুক্তাকেন্দ্রিক সকল জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব খুঁজে পাবে না যেমন, তেমনি নিজের প্রকৃত পরিচয় জানাতেও পারবে না। মুক্তাকে আবারও দেখার ইচ্ছেটি ক্রমে এত জোরালো হয়ে ওঠে যে, তোফাজ্জল চেয়ারম্যানকে সে ক্ষমা করে দেয়ার কথা ভাবে। কারণ তোফাজ্জল চেয়ারম্যান-এর সঙ্গে আপোস করা ছাড়া মুক্তার সঙ্গে যোগাযোগের স্বাভাবাবিক পথ খুঁজে পায় না এবাদ।

মুক্তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হওয়ার বারো দিন পরে, সকালবেলা সজনা গাঁয়ের দিকে রওয়ানা দেয় এবাদ। গতকাল দূত পাঠিয়েছিল, তোফাজ্জল ভূঁইয়ার সঙ্গে জরুরি মোলাকাত করবে এবং বড়বাড়িতে গিয়ে সকালের চা-নাস্তা খাবে এবাদ। মুক্তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় প্রধান শত্রুকে আপস-প্রস্তাব পাঠানো ছাড়াও এ ক'দিনে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছে সে। মোটর সাইকেল যোগাড় করেছে, ভাল প্যান্ট-শার্ট পরেছে, থানা সদরে গিয়ে সেলুনে বসে ক্লিন শেভ করেছে এবং মিষ্টির দোকান থেকে তিন সের মিষ্টি কিনেছে এবাদ। এতকিছুর পরেও শত্রু-বাড়িতে পৌঁছে ভাল অভ্যর্থনা পাবার আশা করে না সে। তবে এটুকু বিশ্বাস আছে, এবাদকে প্রকাশ্যে অপমান কিংবা আক্রমণ করার মতো সাহস তোফাজ্জল ভূঁইয়া বা তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর হবে না। তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে কোমরে অস্ত্র গুঁজে নিয়েছে এবাদ।

মোটরসাইকেলের আওয়াজ তার উপস্থিতি ঘোষণা করার পরও বড়বাড়িকে আজ সকালে বড্ড সুনসান মনে হয়। এবাদ মোটর সাইকেলে বসেই বাড়িটির কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সজনা গ্রামে গাছপালা ঘেরা একটি দু'টি টিনের ঘর কিংবা খেড়ি ঘরের ছোট ছোট বাড়িগুলোর পটভূমিতে বড়বাড়ি আকারে চোখে ধরার মতো বড়। দুটি হাফ বিল্ডিংসহ দশটি টিনের ঘর, পুকুর, বাঁশঝাড় ও অসংখ্য গাছপালাসহ অখণ্ড ভিটায় বাইরে থেকে বাড়িটিকেও মনে হয় একটি বাড়ি, আসলে ভেতরে তিন ভাইয়ের ভিন্ন চক। ডাকাতি করার সময়ে বাড়ির ভেতরে এবাদ অখণ্ড আঙিনা দেখেছে। কিন্তু তিন ভাইয়ের ভিন্নতা এখন বাইরে থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। মুক্তাকে যে টিনের ঘরটিতে খুঁজে পেয়েছিল, সেখানে একটি হাফবিল্ডিং উঠেছে। চকচকে টিনের চাল। দেয়ালে প্লাস্টার হয়নি এখনও। বাড়ির সামনে মাঝামাঝি অবস্থানে বড় ভাই তথা তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের কাছারি ঘরটি আগের মতো আছে। নির্জন বৈঠকখানায় চেয়ার-বেঞ্চির বদলে পাটকাঠির বোঝা। চেয়ারম্যানী চলে যাওয়ার পর বিচার-সালিশ ও রিলিপ পাওয়ার জন্য তোফাজ্জল ভূঁইয়ার কাছে লোকজন খুব একটা আসে না বোধহয়।

কাছারি ঘরের পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে এবাদ তার বাহিনী নিয়ে যে পথে এবং যে ঘরটিতে প্রথম ঢুকেছিল, সে পথে এবং সেই ঘরটির পেছনে এসে থমকে দাঁড়ায়। সরাসরি ভেতরে ঢুকতে দ্বিধা জাগে। প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে গলা খাকারি দিয়ে কণ্ঠে দরদ ঢেলে শত্রুকে খোঁজে, ও চেয়ারম্যান ভাই , আছেন বাড়িতে ? আমি এবাদ, আরে ও বড় ভাই।

www.pathagar.com

বাড়ির ভেতরে যেন জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মুক্তাদের নতুন বিল্ডিং-এর দিকে চোখ রেখে এবাদ আবার ডাক দেয়, আরে ও ভূঁইয়া ভাই! আছেন নাকি ?

মোটরসাইকেলের পেছনে বাঁধা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এবাদ যখন সরাসরি ভেতরে ঢোকার কথা ভাবে, ঘরের কোণে বেড়ার আড়ালে এসে দাঁড়ায় তোফাজ্জল ভূঁইয়ার স্ত্রী। মাথায় ঘোমটা। কম্পিত কণ্ঠে কথা বলে, উনি তো বাড়িতে নাই। সকালে চা-নাস্তা খেয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

আমি তো খবর দিয়েছিলাম— বড় ভাইয়ের কাছে মাফ চাইতে আসব আজ।

মাফ চাইতে হবে না। এমনি মাফ করি দিছে সে।

তা আপনি ভাল আছেন ভাবী ? আপনাদের বড় ছেলে রুবেল— সে কোথায় ?

রুবেলও বাড়িতে নাই।

ওপাশে নতুন দালান তুলল কে ? আফজাল ভাই নাকি ? উনি নাই বাড়িতে ?

ওদের খবর আমরা জানি না। ওদের বাড়িতে ঢোকার রাস্তা ডান দিকে , ওদিকে গিয়ে খোঁজেন।

মিষ্টির প্যাকেট হস্তান্তর করার আগেই মহিলা আবার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। এবাদ টের পায়, শত্রু পরিবার তাকে বিশ্বাস করে সহজভাবে নিতে পারছে না সম্ভবত। ছোট ভাই আফজাল মিয়ার বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে। এবারে বাইরে থেকে হাকডাক না করে সোজা বাড়ির আঙিনায় ঢুকে থমকে দাঁড়ায় এবাদ। তৃতীয় বার মুক্তার সঙ্গে চোখাচোখি সাক্ষাৎ ঘটে। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্তা যেন এতক্ষণ বাড়িতে এবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করছিল এবং জ্যাঠিমায়ের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনছিল। এবাদ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলে, তোমার আব্বা নাই বাড়িতে ?

কী ব্যাপার ? আপনি বিনা নোটিশে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লেন যে! সকালবেলা খুন-ডাকাতি করতে এলেন নাকি ?

ঠাট্টা নয়, মুক্তার কথায় আতঙ্ক মাখানো ধারালো প্রতিরোধ। এবাদ অপ্রস্তুত। হেসে জবাব দেয়, কী যে বলো তুমি! তোমাদের সঙ্গে এমনি দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসলাম। তা তোমার আব্বা কোথায় ?

আব্বাকে কী দরকার ? বড় আব্বাকে খুঁজছিলেন কেন ? প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে আবার খুন করার মতলব নিয়ে এসেছেন ?

আরে তুমি দেখি আমাকে খুনী ডাকাত ছাড়া মানুষই মনে করো না! ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাড়িতে বেড়াতে আসে না ?

আপনি আবার ভদ্রলোক! যান বাড়ির বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করেন, যান।

যে মেয়েকে নিয়ে এবাদ এ কয়দিন আকাশ-পাতাল কতো কী যে ভেবেছে, তার এমন ব্যবহার দেখে সে অবাক হয়। এ সময় মুক্তাকে রক্ষা করতে এসে মুক্তার মা এবাদকেও লজ্জা-অপমানের হাত থেকে বাঁচায়।

মহিলাকে সালাম দিয়ে এবাদ সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। হেসে বলে, ভাল আছেন ভাবী ? বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই আপনার মেয়ে যেরকম গোলাগুলি শুরু করেছে, আমার তো ভয় লাগছে। তা মিয়াভাই নাই বাড়িতে ?

www.pathagar.com

ও তো একটু পরে অফিস যাবে। গোসল করতে গেছে।

মুক্তার মায়ের মাঝেও চাপা আতঙ্ক লক্ষ্য করে এবাদ জোর গলায় অভয়বাণী শোনায়, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি আর সেই আগের এবাদ নেই ভাবি। জেল থেকে আসার পর জায়গার কতো মানুষের সঙ্গে দেখা হইল। কিন্তু আপনাদের কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হইল না এখন পর্যন্ত। সেই জন্যে ভাবলাম, যাই, ভাইদের সঙ্গে একবার দেখাসাক্ষাৎ করিয়া তাদের দোয়া নিয়া আসি। এই মিষ্টিটা রাখেন। বাড়ির সবাইকে ভাগ করে দেবেন।

মুক্তার মা ভীরু হাত বাড়িয়ে মিষ্টির প্যাকেট গ্রহণ করে। ভয়-বিস্ময় আড়াল করতে সৌজন্যের হাসি হাসে, এ সবের কী দরকার ছিল ?

পেছনে দাঁড়ানো মুক্তা ঝাঁঝালো কণ্ঠে আবার প্রতিবাদ জানায়, জুতা মেরে মালা দিতে এসেছেন ? আমরা আপনার কে— যে মিষ্টি নিয়ে এসেছেন! মতলব কী আপনার ?

আহা মুক্তা! তুই তোর ঘরে যা।

এ সময় কলতলা থেকে আফজাল মিয়ার কণ্ঠ ভেসে আসে, মুক্তা, তোমার এবাদ চাচাকে বসতে দাও মা। আমার গোসল হয়ে গেছে। ও এবাদ বস তুমি।

আগন্তুককে কোথায় বসতে দেবে— আফজাল মিয়ার স্ত্রী দ্বিধায় পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটে মুক্তার। এবাদকে স্বাগত জানিয়ে শান্ত গলায় বলে, ঠিক আছে, বাড়িতে ঢুকেই যখন পড়েছেন— আসেন, ঘরের ভেতরে। আসেন, বসেন।

নতুন দালানের একটি কক্ষে এবাদকে বসতে বলে মুক্তা নিজে ঘরে ঢোকে না। দরজায় দাঁড়িয়ে এবাদের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলে, আপনার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না। বসুন, আপনার জন্য চা-নাস্তা নিয়ে আসছি।

মুক্তার রহস্যময় দৃষ্টি এবং অপ্রত্যাশিত প্রশংসা এবাদের মনে সন্দেহ জাগায়। একটু আগে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার মতো অপমান এবং এখন এই আন্তরিক আপ্যায়নের মানে খুঁজে পায় না। মেয়েটি কি তবে ডাকাতিয়া চুমুর বিষয়টি বাড়ির লোকজনকে বলে দিয়েছে ? সে কারণে এমন খাপছাড়া রহস্যময় আচরণ করছে ?

সদ্য স্নাত অফজাল মিয়া মাথা না আঁচড়েই খালি গায়ে ঘরে আসে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দেয় এবাদ।

বস। অনেক দিন হলো মুক্তি পেয়েছ। লোকজনের মুখে তোমার সব খবর শুনি। তা এ্যাদ্দিনে মনে পড়ল আমাদের কথা। তোমার বাপ সামাদ চাচা তো আমাদের পর ভাবত না।

পর ভাবলে কি আমি আজ নিজে আপনাদের বাড়ি ছুটে আসতাম ভাই ? আপনার সাথে সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেখা। আমি তো ভবছিলাম আপনি ফেমিলি নিয়া আগের মতো টউনে ভাড়াবাসায় থাকেন।

হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাইকে নিয়ে সেই যে বাড়িতে এলাম, তখন থেকে ফেমিলি বাড়িতেই। আমি অবশ্য চাকরির কারণে টউনে একা ছিলাম অনেকদিন। এরপর বদলি হয়ে থানায় পোষ্টিং নিয়েছি। সুন্দরগঞ্জে আছি এখন। বাড়ি থেকে সাইকেলে অফিস যাতায়ত করি।

বাহ! ভালই তো। বাড়ি থেকে চাকরি করছেন, আবার সংসারও দেখভাল করছেন।

www.pathagar.com

আফজাল মিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানায়, হ্যাঁ বইরে থেকে সবাই তাই ভাবে। চাকরি করে যা বেতন পাই তা দিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে শহরে বাসা ভাড়া করে থাকার সঙ্গতি নাই। এদিকে পৈতৃক সম্পতির যা ভাগ পেয়েছি, তা মানুষের ওপর ছেড়ে দিলে ন্যায্য ভাগ পাওয়া দূরে থাক, আসলটাও বেদখল হয়ে যায়। আবার কামলাপাইট দ্বারা নিজে সব কিছু করাতেও পারি না ঠিক মতো। আমার মতো ভদ্রলোক গ্রামে যে কী শান্তিতে আছে এবাদ— সে একমাত্র আমি জানি। মাঝে মধ্যে ভাবি, মুক্তিযুদ্ধ করে তোমরা যে বাংলাদেশ স্বাধীন করলে— লাভটা হইল কার ?

আমারও তো সেই একই প্রশ্ন ভাই। পাকিস্তানি শোষকদের শাসন আর জুলুম হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করলাম। কিন্তু শেখ মুজিবের শাসন কালে মুজিববাদ কায়েমের নামে শোষণ লুটপাট কি কম হয়েছে ? মুক্তিযোদ্ধা হয়েও বিনা দোষে খুনের আসামী হইলাম । সমাজ সংসার ছাড়লাম । কিন্তু তারপরেও সমাজে শোষণ , লুটপাট, খুন-খারাবি , অবিচার কম হয়েছে বলেন ? ক্ষমতায় থেকে ওরা লুটপাট করে, ক্রিমিনালরা চুরিডাকাতি করে— আর দোষ হয় শুধু এবাদ ডাকাইতের। যেন এবাদ ডাকাইতের জন্য দেশে এত অশান্তি। তা আপনিও কি আমাকে এমন খারাপ ডাকাত ভাবেন ভাই ?

না, না,ছি! তোমাকে ডাকাত ভাবলে ঘরে বসিয়ে তোমাকে এত কথা বলতাম না।

এবাদ শুধু আফজল মিয়ার সঙ্গে কথা বলে না, ঘরের বাইরে বারান্দায় মুক্তার উপস্থিতি অনুমান করে আত্মপরিচয় দানের উৎসাহ বোধ করে বেশি। ডাকাতি করতে এসেও আফজাল মিয়ার ঘরের একটি সূচও সে লুট করে নি । সেই স্মৃতি মনে করে এবাদ গর্বভরে এবং উচ্চস্বরে কথা বলে, লোকে আমাকে ডাকাত বলে, আসলে আমি আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্স করতাম ভাই। দেশের গরিব মানুষ এবং আপনার মতো সৎ মানুষের অনিষ্ট কখনও করি নাই, ইনশাল্লাহ করব না।

সে আমি ভাল কারে জানি এবাদ। দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য করে কত গরিবের জীবন তুমি রক্ষা করেছো। তা ঐ সময় সর্বহারা পার্টি, কেউ বলে গণবাহিনী— আসলে কোনটাতে ছিলে তুমি ?

ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আসলে আমি নিজস্ব দল নিয়ে কাজ করেছি ভাই। এখন দলবল নিয়ে জিয়াউর রহমানের দলে যোগ দিয়েছি।

এ খবর অবশ্য আমরা পেয়েছি। তা আজকাল মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়াও, নতুন কিনেছ নাকি এবাদ ?

এ মোটর সাইকেলখানা সেদিন আমাকে দিয়েছে মেজর ইকবাল সাহেব। চেনেন তো ওনাকে ? সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতা। আগামী ইলেকশনে আমাদের এলাকায় দাঁড়াবে। পাশ করেল মন্ত্রী হবে সন্দেহ নাই। মেজর সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করেন ভাই। আমার জন্য অনেক করেছেন তিনি।

আফজাল মিয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। এবাদ ঘনঘন তাকায় দরজার দিকে। তার ধারণা চা-নাস্তা নিয়ে স্বয়ং মুক্তা যে-কোনো সময় ঘরে চলে আসবে। মুক্তার আসা ত্বরান্বিত করতেই যেন বলে সে, আপনার বোধহয় অফিসের দেরি হচ্ছে ভাই। আমি বরং আজ উঠি। আর একদিন এসে চা-নাস্তা খাব।

www.pathagar.com

না, না , বস। কই মুক্তা, তোমার মাকে চা-নাস্তা দিতে বলো।

মুক্তা কিন্তু বেশ চালু মানে বুদ্ধিমতী মেয়ে ভাই। সেদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল।

যদি কিছু মনে না করো, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই এবাদ।

আফজাল মিয়ার গম্ভীর বিনয় দেখে সতর্ক হয়ে ওঠে এবাদ। মুখে বলে, একটা কেন, একশটা বলেন, আমি কিছু মনে করব না ভাই।

দেখ, আমার বড় ভাই শেখ মুজিবের অন্ধ ভক্ত, মুজিব মরার পরও তার পার্টির পলিটিকস নিয়ে আছে। আমিও এক সময় তাদের সমর্থক ছিলাম। কিন্তু বড় ভাইয়ের মতো দলাদলির পলিটিকস করি নাই, এখনও করি না। স্বাধীনতার পর বড় ভাই তোমার প্রতি যে অন্যায় অবিচার করেছে, সেটাও আমি মেন্টালি সাপোর্ট করি নাই। তাছাড়া সে সময়ে আমি তো বাড়িতেও ছিলাম না। তুমি তো বাইরের মানুষ এবাদ। একই মায়ের পেটের ভাই হয়েও উনি আমাকে নানাভাবে হ্যারাস করার তালে আছেন। জায়গাজমির ন্যায্য ভাগ দেয় নি। অংশীদারদের হাত করে আমার নামে মামলা করেছে। এরকম একজন বদ স্বভাবের মানুষের ওপর তোমার প্রতিশোধ নেওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বা আমার মেয়ে মুক্তা তো তোমার ওপর কোনো অন্যায় করি নাই এবাদ। নাকি করেছি ?

এবাদের বুকে ধক করে জেগে ওঠে মুক্তাকে চুমু খাওয়ার স্মৃতি। মুক্তা নিশ্চয় বলে দিয়েছে তার বাবা-মাকে। এবাদের ঘাবড়ে যাওয়া তার তাকানো এবং কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হঠাৎ এ কথা কেন বলছেন ভাই ?

সেদিন রাস্তায় মুক্তার রিকসা আটকে ধরেছিলে শুনলাম। ওর নানার বাড়ি ডাকাতি হওয়ার খবরটা তোমার কাছেই ও প্রথম শুনেছে। তুমি থানায় কেস না দেয়ার জন্য হুমকি দিয়েছো, কিন্তু তার আগেই শ্বশুরকে আমি বলে দিয়েছি তুমি বা তোমার বাহনীর কারো নামে যেন অকারণ সন্দেহ করে কেস না দেয়।

হায় হায়! আপনার শ্বশরবাড়ি চুরির ব্যাপারে আপনি বোধহয় আমাকে সন্দেহ করছেন। ছি ছি! এইসব সিঁধকাটা চুরি-ছ্যাচড়ামি করব আমি!

না এবাদ, আমি তোমাকে মোটেও ডাউট করি না।

এ সময় আফজাল মিয়ার আতঙ্কিত স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে আসে। এবাদ তাকে সান্ত্বনা দেয়, ও ভাবি, আপনার বাপের বাড়িতে কোন চোর-ডাকাত ঢুকেছিল, আমি সেই চোরকে খুঁজে বের করব। মালামালও উদ্ধার করার চেষ্টা করব। তা না হলে আমার ওপর আপনাদর সন্দেহ যাবে না।

আমাদের মালামাল ফেরত দিতে হবে না ভাই। আপনি এখন আমাদের ঘর থেকে জলদি বেরিয়ে যান। এদিকে রুবেলের আব্বা লোকজন জড়ো করেছে, লাঠি-বল্লম নিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। আপনাকে ধরে মারবে। তাড়াতাড়ি পালান আপনি।

স্ত্রীর আতঙ্ক-উত্তেজনা আফজাল মিয়ার মধ্যেও সহজে সংক্রমিত হয়। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। কিন্তু এধরনের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক থাকা ও সাহস দেখানো বুঝিবা এবাদ ডাকাতের অভ্যাস। হেসে জবাব দেয় সে, আমাকে ধরবে ? হা-হা-হা। আমি তো ধরা দেয়ার জন্যই ওনার কাছে এসেছি। কোথায় চেয়ারম্যান ভাই ?

আফজাল মিয়া তার ভয় গোপন করতে পারে না আর। এবাদের হাত চেপে ধরে বাচ্চা

www.pathagar.com

মানুষের মতো হাউমাউ করে প্রায় কেঁদে ওঠে, তোমাকে জোড় হাতে অনুরোধ করি, বড় ভাইয়ের হয়েও তোমার কাছে মাফ চাই, ঝগড়া কাজিয়া আমার ভাল লাগে না এবাদ। তুমি আমার বাড়ি থেকে যাও।

কিন্তু বড় ভাইয়ের সাথে আমার মোকাবেলা তো করতেই হবে। ওনার সাথে দেখা করার জন্যই আমি এসেছি।

যা কিছু করো, আমাকে জড়াইও না ভাই। তুমি যাও এখন।

ঠিক এ সময় বাইরে অনেক লোকজনের উপস্থিতিময় আওয়াজ— কোথায়, কোন ঘরে, কী করে ইত্যাদি ছাপিয়ে তোফাজ্জল চেয়ারম্যান-এর হুঙ্কার ভেসে আসে, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। দিনদুপুরে আমাকে খুন করার জন্য বাড়িতে ঢুকেছিস। আয় হারামজাদা, গ্রামবাসী দশজনের সমানে আমার বুকে গুলি চালা। কতো বড় ডাকাত হয়েছিস তুই! বের হ ঘর থেকে।

এবাদ ঘরের বাইরে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার পাশে সস্ত্রীক আফজাল মিয়া। আঙিনায় তোফাজ্জল ভূঁইয়া, তার জোয়ান বেটা রুবেলসহ সজনা গাঁয়ের ১৫/২০ জন মানুষ। সবার হাতে লাঠি-বল্লম। যেন বাঘ মারার তেজ নিয়ে লুঙ্গি কাছা মেরে লাঠি হাতে ছুটে এসেছে সবাই। ভিড়ের সামনে মুক্তাও রয়েছে।

তোফাজ্জল চেয়ারম্যান ডাক শুনে এবাদ ডাকাত হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র ভিড় যখন হতচকিত, ভয়ে পিছিয়ে যায় কেউ কেউ, এবাদ তখন হাত তুলে সালাম দেয় চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে।

পুরনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমি মিষ্টি নিয়ে আসলাম আপনার সাথে আপোস করতে। আমি ভাল হতে চাই, আর আপনি আমার মধ্যে আবার সেই খুনী এবাদ ডাকাইতের রূপ দেখতে চান ? আমাকে মারার জন্য আবার এতো লোকও জড়ো করেছেন ?

এবাদের একটি হাত কোমরে, জামার ভেতরে ঢুকে আছে। ভয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে একজন বলে, পিস্তল আছে বাহে! গুলি চালাইবে।

ঠিক তখন মুক্তা চেঁচিয়ে ওঠে, একজন লম্পট ডাকাতের সাথে আমাদের কিসের আপোস। আপনার মিষ্টি এ বাড়ির কুকুর-বিড়ালও খাবে না। চেয়ে দেখছেন কী আপনারা বড় আব্বা! মেরে ডাকাতটার হাতপা ভেঙে দেন। পিস্তল দিয়ে কয়জনকে গুলি করবে সে ?

ভিড়কে নেতৃত্ব দেয়ার মতো মুক্তার বীরঙ্গনা রূপ এবাদ অবাক হয়ে দেখে। কথা বলে একই রকম বেপরোয়া নিরুত্তাপ গলায়।

এবাদ ডাকাতকে মারা এখন এতো সহজ নয় মুক্তা। এবাদের একটা কিছু হলে তোমার বাপও এক নম্বর আসামী হবে। যারা লাঠি হাতে উপস্থিত হয়েছে, পুলিশ কাউকে ছাড়বে না। কিন্তু আমি যদি এখন পিস্তল বের করে গুলি চালাই, দুচারজন খুন করি— কিছুই হবে না আমার। শেখ মুজিবকে সবংশে উৎখাত করেছে যারা, তাদের কিছু হয় নাই। কারণ আপনার মুজিববাদী জামানা শেষ হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেব। আমাকে ধরার জন্য আপনারা রক্ষীবাহিনী পর্যন্ত দাবড়িয়েছেন, ধরতে পারেন নি। কিন্তু এখন আমার অনিষ্ট হলে সরকারি পুলিশ লাগবে না, আপনাদের খতম করার জন্য আমার নিজের বাহিনী যথেষ্ট।

আফজাল ভূঁইয়া এবাদকে আগলে সামনে এসে দাঁড়ায় এবং বড় ভাইয়ের উদ্দেশে চিৎকার করে, এবাদ আমার মেহমান। আমার বাড়ি থেকে লোকজন নিয়া আপনি সরে যান বড়

www.pathagar.com

ভাই। আপনার বাড়িতে যখন ঢুকবে, তখন তার সাথে খুন-খারাপি করেন। আমার এখানে নয়, যান আপনারা, বের হন আমার বাড়ি থেকে।

সেদিন রাস্তায় রিকসা আটকে তোর বেটিকে অপমান করল, তোর শ্বশুর বাড়ি ডাকাতি করল, আর সে আজ তোর বড় মেহমান হইল! যে আমাকে খুন করার জন্য শপথ করেছে, তার সাথে তোর আজ এত খাতির কেন ? এবাদ ডাকাইকে ঘরে বসায় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছিস, শালা ঘরের শত্রু বিভিষণ!

দু'ভাইয়ের ঝগড়ার মাঝে রুবেল মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকে নিয়ে প্রথমে পিতাকে শাসন করে, আহা আব্বা, চাচাকে খামোখা বকেন কেন ? মুক্তাই তো বুদ্ধি করে শয়তানটাকে ঘরে আটকে আমাদের খবর দিতে গেছে। ছোট চাচা, ও চাচীআম্মা আপনারা সরে যান। দেখি এবাদ ডাকাতকে ওর কোন বাপ আজ রক্ষা করে।

এবাদ এক হাতে আফজাল মিয়াকে জড়িয়ে ধরে এই প্রথম ডাকাত সুলভ আক্রোশে ফেটে পড়ে, এত বড় স্পর্ধা তোর! আমি পকেট থেকে পিস্তল বের করলে তোকেই প্রথম গুলি করবো । সবাইকে সরে যেতে বলো মুক্তা, তা না হলে তোমার বাপকেও আমি ছাড়ব না। এক মিনিটের মধ্যে আমার রাস্তা ক্লিয়ার কর সবাই, ভাগ, গেট আউট...

এবাদর চিৎকার শেষ হওয়ার আগে তোফাজ্জল ভূঁইয়া ছেলেক টেনে ধরে পিছু হঠে যায়। গ্রামবাসী লাঠি হাতে যারা এসেছিল, এবাদ ডাকাতকে চাক্ষুষ করাটাই যেন ছিল তাদের আসল শখ। শখ মিটে যাওয়ায় তারাও দ্রুত ভয়ে সরে দাড়ায়। পকেটে হাত রেখেই এবাদ ডাকাত গটগট করে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

এবাদ বেরিয়ে যাওয়ার পর ভিড়ের একটি ছেলে সাহসী মন্তব্য করে, কোমরে বন্দুক নাই বাহে, মিছামিছি ভয় দেখাইল। তখন রুবেলই প্রথম পিতার স্নেহবন্ধন খুলে লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে যায় খুনীর দিকে। তার পিছু নেয় অনেকেই। কিন্তু এবাদের মোটর সাইকেল ততক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে। পেছনে থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে, পেছনে একবারও না তাকিয়ে, এবাদ দ্রুত মোটর সাইকেল চালিয়ে দেয়। মোটর সাইকেলের শব্দ গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড়ের সাপ মারা ক্রোধ ও গতি লেলিহান হয়ে ওঠে। একজন বল্লম ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু এবাদ তখন সজনা গাঁয়ের সীমা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এবাদ ডাকাত সদলবলে পৌছার আগে তার টর্চের তীক্ষ্ণ আলোর নাচন প্রথমে নজরে আসে বাড়ির বুড়ো কর্তা, গুড়াতি ঘটকের।

কালিসাঁঝ উতরেছে সবেমাত্র। এরই মধ্যে বাড়িতে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা। এর প্রধান কারণ অবশ্য পাড়াগাঁয়ের বেশিষ্ট্য। বেলা ডুবলেই পাখিরা নীড়ে ফেরে, হাঁসমুরগি খোঁয়াড়ে এবং গরুবাছুর ঢোকে গোয়ালে। তারপর চরাচর নিঝুম। পোশা পশুপাখির স্বভাব এ বাড়ির মানুষের। সাঁঝবেলায় রাতের আহার সাঙ্গ করা অভ্যাস তাদের। অভ্যাসটা নিয়মে পরিণত করেছে কেরাসিন তেলের সংকট। আকালের সময় থেকে এ মূল্যবান দ্রবাটি ফি হাটে কেনা

www.pathagar.com

হয় না আর। চুলা নিভে যাওয়ার পর রাতের আঁধারের সাথে যুদ্ধ করার মতো জোর কুপির শুকনো সলতে পাবে কোথা? ফলে সন্ধ্যা হতেই ঘরে ঘরে গাঢ় অন্ধকার।

ঘরবাড়ি ছেড়ে সাঁঝের পর গুড়াতি ঘটক ও তার জোয়ান বেটারা বাইরে বড় একটা যায় না। সময়টা খারাপ। দেশ স্বাধীন হবার পর চোর-ডাকাতরাই সত্যিকার স্বাধীন হয়েছে। পথে একা পেলে ভূতের মতো সামনে খাড়া হয়, সবকিছু কেড়ে নেয়— পারলে পরনের লুঙ্গিটাও। গরুচোর তো আছেই, ছিঁচকেদের হাত থেকে মাটির হাঁড়ির খদকুড়োও বাদ যায় না। রাতের খাওয়া শেষ হলে তাই দরজা-কপাট লাগিয়ে শুয়ে পড়ে বাড়ির লোকজন। তারপরও অনেক সময় ঘরে ঘরে বিড়ির অগ্নিমুখ জ্বলে, মাগ-ভাতারে ফিসফাস গল্প চলে, কখনও বা জায়ে-জায়ে, ভাইয়ে-ভাইয়ে পাড়া কাঁপানো ঝগড়াঝাটি শরু হয়। কেন জানি না আজ সেসব নেই।

সন্ধ্যাতেই বাড়ি নিঝুম হওয়ার আর একটি বড় কারণ, গুড়াতি আজ ঘরে একা। বউ মরার পর থেকে বড় নাতিটা তার সঙ্গে শোয়। নাতির যেমন কেচ্ছা শোনার নেশা, দাদার গল্প বলার অভ্যাস তার চেয়েও বেশি। ঘরে দু'জন যতক্ষণ জেগে থাকে, মুখ চলে দু'জনেরই। সে ছাড়াও গুড়াতির মিঠে কথা ও হাসির গল্প শুনে অবসর কাটাতে অনেকেই আসে। বিশেষ করে গরমের সময় বাড়ির খুলিতে গাছতলায় গল্পগুজবের সান্ধ্য আসর বসে। সময়টা সেরকম নয় বলেই হয়তো আজ কেউ আসে নি। আর নাতি গেছে তার নানার বাড়ি। ফেরে নি এখনও। বিছানায় শুয়ে গুড়াতি যখন নীরবে হাবিজাবি কেচ্ছা শোনাছিল নিজেকে, এমন সময় ঘরে আলোর ঝিলিক। আকাশে মেঘ নেই, বজ্রপাতের আওয়াজ নেই, তবু ঘরে বিজলী বাতির নাচন আসে কোথেকে?

শিয়রের কাছের খিড়কি খুলে বাইরে তাকাতেই বুঝতে পারে গুড়াতি ঘটক, কে যেন টর্চলাইট ঘুরিয়ে জরিপ করছে তার বাড়িটা। রাস্তার দিক থেকে ভেসে আসছে আলোটা। কিন্তু এ আলোর সঙ্গে এবাদ ডাকাতের সম্পর্ক দূরে থাক, কোনোরকম সন্ত্রাসের সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ জাগে না বুড়োর মনে। সন্ধ্যাবেলা ডাকাতদল তার বাড়িতে আসবে কি নিতে? তবু যে চকিতে বুকখানা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, তার কারণ ভিন্ন স্মৃতি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাস্তায় এরকম আলোর ছটা দেখে গ্রামে মিলিটারি এলো— আতঙ্ক-রব উঠেছিল। মিলিটারির ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল সবাই, গুড়াতি নিজেও। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আর কিছু না হোক, অন্তত বেজাত পাকসেনাদের ভয়টা কেটেছে। মাহাম গুড়াতি তাই গলা ছেড়ে খেকিয়ে ওঠে, কাঁয় রে? বেআক্কেলের মতো টর্চ বাত্তি ফোকাস করে কোন শালা?

টর্চের আলো সর্বশেষ খিড়কি পথে গুড়াতির মুখখানা ঝলসে দিয়ে নিভে যায়। বাড়ির খুলিতে এসে দাঁড়ায় কয়েকটি ছায়ামূর্তি। জবাব ভেসে আসে এবাদ ডাকাতের কণ্ঠে, তোমার বাড়িটাই খুঁজতেছি ঘটক দাদা। ঘর থাকি বারায় আইস।

যারা এবাদ ডাকাতকে চেনে এবং জানে, তাদের কাছে তার ভালমানুষি কথার সুর ও ধরন অজানা নয়। এত বড় ডাকাত, কিন্তু গলার স্বর আশ্চর্য কোমল। মাহাম গুডাতি বিস্ময়ের ধাক্কায় আরো চেচাঁয়, কায় তোমরা?

আমি এবাদ।

কোন এবাদ?

www.pathagar.com

সর্বহারা এবাদ। ঠাকুরপাড়ার এবাদ। তোমার খোঁজেই অনেকদিন বাদে ওকড়াবড়িতে আসলাম দাদা।

মাহাম গুড়াতির জবান বন্ধ হয়ে যায় এবং বুক ধকধক কাঁপতে থাকে। মাত্র কিছুদিন আগে ওকডাবাড়ির ধনী গেরস্ত শরফ হাজির বাড়ি ডাকাতি করেছে এবাদবাহিনী। কোথাও ডাকাতি করতে গিয়ে এবাদ ডাকাত নাকি এভাবেই নিজেকে সর্বহারা পরিচয় দেয় এখনো। গুড়াতি ঘটক অন্ধকারে এবাদ ডাকাত ছাড়াও তার দলবলকেও সনাক্ত করতে পারে। সন্তর্পনে খিড়কি বন্ধ করে দেয়ার পর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ও তার দিশেহারা বিহ্বল অবস্থা হৃদপিণ্ডের ধকধক আওয়াজখানা জানান দেয় শুধু। প্রথমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং পরে অন্য ঘরে শায়িত জোয়ান বেটা মকবুল ও সদরুলকে চেঁচিয়ে ডাকতে চায়। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরয় না।

আরে কী হইল বাহে বুড়ার বেটা। সাঁঝ লাগতে না লাগতে এ বাড়ির মানুষ সব নিদ গেছে নাকি? বের হয়ে আইস তাড়াতাড়ি, না হইলে দরজা ভাঙিয়া তোমাকে হাইজাক করব কিন্তু।

সাথীদের একজন ঠাট্টার গলায় কথা বললে এবাদ তাকে ধমক দেয়, এই, তোরা চুপ কর। ও গুড়াতি দাদা, আপনি কি ভয় পাইছেন? কোনো ভয় নাই— তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে। বারায় আইস।

ভয়ের চোটে গুড়াতি তার ঘটক পরিচয়টাও ভুলে গিয়েছিল। পূর্ব পুরুষের গুড় বানানো পেশা বন্ধ হয়েছে অনেক আগে। হাটে গিয়ে গুড়ের দোকান দেয় না সে আর, কিন্তু মাহাম গুড়াতি যে এখন গুড়াতি ঘটক হিসেবে দশ গাঁয়ে পরিচিত এবং বিয়েশাদির প্রয়োজনে ঘটকের কাছে ডাকাতের আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। এ কথা ভেবে নিজেকে ফিরে পায় সে।

গলা খাকারি দিয়ে নিজেকে সাহস ও সান্ত্বনা দেয় ,ভয় পাইম ক্যানে রে? এতক্ষণ যে ম্যাচ বাতি খুঁজিনো হামরা। ম্যাচ নাই, লম্ফতে তেল নাই। গুড়াতির ঘরে আছে বা কী চ্যাট, এবাদ ডাকাইত আসি তার কী বালটা ছেড়বে।

বাইরে আবার টর্চ লাইট জ্বলে ওঠে। গুড়াতি ঘরের দরজা খুলে উঠানে নেমে ছেলেদের ঘরের দিকে তাকায়। গোটা বাড়িতে কবরের স্তব্ধতা। ছেলেরাও কি তার মতো ভয়ে বোবা কালা বনে গেছে? বাড়িতে ছিচকে চোরের আগমন টের পেলেও মানুষ গলা ছেড়ে চেঁচায়। এটাই রীতি। বিপদগ্রস্ত মানুষের চিৎকার রাতের স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করলে পাড়া-পড়শীরা সাড়া দেয়, লাঠি হাতে ছুটে আসে। কিন্তু এবাদ ডাকাতের বিরুদ্ধে সেরকম প্রতিরোধ চলে না। গায়ের জোরে দশজন মানুষও তুচ্ছ তার কাছে। তাছাড়া সঙ্গে আছে নানারকম আগ্নেয় অস্ত্র। ঘুমন্ত ছেলেদের জাগাতে গিয়ে নিজে আরো সাহস সঞ্চয়ের জন্য গুড়াতি ঘটকের অন্তর্গত ভয় ভাবনাও উত্তেজিত এবং সরব হয়ে ওঠে, ও মকবুল। ও সদরুল। আরে বাহে এবাদ হামার কোনো অনিষ্ট করবে না। এবাদ মোর নিজের নাতির মতো। ঠাকুরপাড়ায় তিন-চারটা সম্বন্ধ হইছে মোর দ্বারা। তা এবাদ দাদা কী মনে করিয়া গরিবের বাড়িতে—

টর্চের আলো এবার বাড়ির আঙিনায় চক্কর দেয়। মুখোমুখি খড়ের চালাঘর তিনটির বন্ধ দরজা-কপাট পর্যন্ত ঘুরে আলোটা নিভে যেতেই গুড়াতিকে ঘিরে দাঁড়ায় তিনজন। গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে এবাদ ডাকাত, ও দাদা, তোমার বেটাদের ডাকেন ক্যানে? বললাম যে জরুরি কথা আছে তোমার সাথে।

www.pathagar.com

ঠিক আছে ভাই, ঘরে বইস। পানসুপারি খাও। ও মকবুল, বাতিটা নিয়া সকাল বারাও বাহে।

ঘরে বসে এসব কথা হবে না দাদা। আমার সাথে বাইরে চলেন একটু।

লম্বা ছুরি হাতে অচেনা ডাকাতটি চেঁচিয়ে সাহস দেয়, আরে ও ঘটক দাদা, এতো ভয় পান ক্যানে ? জানেন না সর্বহারা এবাদ ডাকাইত গরিবের বন্ধু ? আকালের সময় তোমার গ্রামের গরিব মানুষরা কি হামার ওস্তাদের সাহায্য পায় নাই ?

ডাকাইত দলের হাতে আত্মসমর্পন করে গুড়াতির ভয় কিছুটা কমে। সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হওয়ার জন্য ওদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলে, এবাদ কি হামার পর ? এ গ্রামে মোর মতো আর কোন মানুষটা তাকে বেশি চেনে ? ওদিন বাজারেও তো দেখনো তাকে মোটর সাইকেলে।

আঙিনা থেকে বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা ও ডাকাত দলের অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার পর ঘরবাড়ির অন্ধকার এবং স্তব্ধতা যখন আগের মতো স্বাভাবিক, গুড়াতির জোয়ান ছেলেদের ভিন্ন ঘরসংসারে প্রাণের সাড়া ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে মকবুল। বাবার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে স্বগত প্রশ্ন করে, এবাদ ডাকাইত বাবাকে কোন্ঠে ধরি নিয়া গেল ? ক্যানে ধরি নিয়া গেল ? ও সদরুল, উঠিস না ক্যানে ? বাড়িতে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটি গেল, হারামজাদা মনে হয় এবাদের ভয়ে ডুলির ভেতর পলায় আছে।

সদরুলের ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। তার স্ত্রী জানায় যে, এবাদ ডাকাতের গলা শুনেই মরদটি তার দরজা খুলেই বাড়ির পেছন দিকে চম্পট। এদিকে একা মেয়েমানুষ সে, ছাওয়া-পোয়া ছাড়ি না পারে চিল্লাতে, না পেরেছে পালাতে। চিৎকার করতে না পারার মুলে যে ভয়, সেই ভয়ের কারণ বউটি ব্যাখ্যা করে না আর ।

এ বাড়িতে একমাত্র তাদের ঘরেই নগদ কিছু টাকাপয়সা এবং ছয় আনা ওজনের সোনার জিনিস রয়েছে। গুড়ের দোকান করে সদরুল গুড়াতি। বদরগঞ্জ উলিপুর হাট থেকে পাইকারি দরে গুড় কিনে আনে। হাটেবাজারে খুচরা বেচে। আবার ধানের মওসুমে গুড়ের ভার নিয়ে গ্রামে ঘোরে। সদরুল গুড়াতির ব্যাবসার খবর চোর-ডাকাতদের অজানা থাকার কথা নয়। চোর, পিঁপড়ে এবং বাড়ির ছেলেপুলেদের ভয়ে গুড়ের ভার সে ঘরের ছাদের বাঁশে ঝুলিয়ে রাখে। ঘরে ঢুকলে ডাকাতদের টর্চলাইটের আলো সদরুলের ব্যবসাপাতির ওপর পড়াই স্বাভাবিক। এবাদ ডাকাতের কণ্ঠ শোনামাত্র সদরুল তাই ঝোলানো গুড়ের ভার নামিয়ে চৌকির তলায় রেখেছে। ছোট বাক্সটা খুলে দোকানের তবিল কোমরে বেঁধেও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। বাবা ঘর থেকে বেরুনোর আগেই নিজে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। এদিকে তার স্ত্রী শেষ সম্বল সোনার জিনিস জোড়া নিয়ে পড়েছে মুশকিলে। মানুষের লোভী নজর লাগার ভয়েই সে কানের মাকড়ি জোড়া কানে রাখে না। একটা কৌটায় ভরে তালাবদ্ধ বাক্সে রেখেছিল। স্বামী বাক্স খুলে নিজের তবিল নিয়ে পালাবার পর বউটি তার সোনার কৌটা কোথায় লুকিয়ে রাখবে ভেবে পায় না। শেষে স্বামীর কোমরে তবিল বাঁধার মতো মাকড়ি জোড়া সে নিজের শাড়িতে বেঁধে ফেলেছে। বিপদ কেটে যাওয়ায় ঘর থেকে বেরিয়ে সে স্বামীকে খোঁজে, কোন্ঠে পলায় গেইলেন হবির বাপ ? ডাকাইতরা চলি গেইছে।

মকবুলের স্ত্রী গোয়াল ঘরে ঢুকে পরীক্ষা করে— গরু দুটি ঠিক আছে কি না। গরুসহ বাড়ির সবকিছু ঠিকঠাক থাকার খুশিতে মকবুল সাময়িকভাবে পিতাকে হারানোর শোক ও বিস্ময়

www.pathagar.com

ভুলে যায়। এবাদ ডাকাতের প্রশংসায় উচছ্বসিত হয়ে ওঠে।

চেনেন তোমরা এবাদ সর্দারকে ? তার দলের ডাকাইতরা কখনও গরু চুরি করে না, হামার মতো গরিব গেরস্তের কখনও ক্ষতি করে না। এই মুল্লুকের যত ধনী গেরস্ত-মহাজন— এবাদ ডাকাইতের নাম শুনলে ভয়ে পেসাব করে। আর চিরকুট পাইলে ধনী মানুষেরা এবাদের কাছে টাকা দিয়া আইসে। আল্লা রে আল্লা, সেই এবাদ ডাকাইত আজ হামার বাড়িতে আইল ক্যানে ? বাবাকে ধরি নিয়া গেল কোনঠে ?

মকবুলের জিজ্ঞাসা, আতঙ্ক, বিস্ময় এবং বিপদমুক্তির আনন্দে শরিক হতে সদরুল ছাড়াও অনেকেই গুড়াতির বাড়ির উঠানে জড়ো হতে থাকে। বাড়ি থেকে পালিয়ে সদরুল চুপচাপ বসে থাকে নি। এবাদ ডাকাতের আগমনের খবর অনেক বাড়িতে শুনিয়েছে, চোরের মতো সতর্কতায় ফিসফাস স্বরে এবাদ ডাকাতের আতঙ্ক ছড়িয়েছে প্রতিবেশী বাড়িগুলিতে। এবাদের দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মৌখিক সাহস পর্যন্ত দেখায় নি কেউ। কিন্তু নিজস্ব জানমাল রক্ষার জন্য সতর্ক হয়ে উঠেছে সবাই। সদরুলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল যারা, উঁকিঝুকি দিতে দিতে একে একে তারা সবাই গুড়াতির বাড়ির দিকে আসতে থাকে।

এমনিতে গ্রাম-সমাজে চোর,ডাকাত,ভূত বা সাপের মতো সাধারণ শত্রুর প্রসঙ্গ উঠলে লোকের গল্প শেষ হতে চায় না। সেখানে জীবন্ত কিংবদন্তীসম এবাদ ডাকাত বলে কথা। যার সর্বশেষ কীর্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে এসেছে লোকগুলি। ডাকাতের দল চলে যাবার পরও তাদের উপস্থিতির উত্তেজনা ও আতঙ্ক লোকজনের কথায় নতুন করে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। বুড়ো গুড়াতিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ আবিষ্কারে সচেষ্ট সবাই।

ঘটকালি কবার নামে বেকার লোকটা সারাদিন টইটই করে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রী আছে যে বাড়িতে, সেই বাড়ি যেন ঘটকের নিজের বাড়ি। প্রায় দিনেই দিনের খাবারটা এরকম কোনো নিজের বাড়িতে সারে ঘটক। কিন্তু আকালের দিনে মানুষ তো বিনা স্বার্থে ডাকে না। বিয়ের সম্বন্ধ হোক বা না হোক, কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে শুভ ঘটনার সম্ভাবনা জাগাতে হয় মানুষের মনে। এমনি কী আর মানুষ বলে, গুড় বেচে না ঠিক, কিন্তু গুড়ের মতো মিঠে কথা বেচে পেটের ভাত যোগায় গুড়াতি ঘটক। বেশি কথা আর মিঠে কথা মানে বিস্তর মিছে কথা। নিশ্চয় কোথাও বড় ধরনের কথার বরখেলাফ হয়েছে কোনো। কিংবা এবদ ডাকাতের বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা বলেছে কোথাও। বিচার করার জন্য গুড়াতিকে তাই বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে এবাদ ডাকাতের দল।

পাল্টা অনুমান জোর গলায় প্রকাশ করে আর এক প্রতিবেশী, খালি কি পাত্র-পাত্রীর খবর জানে গুড়াতি চাচা ? এ তল্লাটের দশগ্রামের কোন গেরস্তের অবস্থা কেমন, কার কেমন টাকার জোর, গুড়াতির চাইতে সেই খবর আর সঠিক জানে কাঁয় ? এবাদ ডাকাইত মনে হয় তার কাছে শিকারের সন্ধান নেবে।

শিকার করতে বুড়াকেও আজ সাথে নিয়ে গেল নাকি ?... ও মকবুল ভাই, তোর বাপ এবাদবাহিনীতে নাম লেখাইলে আর কোনো অভাব থাকবে না তোমার।... ডাকাইতের গোষ্ঠী মারি হামরা। গ্রামের মানুষ এক জোট হয়া আগায় আইলে হামার বাবাকে কী আর ধরি নিয়া যাইতে পারে... এবাদসুদ্ধা সব কয়টাকে আজকে খতম করা গেল হয়...

www.pathagar.com

সদরুলের এবাদবিরোধী ক্রোধ দেখে স্তম্ভিত হয় ভিড়ের সবাই। এ যেন হাতির বিরুদ্ধে ইঁদুরের যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু এবাদ ডাকাতকে খতম করা যে সহজ কর্ম নয়, সেটা প্রমাণ করতে অতপর এবাদকে নিয়ে কথাবার্তা হতে থাকে নানারকম।

প্রায় চার মাইল দূরের গ্রাম ঠাকুরপাড়ায় এবাদের বাড়ি। পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে এবাদকে জানার সুযোগ এ গ্রামের সব মানুষ পায় নি ঠিকই, কিন্তু এবাদ ডাকাইতের নাম জানে দুধের বাচ্চাটিও। থানার দারোগাপুলিশ যেমন নিজেদের চেনাতে বিশেষ ড্রেস পরে, নিজেকে চেনাতে এবাদকে তেমন পোশাক পরতে হয় না। নাম ও চেহারাখানাই যথেষ্ট। কালো, লম্বা, স্বাস্থ্য উপচানো নির্মেদ শরীর। গোঁফের প্রান্ত ঠোঁটের নিচে ঝুলে থাকে। লম্বা গোঁফ যেমন, দাঁতও তেমনি তার কম ধারালো নয়। মাঝে মাঝে গোঁফের প্রান্ত নিজের মুখে নেয়, ক্ষুর কাঁচির দরকার নেই, দাঁত দিয়েই গোঁফ ছেটে সরু ও সমান করে নেয় এবাদ। প্রত্যক্ষদর্শী একজন এ তথ্য জানায়।

এবাদ ডাকাতের হিংস্র দাঁতের ধার পরখ করার মতো তার দৈহিক শক্তি নিজের সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করার সুযোগ হয়েছিল একজনের। সে মন্তব্য করে, ডাকাইত হওয়ার আগে এবাদ আছিল নামকরা হাডুডু প্লেয়ার। একবার তার টিমের সাথে হামরা খেলতে গেইনো। দশজন মিলে তাকে জাপ্টে ধরলো। বিশ্বাস করবেন না বাহে— এমন একটা মোচড় দিল সে, দশজন হামরা দশ হাত দূরে ছিটকায় পড়নো।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার পাশে এবাদ সম্পর্কে শোনা গল্পের ঝুলিও কম সমৃদ্ধ নয়। সেই গল্পের ঝুলি থেকে, লোকের মুখে মুখে এবাদ ডাকাত সম্পর্কে নানারকম তথ্য ও মন্তব্য ঝরতে থাকে : শরীলে বাঘের নাকান তেজ না থাকলে জেলের পাচিল লাফ দিয়া পার হবার পারে... আরে বাহে জেল হইতে পালায় নাই, সরকার নিজের দলে টানার জন্য সাজা মাপ করিয়া দিছে... কিন্তু জেল হইতে ছাড়া পবার পর এবাদ ডাকাইতে এলা মোটর সাইকেলে চড়িয়া দিনদুপুরে ডাকাতি করে— জানেন সে খবর ? ....সরকার ডাকাইত পুষলে হামরা যামো কোণ্ঠে... সেদিন শরফ হাজির বাড়ি ডাকাতি করিয়া আজ আবার সে ওকড়াবাড়ি আইল কোন উদ্দেশ্যে... সেদিন সজনার তোফাজ্জল চেয়ারম্যান নাকি এবাদ ডাকাইতকে দেখিয়া ভয়ে পরনের কাপড়চোপড় নষ্ট করি দিছে... আর শামসুদ্দিন চেয়ারম্যান বাপ দায় দিছে এবাদকে... মেম্বার চেয়ারম্যানের কথা বাদ দাও, ও শালারা হইল চোরডাকাতের জাত... থানা পুলিশ পর্যন্ত এবাদকে দেখলে এখন থরথর করি কাঁপে... পুলিশের গোয়ায় লাথি দিয়া এবাদ একবার পুলিশের রাইফেল কাড়ি নিছিল যে...

এবাদ ডাকাতকে নিয়ে বাড়িতে যখন গলাগল্প জমে উঠেছে, গুড়াতি ঘটক চোরের মতো ফিরে আসে চুপচাপ এবং একা। সবাই তাকে ঘিরে ধরে নানামুখী জিজ্ঞাসায় সোচ্চার, কিন্তু জবাবে মাহাম গুড়াতি ধমক দেয় শুধু, চিকরাইতে চিকরাইতে মোর গলা ভাঙি গেলো, তবু একটা মানুষ আগায় আসে নাই। আর এলা, চোর পালায় দেবী দেখার জন্য আসছেন। ভাগো সাগাই, এবাদ ফিরি আসি দেখলে গুলি চালাইবে কইলাম।

গুড়াতি ঘটকের এরকম বেরসিক আচরণের পর এবাদ সম্পর্কিত গল্পের আসর দ্রুত ভেঙে যায়। রহস্যপূর্ণ ভয় নিয়ে যে যার ঘরে চলে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

বাবার পিছু পিছু তার ছেলে এবং ছেলদের পিছুপিছু তাদের স্ত্রীগণও ঘরে ঢোকে। ডাকাতের হাত থেকে বুড়ো বহাল তবিয়তে ফিরে আসায় তারা যতটা আনন্দিত, তার চেয়ে কৌতুহল আরো বেশি। ফিসফাস স্বরে সবাই প্রশ্ন করে— এবাদ ডাকাইত তোমাকে কী কইল বাবা ?

কিছুই কয় নাই।

তা হইলে ধরি নিয়া গেল ক্যানে ?

এমনি।

কোণ্ঠে নিয়া গেছিল তোমাকে ?

জানো না মুই।

পাগল হইলেন নাকি বাজান! হায় আল্লা! বাজানকে ধরি নিয়া যায়া ডাংডুং দিছে নাকি ?

গুড়াতি ঘটক এবাদ ডাকাতের মতো গর্জে ওঠে, ভাগো মোর ঘর থাকি। দূর হ্ শয়তানেরা।

আপনজনদের ঘর থেকে ভাগিয়ে দেয়ার পর দরজা বন্ধ করে গুড়াতি ঘটক লুঙ্গির খুট থেকে টাকাটা বের করে হাতে নেয়। এবাদ ডাকাতের কাছ থেকে পাওয়া এই টাকার গন্ধ যদি বাড়ির স্বজনেরা শুঁকতে পারে, বিপদ হবে। টাকাটা হাতে নিয়ে বিছনায় বসে সে বিপদ ঠেকানোর উপায় ভাবে। কিন্তু মাথায় কোনো উপযুক্ত বুদ্ধি ধরা দেয় না। তখন সন্তর্পনে হাতের টাকাটা গুণতে থাকে। কিন্তু টাকার রং ও ছবি না দেখে টাকা গোণার কাজটি নিজের মনেও সন্দেহ জাগায়— সত্যি কি তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল ? নইলে অন্ধকারে সে টাকা গুণছে কেন ? আল্লা মাবুদকে স্মরণ করে সে বিছনায় ঢলে পড়ে।

সকালের আলো ফোটার আগে, মোরগের বাক শুনে দিন শুরু হয় মাহাম গুড়াতির। ভোরের আবছা আঁধারে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের সময় বাড়তি পর্দা হিসেব কাজ করে। তারপর ফজরের নামাজ পরে সে। কিন্তু আজ ঘুম ভাঙে দেরিতে। মকবুল গোয়াল থেকে তার গরু বের করে পোয়ালখড়ের গাদায় বেঁধে দিয়েছে। আঙিনা ঝাট দিচেছ ছোটবউ। মুখ না ধুয়েই বাইরে যাওয়ার জন্য জামা-সেন্ডেল-ছাতা খোঁজে গুডাতি। ঝাটা হাতে বউ জানতে চায়, সাতসকালে কোণ্ঠে যান বাবাজান ?

জবাব না দিয়ে গুড়াতি ঘটক থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

পথে গ্রামবাসী দু'জন লোক এবাদ ডাকাতের প্রসঙ্গ তুলে রাতের ঘটনা জানতে চায়। কিন্তু মোর এলায় ফ্যাদলা পাড়ার সময় নাই বাহে— জবাব দিয়ে, গুড়াতি ঘটক হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। পায়ের সেন্ডেল জোড়া হাতে, কাঁধের আলনায় ঝোলানো ময়লা পাঞ্জাবি, ছাতাটাও বাঁকের মতো কাঁধে নিয়েছে। মসজিদ পেরুতেই নাতি সম্পর্কে যুবক মুখের দাতন হাতে নিয়ে ঘষা দাঁত দেখায় এবং বলে, কী দাদা। ফুটিল বিহানবেলা মোটরসাইকেল স্টার্ট দিয়া যান কোথায় ? থানায় নাকি ?

গুড়াতি ঘটকের হাঁটার গতি ও ছন্দে মোটরসাইকেলের উপমা বেমানান। তবুও লোকজন ঠাট্টা করে এরকম বলে। তাতে অবশ্য কিছু মনে করে না গুড়াতি। বরং এই বয়সে রোজ আট-দশ মাইল পথ ভেঙে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করতে পারার জন্য গর্ববোধ করে। পথে

www.pathagar.com

পরিচিত লোকজন দেখলে বারবার ব্রেক কষেও বিরক্ত হয় না। কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে ঘটক মোটরসাইকেলের মতো শব্দময় ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার চেষ্ট করে। কিন্তু আজ পরিচিত ছেলেটির প্রশ্নের মুখে সে চমকে ওঠে, গন্তব্য আড়াল করার জন্য হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দেয়, হয় রে হয়। থানার দারোগার বেটির সাথে তোর বিয়ার ঘটকালি করিতে যাই।

ও দাদা, তার পাছে বা এবাদ ডাকাইত গুলি করিয়া তোমার মোটরসাইলেরে চাকা পাংচার করি দেয় ?

গুলিবিদ্ধ হওয়ার শঙ্কা নিয়ে ঘটক ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটিকে দেখে। তার হাসি দেখে সন্দেহ হয়। রাতের ঘটনার যেন সবটাই জানে সে। আজকাল অনেক বেকার ভালো ছেলেরাও গোপনে এবাদের দলে যোগ দিয়েছে। এই ছেলেটিও এবাদবাহিনীর সদস্য নয় তো ? রাতে এবাদ স্বয়ং যে হুমকি দিয়েছে, ঠাট্টার ছলে নাতি আসলাম তা স্মরণ করিয়ে দেয় যেন। গুড়াতি ঘটকের হাঁটার গতি বেড়ে যায়। রাতে অনুষ্ঠিত গোপনে বৈঠকে এবাদ ডাকাতের কথাবার্তা স্মরণ করে বুক ধুকফুক করে।

প্রায় চার মাইল পথ একটানা ছোটার পর গুড়াতি ঘটক সজনার বড়বাড়িতে ঢোকার মুখে বাধা পায়। তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের কথা শুনে তার গায়ে ধাক্কা লাগার মতো প্রতিক্রিয়া হয় ঘটকের।

কী বাহে গুড়াতির বেটা, যান কোথায় ?

কোথাও না বাবা। এমনি আইলাম বেড়াইতে।

হুম। তা এবাদ ডাকাইত আবার ওকড়াবাড়িতে হানা দিছে নাকি ?

ডাকাইতের খবর মুই না জানো বাবা। যাই বাবা, দেখি মাইওকে একবার দেখিয়া যাই।

চেয়ারম্যানকে পাশ কেটে গুড়াতি ঘটক আফজাল মিয়ার আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ায়। নতুন তৈরি দালানে চোখ রেখে হাঁপানো কণ্ঠে আস্তে আস্তে ডাক দেয়, দামান্দ বাহে, আছেন কি বাড়িতে ? ও দামান্দ বাবাজি...

ঘর থেকে মুক্তাই বেরিয়ে আসে প্রথম। নানার বাড়ির গাঁয়ের লোক হিসেবে গুড়াতি ঘটককে মুক্তা নানা ডাকে। আর গুড়াতিও মাসে দু'চার বার এ বাড়িতে আসে আপন মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসার আন্তরিকতা ও অধিকার নিয়ে। নাতনী সম্পর্কিত মুক্তার সঙ্গেও প্রচুর হাসি-তামাসা হয়। এবং প্রতিবারই হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে একটি কথা জোরগলায় ঘোষণা করে গুড়াতি ঘটক, পড় বুবু, মন দিয়া লেখাপড়া কর। তোর বিয়ার জন্য জজব্যারিস্টার পাত্তর খুজিম মুই। তোর বাপকে এক পয়সাও ডিমান্ড দিতে হবে না ইনশাল্লা।

ঘটকের এ ধরনের আশ্বাস ও আন্তরিকতায় বাবা-মায়ের খুশি হওয়ার মতো কারণ থাকলেও মুক্তা বেশ রাগ করে। মুখের ওপর পাল্টা জবাব দেয়, পাত্তর খুঁজতে হবে না বুড়া। আমি তোমাকেই বিয়া করবো। তখন আমোদ রাখার জায়গা পায় না গুড়াতি। স্বামীর অধিকার নিয়ে নিজেও এমন পাল্টা ঠাট্টা-মসকরা করে, লজ্জা না পেয়ে উপায় থাকে না মুক্তার। সে ধরনের লজ্জা প্রতিরোধ করার জন্যে ঘটককে স্বাগত জানাবার পাশাপাশি হুঁশিয়ার করে সে, সাত সকালে কী মনে করি নানা ? ফালতু আলাপ কিন্তু আজ একটাও করবেন না কয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

নাতনীর বকাঝকা খেলে নানার হাসি-খুশি উপচে ওঠে। কিন্তু আজ গুড়াতির চেহারা অন্যরকম। মুক্তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে জানতে চায়, তোর বাপ কি অফিসে গেছে বুবু ?

অফিসে যাওয়ার জন্য আফজাল মিয়ার ফনিকস বাইসাইকলখানা আঙিনার কোণে প্রস্তুত। নিজেও প্রস্তুত হওয়ার জন্য সবে স্নান করেছে সে। উঠানের বাঁশে শুকাতে দেয়া ভেজা লুঙ্গি-গামছা তার প্রমাণ। মুক্তার মাথা নাড়ানো না জবাব দেখে আশ্বস্ত হয় গুড়াতি ঘটক। কিন্তু হনহনিয়ে ছুটে আসা সার্থক হওয়ার পরেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মুক্তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মন্তব্য করে, কী কপাল নিয়ে জন্ম নিছিস রে বুবু আল্লাই জানে।

পাকা ঘরের বারান্দা থেকে চেয়ার বের করে উঠানে পেতে দেয় মুক্তা। জবাব দেয় ঝগড়াটে গলায়, আমার কপাল নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না বুড়া। কপালের লিখন কি আর তুমি খণ্ডাতে পারবে ?

মুক্তার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কুশল জিজ্ঞেস করে, কেমন আছেন চাচাজি ? হামার বাড়ির খবর কী ?

জবাবে গুড়াতির অশুভ উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মা রে, তোমার বাড়ির খবর ভাল, কিন্তু মোর খুব খারাপ খবর। দামান্দ কই ? দামান্দের সাথে মোর জরুরি কথা আছে।

জামাই খেতে বসেছে শুনে শ্বশুর স্থির হয়ে বসতে পারে না আর। চেয়ারের ওপর ছাতাটি এবং সেন্ডেল জোড়া রেখে অযাচিত ঘরে ছুটে যায় এবং বলে, ও দামান্দ, অফিসের আগে আপনাকে ধরার জন্য হোকর হোকর করি দৌড়ায় আসিনো বাবা।

খাওয়ার সময় সকালে বাড়িতে অবাঞ্ছিত অতিথির আগমনে আফজাল মিয়া স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে ওঠে। তার ধারণা, খাওয়ার লোভেই লোকটা হরহামেশা এ বাড়িতে আসে। খেতে বললে না করে না কখনো। ভাত না পেলেও চেয়ে-চিন্তে এক কাপ চা ও এবং পান-সুপারিটুকু নিশ্চিত পায়। আর প্রচুর কথা বলে। শ্বশুরের পাড়া-পড়শী হিসেবে গরিব গুড়াতির এমন উৎপাত সহজে মেনে নিতে পারত আফজাল মিয়া। কিন্তু মেয়ে বড় হবার পর ঘটক হিসেবে তার আগমন বিরক্তির আর একটা প্রধান কারণ। এ পর্যন্ত দুটি প্রস্তাব এনেছিল গুড়াতি ঘটক। কানে তোলার মতো নয় একটিও। স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিল আফজাল মিয়া, গ্রামে নয়, শহরের কোনো চাকরিজীবী শিক্ষিত ছেলের কাছে মেয়েকে দেবে সে। তেমন যোগ্য ছেলের খোঁজ পেলে ঘটক যেন এ বাড়িতে আসে, তার আগে নয়। তারপর থেকে লোকটা মুক্তার জন্য জজ-ব্যারিস্টার পাত্তরের আশ্বাস শোনায়। বাস্তবে হয়তো এ দুনিয়ার সরকারি চাকরিজীবী একজন মাত্র ভদ্রলোককে চেনে গুড়াতি ঘটক এবং সে লোকটি আবার আফজাল মিয়া নিজে। মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ স্বপ্ন-কল্পনায় স্ত্রী সেদিনও গুড়াতি ঘটকের প্রসঙ্গ তুললে আফজাল মিয়া তাই জবাব দিয়েছিল, মুক্তার জন্য যোগ্য ছেলের সন্ধান করা গুড়াতি ঘটকের কাজ নয়। তার চাইতে আমার নিকার জন্য কোনো বিধবা ডবকা মেয়ে খুঁজতে বল। তোর গেরস্থালি কাম করবে, আমার কামও চলবে।

দাম্পত্য ঠাট্টাটি স্মরণ করে ঘটকের প্রতি বিরক্তি বোধ কিছুটা কমে আফজাল মিয়ার। তবু কথা বলে শ্লেষের সঙ্গে, খাওয়ার পাতে আসি হাজির হইলেন ঘটক চাজি। খবর কী ?

www.pathagar.com

যে খবরটি গত রাত থেকে পেটের ভেতর চেপে রেখে আছে গুড়াতি, আফজাল মিয়াকে দেখে তা এতটা জোরালো বেগ সৃষ্টি করে যে, তার খাওয়ার পাতে বমির মতো খবরটা উগড়ে দিতে পারলেই সে স্বস্তি পেতো। কিন্তু তাতে আফজাল মিয়ার খাওয়ার শান্তি নষ্ট হবে ভেবে নিজেকে সংযত করতে গুড়াতি দুবার ঢোক গেলে। আগাম সান্ত্বনা দেয়, আগে শান্তি করি খাওয়াটা শেষ করেন দামান্দ। বাড়িতে দেখা না পাইলে আপনার অফিসে ছুটে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। সেই জন্যে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসলাম।

কী এমন জরুরি ব্যাপার ?

আছে বাবা, ভীষণ জরুলি ব্যাপার। আগে আপনি আচুদা করি খান তো।

খাওয়ার সময় উপস্থিত মেহমানকে খেতে বলাটাই রীতি। তাছাড়া গুড়াতি ঘটকের এ ধরণের ভূমিকা ও ভনিতা দেখে মনে হয়, জরুরি ব্যাপারটা আসলে সুখবরও হতে পারে। এরকম ভেবে অতিথির জন্য প্লেটে ভাত বেড়ে দেয় আফজাল মিয়ার স্ত্রী রোকেয়া। একবার বলা মাত্র জামাইয়ের পাশে বসে গুড়াতি ঘটক। খাদ্যের বদলে জামাইয়ের দিকে মনোযোগ বেশি। ভাতে হাত রেখে বলে, ও দামান্দ, পেটের খিদা, চক্ষের নিদ, আর মনের শান্তি— সউগ আমার শেষ হইছে বাবাজি।

আফজাল মিয়ার বিরক্তি ধমক হয়ে ঝরে, তাড়াতাড়ি খেয়ে যা বলতে আসছেন বলে ফেলেন। আমার অফিসের বেলা যায়।

খাওয়ার পর বিছানায় লম্বা হয়ে অন্তত মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নেয়া অভ্যাস আফজাল মিয়ার। তা না হলে সাইকেল চালাতে অস্বস্তি হয়। বিশ্রামের সঙ্গে পান খাওয়া ও সিগারেট টানার তৃপ্তি উপভোগ করে সে। গুড়াতির খাওয়া ও উদ্বেগ অগ্রাহ্য করে আফজাল মিয়া আজো বিছানায় লম্বা হলে, গুড়াতি ঘটকের খাওয়ার ধৈর্য আর থাকে না। আরো ভাত নেয়ার বদলে অভ্যাস মাফিক দ্রুত থাল ও আঙুল চেটে সে ঢক ঢক করে পানি খায়। আফজাল মিয়ার স্ত্রীকে অনুরোধ করে, মা তোমরা একনা বাইরে যাও। জামাইয়ের সাথে জরুলি কথাটা খুব গোপন।

নির্জন ঘরে আফজাল মিয়ার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে গুড়াতি ঘটক ফিসফাস স্বরে কথা বলে, ও দামান্দ গেল রাইতে দলবল নিয়া এবদ ডাকাইত মোর বাড়িতে গেছিল।

এবাদের নাম শোনামাত্র বিছানায় ঝটিতি উঠে বসে আফজাল মিয়া, তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টিতে ঘটকের দিকে তাকিয়ে থাকে। গুড়াতি ঘটক আর কোনো ভূমিকা বাড়ায় না। এবাদ ডাকাতের গোপন কথাগুলো সরিাসরি উগড়ে দেয়। তার নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গি এবং কথার সঙ্গে মিশে থাকা বাড়তি আবেগ ও আতঙ্ক বাদ দিলে খবরটা সংক্ষেপে এরকম—

কুখ্যাত এবাদ ডাকাতের নজর পড়েছে মুক্তার ওপর। মুক্তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। ইচ্ছে করলে আফজাল মিয়ার মেয়েকে বাড়ি থেকে যে কোনো সময় তুলে নিয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু এবাদ তা করে নি, করতেও চায় না। আফজাল মিয়ার মান-মর্যাদা বজায় রেখে মুক্তাকে সামাজিকভাবে ঘরে তুলবে সে। বিয়েতে তার এক পয়সাও খরচ হবে না। উল্টো শ্বশুরের সব ডিমান্ড পূরণ করবে এবাদ। পাঁচ ভরি সোনার জিনিস ছাড়াও পৈতৃকি সম্পত্তির এক বিঘা জমি লিখে দেবে মুক্তার নামে।

www.pathagar.com

এবাদের প্রস্তাব হুবহু উদ্ধৃত করে ঘটক আফজাল মিয়ার হাত চেপে ধরে দুঃসংবাদটির প্রতিক্রিয়ায় নিজেই কেঁদে ফেলে প্রথম, জামাই বাহে, রাজি না হইলে মোর ঘটকালি করা চিরজীবনের জন্যে খতম করবে এবাদ ডাকাইত। আপনাকেও খুন করবে। তার পাছে মুক্তাকে হাইজ্যাক করি নিয়া যাইবে বাড়ি থাকি। হাতের বন্দুক ছুইয়া কসম কাটছে এবাদ ডাকাইত। রাইতে এক ফোঁটা ঘুম হয় নাই মোর। চিন্তায় চিন্তায় মাথার বেরেন আউট হইছে। এলা কী উপায় করা যায়— ঠাণ্ডা মাথায় ভাবেন।

আফজাল মিয়া যেন এতক্ষণ কিছু শুনতে পায়নি, বুঝতেও পারে নি। গুড়াতি ঘটকের ওপর সকল বিরক্তি-ঘেন্না-ক্রোধ ফেটে পড়তে চায়। উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চায়, সকাল বেলা কী সব ফাউল কথা নিয়া আসছেন! কে পাঠাইছে তোমাকে আমার বাড়িতে ?

গুড়াতি আরো শক্ত করে আফজাল মিয়ার হাত চেপে ধরে এবাদ ডাকাতের নাম বলে। কথা লিক আউট হলে বিপদ হবে— এই যুক্তিতে আতঙ্কচাপা কণ্ঠস্বর আরো খাদে নামায়। গত রাতে বাড়িতে এবাদ ডাকাতের উপস্থিতি এবং ফাঁকা স্কুল ঘরে তার সঙ্গে অনুষ্ঠিত কথাবার্তার ধারা বর্ণনা দেয় নতুন করে। আফজাল মিয়া শোনে কি শোনে না, বোঝে কি বোঝে না, বোঝা যায় না। ঘটকের দিকে ফ্যালফাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। ঘটক যে এক বর্ণ মিথ্যে বলছে না প্রমাণ দেয়ার জন্য ঘাড়ে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেটে রাখা টাকাটা বের করে দেখায়। এবাদ ডাকাত দিয়েছে, প্রস্তাবে সম্মত হলে আফজাল মিয়াকেও অনেক টাকা দেবে। কারণ টাকা হলো এবাদের কাছে গাছের পাতা। হাত বাড়ালেই পায়। স্বাধীনের পর হতে লুটপাট আর ডাকাতি করে কম টাকা কামায় নি সে। বলতে গেলে লাখপতি মানুষ এবাদ, থানার দারোগা-পুলিশ-চেয়ারম্যান সবাই সালাম দেয়। এখন এই খবিজের হাত থেকে মুক্তাকে কী প্রকারে রক্ষা করা যাবে জামাই ?

আফজাল মিয়া মুখ খোলার আগে রোকেয়া পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আড়াল থেকে ঘটকের গোপন কথা শুনছিল সে। ঘরে ঢুকে প্রতিবাদের ঝড় তোলে, ছি ছি! মুক্তার জন্য এমন প্রস্তাব কোন সাহসে আনলেন ঘটক চাজি! অসম্ভব। এবাদ ডাকাইত এমন প্রস্তাব দিতে পারে না। তোমার জামাইকে এবাদ ভাই ডাকে, মান্যগণ্য করে, এমন প্রস্তাব সে দিতে পারে না। এ নিশ্চয় মানুষের চকরান্ত।

বিশ্বাস করানোর চেয়ে রোকেয়াকে শান্ত করাটাই জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় গুড়াতির কাছে। দুহাত-পা দাপিয়ে অনুনয় করে সে, মাথা গরম করিস না মা। এবাদ কয়া দিছে, এ প্রস্তাব গ্রামের কাক-পক্ষী জানলেও হামাকে খুন করি ফেলাইবে।

একটা খুনী ডাকাইতের সাথে, তাও সতীনের ওপর মুক্তাকে বিয়ে দেব আমরা— এমন অসম্ভব কথা আপনি ভাবলেন কী করে। ছি ছি! এমন প্রস্তাব নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকতে তোমার শরম হইল না বাহে।

মেয়েমানুষের পেটে সাংঘাতিক কোনো কথা ঢুকলে মাথা গরম হয়ে ওঠে তাদের। আপন কন্যাতুল্য রোকেয়ার রাগ দমাতে গুড়াতি ঘটক জানায় যে, ডাকাতের সাথে মুক্তার বিয়ের ঘটকালি করতে নয়, বরং সে এসেছে এবাদ ডাকাতের হাত থেকে মুক্তাকে বাঁচানোর উপায় খুঁজতে। এবাদ ডাকাতের প্রস্তাব শুনে সেও যদি মাথা গরম করতো, তাহলে সন্দেহ নেই—

www.pathagar.com

কাল রাতেই এবাদ তাকে খুন করতো। কিন্তু গুড়াতি ঘটক তো আর মেয়েমানুষের মতো পেটপাতলা নয়। কথাটা সে নিজের বাড়িতে, এমন-কি মুক্তার নানার বাড়ির কাউকে বলে নি। সারা রাত ভেবে ভেবে একটা উপায় খুঁজেছে এবং উপায় একটা পেয়েও গেছে সে।

যে ঘটনার জাল বিছিয়ে গুড়াতি আফজাল মিয়া, রোকেয়া এবং নিজেকেও সন্ত্রস্ত ও অসহায় করে রেখেছে, অবশেষে তা থেকে বেরিয়ে আসার পথও সে বাতলে দেয়। এবাদ ডাকাতের মতো মানুষকে মুখের ওপর না বলা যাবে না। এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে, এবাদকে বরং হাসিমুখে ঘটক বলবে, আফজাল মিয়াকে সে রাজি করিয়েছে। মুক্তার নামে এক বিঘা জমি, পাঁচ ভরি স্বর্ণ এবং নগদ বিশ হাজার টাকা দিতে হবে। আর বিয়ে হবে কমপক্ষে এক মাস পরে। এসব শর্ত দিয়ে গুড়াতি এবাদ ডাকাতকে এক মাস ঠাণ্ডা রাখবে। এ দিকে এই সময়ের মধ্যে গোপনে বিয়ের আয়োজন চলবে মুক্তার। এমন ছেলের সাথে বিয়ে দিতে হবে, বিয়ের পর এবাদ ডাকাত যেখানে হাত বাড়াতে পারবে না। অন্য ছেলের সাথে মুক্তার বিয়ে হলে অবশ্য গুড়াতি ঘটককে গুলি করে মারবে এবাদ। আফজাল মিয়াকেও মারতে পারে, তবু ডাকাতটার খপ্পর থেকে মুক্তা তো অন্তত মুক্তি পাবে।

স্বামী ও ঘটকের মৃত্যুর আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে রোকেয়া তার মেয়ের উদ্ধারকারী জামাইয়ের জন্য আকুলতা প্রকাশ করে, তেমন ভালো ছেলে এক মাসের মধ্যে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় ?

গুড়াতি এ সমস্যারও তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়, পাত্তর খোজার দায়িত গুড়াতি ঘটকের ওপর ছাড়ি দিয়া তুই নিশ্চিন্ত থাক মা।

রোকেয়া স্বামীর দিকে তাকায়। সংকটে স্ত্রী পাশে দাঁড়ানোর পর নীরবে চিন্তা করার সুযোগ নিচ্ছিল সে। চক্রান্ত কথাটা চক্রাকারে মাথায় ঘুরছিল কেবলই। ঘটকের মুখের দিকে তাকিয়ে এবাদ ডাকাত ছাড়াও চেনা-অচেনা শত্রুদের ছায়া স্পষ্ট দেখতে পায় সে। বিকল্প পাত্রের প্রস্তাব দেয়ায় মনে ধন্ধ জাগে, এবাদ ডাকাতের ভয় দেখিয়ে ঘটক কি আরেকটি কুপ্রস্তাবেও তাকে চটজলদি রাজি করাতে চায় ? বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে ঘটকের নানারকম কূটচালের কথা সবাই জানে। এবাদ ডাকাতের মতো সামাজিক সন্ত্রাসকে সে ভয় পায়, কিন্তু তা বলে গুড়াতির মতো এক গোবেচারাও আজ তার এই ভয়ের সযোগ নেবে ? ভিলেজ পলিটিক্স আফজাল মিয়া বরাবর এড়িয়ে চলে, কিন্তু তা বলে গরিব গুড়াতি ঘটক বাড়িতে এসে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে তাকে অসহায় আটকে রাখবে ?

ও দামান্দ, আপনে কথা কন না ক্যানে ? এবাদের ভয়ে চুপচাপ বসি থকলে চলবে ? যা করার গোপনে তাড়াতাড়ি করেন, না হইলে সর্বনাশ হবে।

সর্বনাশ প্রতিরোধের দুঃসাহসী উত্তেজনায় আফজাল মিয়া বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে। অন্তর্গত ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলার জন্য বুড়ো গুড়াতি ঘটকের দাড়ি গুচ্ছ ধরে অন্য হাতে তীব্র চড় বসিয়ে দেয় গালে। একই সাথে মুখ চলে তার, শালা বুড়ো ছাগল। নিমক হারাম। বলেছি না আমার বেটির বিয়ের ঘটকালি তোকে করতে হবে না। তবু সাতসকালে আমার সর্বনাশের চক্রান্ত নিয়া হাজর হইছিস! বেরোও আমার বাড়ি হইতে, বেরোও, গেট আউট।

রোকেয়া পালোয়ান স্বামীর হাত থেকে ঘটককে রক্ষা করে এবং শান্ত করার জন্য স্বামীকে

www.pathagar.com

ও নিজেকেও সান্ত্বনা দেয়, ঘরে আমাদের সেয়ানা মেয়ে। ভালো-মন্দ যে প্রস্তাব আসুক, মাথা গরম করা অমাদের সাজে না।

আকস্মিক চড় খেয়ে গুড়াতি টলে পড়েছিল, পাকা দাড়িসহ চোপসানো গালে হাত দিয়ে সামলে উঠেছে। দাড়ি-ছেঁড়া এবং দাঁত নড়ানো আঘাতের যন্ত্রণা বুকের ভেতরেও খামচাখামচি শুরু করেছে। গুড়াতি ঘটক গালে হাত চেপে তবু যমত্রণাবিকৃত কণ্ঠে বলে, মাইও ঠিক কথা কইছে বাবাজি। মাথা গরম করলে বিপদ আরো বাড়বে।

আফজাল মিয়ার রাগটা ধীরেসুস্থে চড়েছিল, মুহূর্তেই তা মাথা থেকে নামতে চাইলেও নামতে দেয়া ঠিক নয়। গলা চড়িয়ে ধমক দেয় সে, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আর কোনোদিন যেন তোমার মুখ না দেখি আমি।

পড়া-পড়শী জড়ো হওয়ার ভয়ে রোকেয়া ঘটক চাচার হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যায় এবং মুখে সান্ত্বনা দেয়, চাজি কিছু মনে করেন না বাহে। তোমরা এখন যাও, মুক্তার নানাকে পাঠায় দেন। আর এসব কথা বাইরে কারো কাছে ফাস করেন না আর।

জামাইয়ের শাতে শক্ত চড় খেয়ে যা হয় নি, মেয়ের মৃদু সোহাগে তাই হয়। হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যায় যেন। রোকেয়ার হাত চেপে গুড়াতি কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা রে, তোমারগুলাক আপন ভাবিয়া, তোমার বিপদ দেখিয়া মুই ছুটে আসনু। মুক্তা বুবুকে দেখিশুনি রাখিস। আল্লা যেন তাকে রক্ষা করে।

উদগত কান্না নিয়ে গুড়াতি ঘটক ছাতা ও সেন্ডেল হাতে যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

রাস্তায় উঠে কাঁধে ঝোলানো জামা দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে গুড়াতি পকেটের টাকাগুলোর অস্তিত্ব আবার অনুভব করে। টাকাটা কিছুতেই নিতে চায়নি সে। কারণ সর্বান্তকরণে জানতো গুডাতি, এ বিয়ে কিছুতেই হবে না। জীবন থাকতে রাজি হবে না আফজাল জামাই। কোন বাপই বা জেলখাটা দাগী আসামী এবাদ ডাকাতের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে চাইবে? গুড়াতির মতো গরিব মানুষও এবাদকে জামাই বানাবার প্রস্তাব শুনলে আঁতেকে উঠবে। কাজেই আফজাল মিয়ার পাটধোয়া চড় ঘটকের ন্যায্য পাওনাই ছিল। বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে, নিজের গাল-দাড়ি বুলিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় গুড়াতি, উচিত কাজ করেছে আফজাল জামাই।

অন্ধকার স্কুল ঘরে বসিয়ে এবাদ যখন কথাটা তোলে, গুড়াতি তৎক্ষণাত জবাব দিয়েছিল, অসম্ভব। এরপর এবাদকে সে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। গ্রামের মধ্যে আফজাল মিয়া একমাত্র শিক্ষিত ভদ্রলোক, প্যান্ট-শার্ট পরে সাইকেলে চেপে রোজ অফিসে যায়, সরকারি চাকরি ছাড়াও যার জায়গা-জমির পরিমাণ গ্রামের যে কোনো গেরস্তের চেয়ে বেশি, আধিয়ার ও কামলাকিষাণের ওপর নির্ভর করেও যে বারো মাস আবাদী ধানের ভাত খায়, ফি মৌসুমে প্রচুর ধানপাট বেচে, চোর-ডাকাতের ভয়ে বাড়িতে যে নতুন দালান দিয়েছে, সেই মানুষ কোন দুঃখে বানরের গলায় মুক্তার মালা দেবে? সবচেয়ে বড় বাধা মুক্তা নিজে। আর দশটা গেরস্ত ঘরের সাধারণ অবলা মেয়ে নয় মুক্তা, ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক, আই এ পাশ করে শহরের মহিলা কলেজে পড়ছে। লেখাপড়ায় যেমন ভালো, দেখতেও তেমনি

www.pathagar.com

ডানাকাটা পরী। এমন পরীর জন্য জজ-ব্যারিস্টার পত্রের সন্ধান করার কথা গুড়াতি ঘটক নিছক ঠাট্টা করে বলে না, তেমন যোগ্য পাত্র মেয়ের জন্য আফজাল মিয়া যে যোগাড় করতে পারবে— তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার।

এবাদ ডাকাতকে এতোসব বাধা বোঝানোর পরও কাজ হয় নি। অন্ধকারে দৈব ঘোষণার মতো আওয়াজ হয়েছে, এবাদ যা করতে চায়, কেউ তা ঠেকাতে পারে না ঘটক দাদা। মুক্তা বউ হয়ে আমার ঘরে আসবে। এই ডিসিশন ফাইনাল। প্রস্তাব নিয়ে কাল সকালে আপনি যাবেন। যে-কোনো শর্তে, ছলে-বলে-কৌশলে আফজাল মিয়াকে রাজি করাবেন। তবে হুশিয়ার দাদা, আফজাল মিয়া রাজি হোক বা না হোক, এই বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে একটা কথাও যেন গ্রামের মানুষ আগাম জানতে না পারে।

এরপর এবাদ টাকাটা গুড়াতির হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল, টাকা পাঁচশ রাখেন দাদা। সফল হইলে আরো পুরষ্কার পাবেন।

ঘটকালি করা গুডাতি ঘটকের পেশা নয়, নেশা। ঘটকালি করে বলে পাঁচ-সাত গ্রামের অনেক বাড়ি আত্মীয়-বাড়ির মতো হয়েছে, বেড়াতে গেলে খাতির-যত্ন পায়। তার ঘটকালিতে কোনো সম্বন্ধ সফল হলে বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষের দিক থেকে দু'চারদিন ভালো-মন্দ খেতে পায়। খাওয়া এবং নতুন নতুন আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপনের আনন্দটাই গুড়াতি ঘটকের বড় পাওনা। একটা সম্বন্ধ পাকা করতে শতবার ছোটছুটি ছাড়াও কথা খরচ হয় বেশুমার। কথায় আছে, এক হাজার এক কথা না বললে বিয়েসাদি হয় না। বিনিময়ে একটা টাকাও দাবি করে না ঘটক। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বলে কয়ে দশ বিশ টাকা চেয়ে চিন্তে নেয় সে। না চাইতেও পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি উপহার পেয়েছে দু'বার। কিন্তু ঘটকালি করে পাঁচ শ টাকা এবং দাড়িছেড়া চড় জীবনে এই প্রথম।

টাকাগুলি এবাদ ফেরত না নেয়ায় ভয়ে ভয়ে বলেছিল গুড়াতি, তোর প্রস্তাব নিয়ে একবার কেন, মুই একশোবার যাইম রে ভাই। কিন্তু আফজাল মিয়া যদি রাজি না হয়?

এবাদ ডাকাত তখন অন্ধকারে গুড়াতির গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে বলেছিল, এটা কি জিনিস বুঝছেন তো দাদা? আফজাল মিয়াকে রাজি করাতে না পারলে তোমারও ঘটকালি করা জীবনের তরে সাঙ্গ হবে, আফজাল মিয়াও সবকিছু হারাবে। কিন্তু মুক্তাকে আমি ঠিকই ঘরে তুলবো।

ডাকাতটার হাত থেকে মুক্তাকে বাঁচানোর উপায় ভাবতে গিয়ে কাল প্রায় সারা রাত গুড়াতি ঘটক ঘুমাতে পারেনি। ফেরত দিতে হবে বলে ডাকাতের টাকা যখের ধনের মতো আগলে রেখেছে। ডাকাতের টাকার প্রতি লোভের চেয়ে মুক্তার প্রতি তার দরদ যে বেশি— সেটা বোঝানোর জন্য মুক্তার বাপকে টাকাটা পর্যন্ত দেখালো। কিন্তু দামান্দ বাবাজি হামাকে বিশ্বাস করিল না বাহে। গালে চড় দিয়ে বাড়ি হইতে কুত্তার মতো খেদায় দিল... স্বাগত কান্নায় গুড়াতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, বারবার ঢোক গেলে সে। কান্নাটা চেপে রাখে সে এবাদ ডাকাতের ভয়ে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে খবর জানার জন্য আবার আসবে ডাকাতটা। তাকে কী জবাব দেবে গুড়াতি ঘটক?

www.pathagar.com

চৌদ্দ পুরুষ ধরে গাঁয়ের মানুষ হয়েও অন্ধকার গ্রামকে ভয় পাওয়ার অভ্যাস সেই যে শৈশবে গড়ে উঠেছিল, অভ্যাসটা আফজাল মিয়ার আছে এখনও। ভূতের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার স্বভাব, ভূতে বিশ্বাস হারানোর পরেও বদলায় নি। সন্ত্রস্ত হওয়ার অভ্যাস কিংবা স্বভাবটা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে বরং। এখন দিনের বেলাতেও যখন-তখন ভয় পায় আফজাল মিয়া। পাকা ঘরে বসেও বাইরে নানারকম ভয়ঙ্করের অস্তিত্ব কল্পনা করে। ভূত নেই, কিন্তু চেনা মানুষও অনেক সময় অচেনা ও ভূতের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

এবাদ ডাকাত কিংবা শয়তান চক্রের দূত হিসেবে গুড়াতি ঘটক সকালবেলা মনে যে প্রচণ্ড ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, ঘটককে চড় মেরে সেই ভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আফজাল মিয়া। ঘটক চলে যাওয়ার পরও যুদ্ধটা থামে না। চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকে সে, মুক্তা, মুক্তা! মুক্তা ঘরে নেই? গেল কোথায়? ও মুক্তা...

আফজাল মিয়ার পাকা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বড় ভাইয়ের উঠানসহ তাদের ঘর-সংসারের অনেক কিছু চোখে পড়ে। ঘর পাকা করলেও বাড়ির সীমানা দেয়াল তুলে ঘিরতে পারে নি এখনও। তবু ভাইয়ের সংসার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকার জন্য উঠানে বাঁশের বেড়া দিয়েছে। কাজ হয় নি তাতে। বেড়ার ফাঁকফোকড় দিয়ে মানুষজন ছাড়াও হাঁস-মুরগি থেকে গরু ছাগল পর্যন্ত এ-বাড়ি থেকে সে-বাড়ি অবাধে যাতায়াত করে। ডাক শুনে মুক্তাকে পাশের বাড়ি থেকে আসতে দেখেও আফজাল মিয়া হুঙ্কার দেয়, কোথায় গেছিলে?

বড় আম্মা ডাকছিল।

হাঁড়ির খবর হাটে না ভাঙলে পেটের ভাত হজম হয় না তোমাদের? আজ হতে ঘরে ছেড়ে এক পা বাইরে যাবে না বলে রাখলাম। এ-বাড়ি ও-বাড়ি আর বাড়ির বাইরে ঘুরতে দেখলে খুন করে ফেলব তোমাকে। যাও নিজের ঘরে যাও।

বড় হওয়ার পর থেকে বাবার এরকম বকাঝকা খায় নি মুক্তা। স্ত্রীর চেয়ে বড় মেয়েকেই যেন বেশি সমীহ করে চলে আফজাল মিয়া। মুক্তার প্রাপ্য ধমক তাই বেশিরভাগ সময় তার মাকে হজম করতে হয়। ঘটক নানা কেঁদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাবার অগ্নিমূর্তি দেখে মুক্তা অবাক হতেও যেন ভয় পায়। মৃদু কণ্ঠে বলে শুধু, কলেজ খুলবে। কাল হোস্টেলে চলে যাব আমি।

আফজাল মিয়া কঠোর সিদ্ধান্ত দেয়, না। কলেজে যেতে হবে না আর। এ বাড়ি থেকে লেখাপড়া, স্কুল কলেজ অফিস যাওয়া, সবকিছুই বন্ধ এখন থেকে।

মুক্তার ছোট দুই ভাইবোন পড়ার ঘরে বসে লেখাপড়া করছিল। বাবার রাগ কিংবা বড় আপার শাস্তি দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তারা। ছোট ছেলে অঙ্কুর জানতে চায়, আব্বা আমাদেরও লেখাপড়া বন্ধ? স্কুল যাব না আর?

মেজ মেয়ে শুকতি ছোট ভাইয়ের মাথায় চাটি মেরে, ভয়ে ভয়ে বাবা ও বোনকে দেখে। কিন্তু

www.pathagar.com

তাদের বাবা দৃঢ় কণ্ঠে একই সিদ্ধান্ত জানায়, না। এ গ্রামে থেকে তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে না আর। শহরে বাসা নিয়ে তোমাদের যদি আবার শহরে রাখতে পারি, তা হলে লেখাপড়া করবে, না হলে নয়।

গুড়াতি ঘটককে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাইরে কোথাও গিয়েছিল রোকেয়া। নীরিহ ঘটকের মতো নির্দোষ ছেলেমেয়েদের ওপর স্বামীর চোটপাট দেখে বাড়িতে ফিরেই রুখে দাঁড়ায় সে, কী হইছে ? কী এমন হইছে যে, এই গ্রাম ছাড়ি পালাতে হবে ? কী এমন ঘটছে যে বাড়িঘর ছেড়ে টাউনের ভাড়া বাসার খুপরিতে থাকতে হবে ?

সেদিন এবাদ ডাকাতকে ঘিরে বাড়িতে এত বড় খুনোখুনি কাণ্ড, সেই ঘটনার রেশ থেমে না যেতেই মুক্তাকে নিয়ে এমন জঘন্য ষড়যন্ত্র, আফজাল মিয়ার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায়— বলা চলে তার কলজের ওপর শত্রুর হিংস্র থাবা পড়েছে। তারপরেও রোকেয়ার ডেমকেয়ার ভাব দেখে আফজাল স্তম্ভিত। বাইরে থেকে স্ত্রী কি ষড়যন্ত্র ভেদ করে আশ্বস্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পেয়েছে ? নাকি ছেলেমেয়েদের মনে সে অকারণ ভয় ধরাতে চায় না ? এবং ঘটকের দুর্ঘটনাটি পাশের বাড়িতেও জানতে দিতে চায় না ? দ্বিতীয় ভাবনাটি সত্য ভেবে আফজাল মিয়া সংযত কণ্ঠে ঘোষণা দেয়, বিল্ডিংবাড়ি জায়গাজমি নিয়ে গ্রামে থাক তুই। আমি এ মাসেই বদলি হয়ে আবার টাউনে যাব। ছেলেমেয়েকে নিয়ে টাউনে থাকব।

আফজাল মিয়া সিদ্ধান্তের সত্যতা বুঝিয়ে দিতে অফিস যাওয়া বাতিল করে সাইকেলখানা ঘরে তুলে রাখে। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়ার নির্দেশ দিয়ে রোকেয়া স্বামীর কাছে ফিরে আসে। কথা বলে গোপন দাম্পত্য আলাপচারিতার ঢঙে।

এতো অস্থির হয়েছ কেন ? গুড়াতি ঘটকের কথা সত্য, নাকি এমন প্রস্তাবের পেছনে মানুষের অন্য কোনো চাল আছে— সেটা আগে বের করতে হবে না ? ঘটক বাড়িতে ঢোকার আগে, খুলিতে বড় ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে। কথাবার্তাও হয়েছে শুনলাম।

ঘটকের গালে এমনি কি চড় দিয়েছি আমি ? এবাদ ডাকাতের ভয় দেখায় আমাকে, যাতে মুক্তাকে ওর বেটা রুবেলের সাথে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেই। সব ঐ শয়তানটার শেখানো কথা।

কিন্তু রুবেলের সাথে যে কস্মিনকালেও বিয়ে হবে না— সেটা মুক্তাই ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয় অন্য কোনো চাল আছে।

আফজাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন এবাদকে মারার জন্যে তোমার বড় ভাই কত কাণ্ডকীর্তি করল, গোপনে সেই আবার ডাকাতটার সাথে আপোস করে এসেছে । আমাদের নামে ডাকাতটার কাছে কত বদনাম করেছে আল্লাই জানে। এবাদকে হাত করে হয়তো ঘটককে পাঠিয়ে দিয়েছে সে— যাতে এবাদ ডাকাতের ভয়ে আমরা বাড়ি-ঘর, জায়গা জমি ছেড়ে টাউনে পালিয়ে যাই।

রোকেয়ার অনুমানকে সত্য ভেবে আফজাল পুরনো ঝগড়া শুরু করে, এজন্যেই তোকে শতবার বলেছিলাম, গ্রামে বাড়ি পাকা করার দরকার নেই। টাউনে জায়গা কিনে বাড়ি করি। পাড়া-পড়শী মূর্খ এবং শয়তান হলে, সেখানে কোনো ভদ্রলোক বাস করতে পারে না। এখন ঠেলা সামলাও।

বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখার বদলে স্বামীর পলায়নী স্বভাব দেখে রোকয়া বিরক্ত হয়ে বলে, এমনি কি আর বলি, এতো ভয় পাও বলেই মানুষ তোমাকে বেশি ভয় দেখায়। কিছু একটা

www.pathagar.com

হতে না হতেই শুধু পালাই পালাই।

আমার মেয়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ুক, ভালো ছেলের সাথে বিয়ে হোক, গ্রামের কোনো মানুষ সেটা চায়, নাকি সহ্য করতে পারে ? যাই বলিস তুই, এতো চক্রান্তের ভেতরে আমি এ গ্রামে আর থাকব না। মুক্তাকে একা হোস্টেলে রাখাও আর ঠিক হবে না।

আমার শুধু একটাই ভয়। সেদিন মুক্তার ওপর ডাকাতটার নজর দেখে সন্দেহ হয়েছিল। যদি ঘটকের কথা সব সত্যি হয় ?

এত বড় দুঃসাহস এবাদ পেল কোথায় ? আমি কি নিজে একবার যাবো তার কাছে ?

রোকেয়া স্বামীকে আবারো বাধা দেয়, না। এখন কাউকেই কিছু বলার দরকার নেই। হনুফার মাকে ঠাকুরপাড়া পাঠিয়ে দিয়ে আমি আসল খবরটা যোগাড় করতে পারি কিনা দেখি।

হনুফার মা সম্পর্কে এবাদের ফুফু। গরিব প্রতিবেশীদের মধ্যে এই মহিলাটি রোকেয়ার অন্যতম ভক্ত। যে-কোনো কাজে ডাকলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। রোকেয়া হনুফার মায়ের সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে আফজাল মিয়া বাড়ির বাইরে এমনভাবে পায়চারি করে, যেন বাড়ি পাহারা দিচ্ছে সে।

রাস্তার পাশের গাছতলায় দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ির দিকে আফজাল মিয়ার তন্ময় দৃষ্টি দেখে প্রতিবেশী গরিব কৃষক নওশের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং সহাস্য মন্তব্য করে, কী বাহে মিয়ার বেটা, বাড়িতে দালান তুললেন, এবার চাইরো পাশে বড় পাচিল দাও। ডাকাইতেরা যাতে না ঢুকতে পারে।

আফজাল মিয়া চমকে ওঠে। এবাদের ঘটক পাঠানোর ঘটনাটি কি গ্রামে এর মধ্যে চাউর হয়েছে ? সন্দেহ নিরসনের জন্য জানতে চায়, সাতসকালে তোর মাথায় ডাকাইতের চিন্তা ক্যানে বাহে ?

ওইদিন এবাদ ডাকাইত তোমার বাড়িতে আইলো। তোমার বেটির কথায় নাঠি হাতে হামরা ছুটিয়া আসনো। এবাদের একটা বালও ছিড়বার পারনো না। কিন্তু এবাদ যে হামার এলায় কী সর্বনাশ করবে আল্লাই জানে।

নওশের কি আফজাল মিয়ার অন্তর্গত ভয়টা নেড়েচেড়ে দেখতে চায় ? এ গ্রামের কাউকে বিশ্বাস করে না সে। ধারকর্জ নিলে যেমন ঠিক সময়ে ফেরত দিতে পারে না, তেমনি বিশ্বাস করে কোনো কথা বললে তা পেটের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না।

আফজাল মিয়াকে নীরব দেখে নওশের হাতের কাস্তে দিয়ে পিঠ চুলকায়। ইতিউতি তাকিয়ে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলে, চেয়ারম্যান যে এবাদ ডাকাইতের সাথে আপোস হইছে— জানেন সে খবর ? সেদিন বাজারে নিজের চোখে দেখনু বাহে, তোমার বড় দেওয়ানি আর এবাদ ডাকাইত এক সাথে বসিয়া চা খাইতোছে আর হাসাহাসি করতোছে।

ওদের কথা আমাকে আর বলিস না তো।

বিরক্ত আফজাল মিয়া বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। নওশের পেছন থেকে জানতে চায়, আফিস যাবার নন আইজ ?

না। দোলার ভূঁইয়ে ইরি ধান গাড়ার কামলা নিছি।

হ্যাঁ, তোমার তো আবার দোনো দিক সামলাইতে হয়। অফিস আর আবাদ— কোনোটাই

www.pathagar.com

কম জরুরি নয়। দুইটাই তোমার দুধাল গাই।

আফজাল মিয়া ভাবে, অফিস ও হালগেরস্তি— দু'দিক সামলাতে গিয়ে তার আজকের এই সংকট। গ্রামে বাস করেও না পারল সে জমির সাথে একাত্ম চাষা কিংবা গ্রামসমাজের একজন মোড়ল হতে, অন্যদিকে চাকরি করেও বউ-বাচচা নিয়ে না পারল শহরে ভদ্রলোকের নিরাপদ জীবনযাপন করতে। গ্রামে বাস করলেও সে অবশ্য গ্রামবাসীদের মাঝে শহুরে ভদ্রলোকের মতো বিচ্ছিন্ন একজন মানুষ। বাড়তি সম্মান দেখাতে, আফজাল ভূঁইয়ার বদলে তাকে আফজাল মিয়া বলে সাবই। তবে চাকরি ও কৃষির কল্যাণে সংসারে যে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, তা যেন গ্রামবাসী প্রত্যেকেরই চক্ষুশূল। নওশেরের মতো সরল চাষীর হাসি ও মন্তব্যেও সে হিংসের বিষ খুঁজে পায়। তার চাকরি ও আবাদকে দুধাল গাই বলার মানে কী ? বাড়িতে বিল্ডিং তোলার পর পথ-চলতি সবাই মাথা ঘুরিয়ে তাকায় আফজাল মিয়ার বাড়ির দিকে। তাদের দৃষ্টি থেকে প্রশংসা বা সমীহ নয়, হিংসাই ঝরে পড়ে বেশি। আফজাল মিয়ার উন্নতি দেখলে সহোদর ভাইদেরই চোখ টাটায়, গ্রামবাসীদের আর দোষ কী ?

আফজাল মিয়া বাড়িতে ঢুকে ছোট মেয়েকে ডেকে মুক্তা কোথায় জানতে চায়। মুক্তা ঘরে পড়ছে শুনে, নিজেও বারান্দায় চেয়ারে বসে বড় ভাইদের ঘরবাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাইদের কারণেই নিজস্ব জায়গা-জমি আঁকড়ে গ্রামে সংসার পাততে বাধ্য হয়েছে আফজাল। বাবার মৃত্যুর পর, শহরে বাসা ভাড়া নিয়েছিল সে। ম্যালেরিয়া নির্মূল প্রজেক্টের ছোট চাকরি, মাসিক বেতন মাত্র ১৩৫ টাকার ওপর নির্ভর করে শহরে বাচ্চাদের পড়ানো এবং ভদ্রগোছের জীবনযাপন ছিল প্রায় অসম্ভব। কথা ছিল, ভাইয়েরা সাহায্য করবে। আফজালের প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তির অংশ ভাইয়েরা দেখাশোনা করতো। ফি মওসুমে নগদ টাকা ও খাবার চাল-ডাল-লাকড়ি পাঠাবে বলেছিল। কিন্তু চার বছরে নগদ টাকা একটিও দেয় নি কোনো ভাই। চাল ডাল যা দিতো— তা খয়রাতি সাহায্যের মতো। তারপরেও অগ্রজদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অটুট ছিল আফজালের। অনুজের প্রতি তাদের স্নেহ-মমতা এবং দায়িত্ববোধ একেবারে মিথ্যে হয়ে যায় নি তখনও। একাত্তরে প্রমাণ পেয়েছিল আফজাল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বউবাচ্চা নিয়ে সেই যে গ্রামে পালিয়ে এল, স্বাধীনতার পরও রোকেয়া আর ফিরে যেতে চায় নি শহরে। পাঁচ বছর বাসা ভাড়া গুণে, ভাল শাড়ি পরে, স্নো-পাউডার মেখে এবং অনেকগুলি উর্দু-বাংলা সিনেমা দেখেও তার শহুরে মানসিকতা গড়ে ওঠে নি। দেশ স্বাধীন হলে, নিজের স্বাধীন সংসার ও প্রশস্ত ভিটে-মাটির টানটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। পৃথক হওয়ার পর নিজের সংসারের উন্নতির জন্য ভাসুর-জাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছে সে। সোনার জিনিস ঘরে রাখলে চোর ডাকাত নেয়, টাকা জমলে খরচ বাড়ে, কিন্তু জমি নিমকহারামী করে না কখনো। এইসব যুক্তি দেখিয়ে নিজের অলঙ্কার ও স্বামীর বেতন খুইয়ে আকালের সময় সস্তা দরে আরো জমি কিনেছে রোকেয়া। নিজেদের জমির ফসল ঘরে তোলার সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায় সে। স্নো-পাউডার মাখার চেয়ে আবাদী ধানের ধূলা গায়ে মাখতেই যেনো তার অধিক আনন্দ। কামলাপাইটদের কাজ তদারকি থেকে শুরু করে লাউ-কুমড়ার জাংলা দেয়া, হাঁসমুরগি পালা, রাত জেগে ধান সেদ্ধ করার মতো গেরস্থালির সব কাজে যে-কোনো চাষী বউয়ের তুলনায় পিছিয়ে থাকে না সে।

আবার শিক্ষিত চাকরিজীবী স্বামীর চেয়ে রোকেয়ার হিসাবজ্ঞান বড় টনটনে। আকালের সময় অভাবী মানুষদের সুদের ওপর ঋণ বা টাকা কর্জ দেয়। ফসলের সময় সুদেআসলে

www.pathagar.com

আদায় করতেও পারে। লোকে বলে, আফজাল মিয়া বউয়ের কল্যাণেই বাড়িতে বিল্ডিং হাকিয়েছে। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। সুদখোর মহাজন স্ত্রীর হাতের পুতুল সে। নিজের বেতনের টাকাটাও ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারে না। গ্রামে শিকড় গেড়ে বসার পর সর্বদা রোকেয়ার ছায়ায় এবং রোকেয়ার পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আপন ভাইয়েরা হয়েছে বড় শত্রু। বেশিরভাগ গ্রামবাসীকে মনে হয় তার বিরোধী পক্ষ। গ্রামে বাস করে আর্থিক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানসিক শান্তি পায় নি আফজাল মিয়া। শৈশবে অন্ধকারে ভুতের ভয়ে যেমন গা ছমছম করতো, এখন গ্রামের মানুষজন দেখেও তেমনি ভয় জাগে। সাবই যেনো তার পতন দেখতে তৎপর।

অথচ স্বাধীনতার পূর্বে, এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও জন্মভূমি গ্রাম ও সরল গ্রামবাসীদের এমন ভয় পেত না আফজাল মিয়া। তখন সবার মনে ভয় ছিল একটাই— পাকবাহিনী। মিলিটারি আতঙ্ক ঠেকাতে, গ্রামবাসী মিলেমিশে এক ও অখণ্ড পরিবার হয়ে গিয়েছিল যেন। ভাইদের পরিবার ছাড়াও গ্রামের প্রতিটি পরিবারের কাছে আফজাল মিয়ার পরিবার হয়ে উঠেছিল একান্ত আপন। দেশের পরিস্থিতি, যুদ্ধের খবর জানার জন্য সবাই ছুটে আসত তার কাছে। আফজাল মিয়া ও তার রেডিও ঘিরে সন্ধ্যায় বাড়িতে মেলা বসত যেন। স্বাধীনতাকামী এই ভিড়ের মধ্যে এক সন্ধ্যায় আজকের কুখ্যাত সন্ত্রাসী এবাদ ডাকাতকে বিশেষভাবে চেনার স্মৃতি মনে পড়ে আফজাল মিয়ার।

এবাদ তখন ঠাকুরপাড়ার ঢ্যাঙা সামাদের বেটা হিসেবে আফজালের কাছে মুখচেনা যুবক মাত্র। সমবয়সী আরো দুটি ছেলেকে নিয়ে সার্টিফিকেট নিতে বড়ভাইয়ের কাছে এসেছিল সে। বড় ভাইয়ের কাছে সম্ভবত আফজালের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহের কথা শুনেছিল সে।

মিয়া ভাই, শুনলাম পাকিস্তানি সরকারের চাকরিতে আপনি আর ফিরে যাবেন না। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য লোক খুঁজছেন? চলেন যাই, মিয়াভাই।

স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে হাতে তুলে নেয়া এখন প্রতিটি বাঙালি যুবকের মহান দায়িত্ব। কিন্তু যেহেতু আফজাল সরকারি চাকরি করে, সরকারি খাতায় নিজের নাম-ঠিকানা লেখা আছে, যেহেতু সে ইন্ডিয়া গেলে পাকবাহিনী তার খোঁজে এই গ্রামেও আসতে পারে এবং খুঁজে না পেয়ে গোটা গ্রামে আগুন দিতে পারে, সেহেতু এখনই যুদ্ধে যেতে চায় না সে। পরিস্থিতি লক্ষ করছে। নিজের নাজুক অবস্থান ব্যাখ্যা করে আফজাল মিয়া জানতে চেয়েছিল, তোরাও মুক্তিযদ্ধে যোগ দিতে চাস নাকি?

আমরা রওয়ানা দিয়েছি মিয়া ভাই। ভোরের আগে বর্ডার পার হবো।

উপস্থিত একজন ভয় দেখিয়ে বলেছিল, বউ-সংসার ফেলায় রাখি যুদ্ধে যাইস, তারপাছেবা...

বউ বড় না দেশ বড়? আগে দেশ স্বাধীন হউক, তারপর সংসার।

সমান্য লেখাপড়া সম্বল গেঁয়ো যুবকের নির্ভীক দেশপ্রেম দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল আফজাল মিয়া। অনিশ্চিত যুদ্ধে মৃত্যুর আশঙ্কা কিংবা পরিচিত দেশগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কষ্টে ধরা গলায় শেষ বিদায় নিয়েছিল এবাদ, দোয়া করেন বাহে সগাই। দ্যাশ স্বাধীন করি যেন সহিসালামতে ফিরতে পারি।

এরপর যুদ্ধের নয়মাস জুড়ে যেমন, তেমনি স্বাধীনতার পরও মুক্তিযোদ্ধা এবাদের দেশপ্রেমমূলক দুঃসাহসী কীর্তিকলাপ দেখার বিশেষ সুযোগ ছিল না আফজাল মিয়ার।

www.pathagar.com

ষোলই ডিসেম্বরের পরে এবাদকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একদিনই মাত্র দেখেছিল। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে সাইকেলে চড়ে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছিল কোথাও। আফজাল মিয়াকে দেখেও থামে নি। বাতাসে ভেসে এসেছিল তার রণহুঙ্কার, 'সময় নাই মিয়া ভাই, রাজাকার ধরতে যাই।' দেশ স্বাধীন করেও এবাদের যুদ্ধের উন্মাদনা ও তেজ কমে নি। বরং এলাকায় তার ক্রমশ দাপট বৃদ্ধির নানা খবর কানে আসত। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এবাদের এবাদ ডাকাতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযেগ হয় নি। কারণ ভিলেজ পলিটিক্সে মাথা গলাবার রুচি এবং সময়ও ছিল না তার। স্বাধীনতার পর চাকরি করতে শহরে ফিরে গিয়েছিল আফজাল। ভাইদের কাছ থেকে জমি ও বাড়িভিটার হিস্যা বুঝে নেয়ার পর রোকেয়াও স্বাধীন সংসার শুরু করেছিল গ্রামে।

রোজ কুড়ি-দু-গুণে চল্লিশ মাইল সাইকেলে পাড়ি দিয়ে অফিস করা অসম্ভব। ফলে এক পা গ্রামে আরেক পা শহরে, এক হাত সংসারে আরেক হাত অফিসে এবং দেহখানা মেস-এর নিরানন্দ পরিবেশে আর মনটা বাড়ির স্বজনদের কাছে রেখে আফজাল মিয়া বড় কষ্টে কাটিয়েছে কয়েকটি বছর। এ সময় একমাত্র আনন্দ ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি গ্রামে নিজের সংসারের জন্য উৎসর্গ করা। সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন আধাবেলা অফিস করেই বাড়ির দিক ছুটতো। স্ত্রী-সন্তাদের কাছে পাওয়ার আকুলতার কাছে বিশ মাইল কাঁচা রাস্তা ভাঙার কষ্ট তুচ্ছ মনে হতো। অফিস ফাঁকি দিয়ে সপ্তাহে দু'দিনও এরকম কষ্ট ভোগ করার সুযোগ হাতছাড়া করত না সে। বাড়ি পৌঁছলে রোকেয়া রাতে পা টিপে দিয়ে স্বামীর ব্যথা ক্লান্তি হরণ করতো।

একদিন বাড়ি ফেরার পথে ভর সন্ধেবেলা এবাদবাহিনীর সঙ্গে প্রথম মোলাকাত ঘটে আফজাল মিয়ার। তখনও স্বাধীনতার বছর পেরোয় নি। যুদ্ধের সময় রাস্তার ভাঙা ব্রীজগুলো ভগ্ন দশাতেই ছিল। বাড়ি থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে, নির্জন রাস্তার গাছতলা থেকে ভূতের মতো দুটি যুবক আচমকা তার সাইকেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। একজনের হাতে রাইফেল। সাইকেল, হাতের ঘড়ি এবং পকেট থেকে বেতনের টাকা কেড়ে নিতে এক মিনিটও সময় লাগে নি তাদের। এই সময়ের মধ্যে সর্বস্ব হারানো দুঃখ-ভয়ের চেয়ে শত্রুদের চেনার কৌতুহল তীব্র হয়েছিল আফজাল মিয়ার। চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছিল, কে তোমরা? স্বাধীন দেশে প্রকাশ্যে লুটপাট করার সাহস দেখাও! কাঁয় হে তোমরা— মুক্তিযোদ্ধা না রাজাকার?

চোপ। শুধু একটা মাত্র ধমক দিয়ে আফজাল মিয়ার সাইকেলে চড়ে ডাকাত দুটি পালিয়ে গিয়েছিল। বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটে, নিজেই চুপচাপ চোরের মতো অনেক রাতে বাড়ি পৌঁছেছিল আফজাল।

সেই রাতে রোকেয়া স্বামীর পা টিপে দেয় নি। সান্ত্বনাবাণী শোনায় নি। দেহ-মনে বিধ্বস্ত প্রায় স্বামীকে দেয়ার মতো ভালবাসাও বুঝি ছিল না বুকে। নিজেও সে স্বামীর বিষণ্নতায় আশ্রয় নিয়ে জানতে চেয়েছিল, ডাকাত দুটিকে একদম চিনতে পারো নাই?

ডাকাত দুটির সঙ্গে পরিচিত শত্রুদের যোগ তখন পর্যন্ত ধরতে না পারলেও আফজাল জবাব দিয়েছিল, কিন্তু ওরা আমাকে ঠিকই চেনে। আজ বেতন পেয়েছি জানে। বেতন পেয়ে কখন আসব জানে। আমার র‍্যালি সাইকেল ও হাতে ওয়েস্ট-ইন-ওয়াচ দেখেছে, বাড়িতে যে আমার বউ একা থাকে তাও নিশ্চয় জানে।

www.pathagar.com

পরদিন আফজাল মিয়ার ছিনতাই ঘটনাটি বাড়ির সব মহল পেরিয়ে গ্রামেও বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। অনেকে ছুটে এসেছিল সকালে। আফজাল মিয়ার লুণ্ঠিত চেহারা দেখে এবং তার মুখে লুণ্ঠনের কাহিনী শুনে মজা পাওয়াটাই ছিল সবার মূখ্য উদ্দেশ্য। মেজভাই বলেছিল, হাইজেকার চাইল আর অমনি সাইকেল ঘড়ি তাদের হাতে সুড়সুড় করে তুলে দিলি তুই! এমনি কি আর ভূঁইয়া বংশের সন্তান হয়েও লোকে তোকে আফজাল মিয়া বলে। তা খাঁটি মিয়ার মতোই ভদ্রতা করেছিস ডাকাইতদের সাথে।

ছোটমিয়া বোধ করি ভাবছিল, সারা জীবন বেতনের টাকা তো বউয়ের হাতে তুলে দেই, একদিন না হয় ডাকাইতের হাতে দিলাম। ডাকাইতরা মায়া-ছাওয়ার জন্য কপাড় কিনবে।

ভাই-ভাবীদের এরকম দুঃখ প্রকাশ দেখে প্রতিবেশীরা হেসে উঠেছিল অনেকেই। কিন্তু বড় ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল সবার মনে। খবরটা শুনে ছুটে এসেছিল সে।

প্রকাশ্য রাস্তায় এত বড় একটা কাণ্ড ঘটল, আর তুই ভিজা বিলাইয়ের মতো ল্যাজ গোটায় বাড়িতে বসে আছিস এখনও! আমার মোটর সাইকেল নিয়া এক্ষুণি থানায় যা। দারোগাকে আমার পরিচয় দিয়া এবাদ ডাকাইতের নামে কেস দিয়ে আয়।

কিন্তু এবাদ তো ছিল না। তাকে তো আমি চিনি।

আমার চাইতে বেশি চিনিস তাকে ? কোনো সন্দেহ নেই— এটা এবাদের দলের কাজ। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঐ হারামজাদাই এখন এলাকার সবচেয়ে বড় দুষ্কৃতিকারী। ডাকাতের দল গড়ে চারদিকে লুটপাট করে বেড়াচ্ছে।

বড় ভাইয়ের কথার সত্যতা প্রমাণ করতে উপস্থিত গ্রামবাসী চারদিকে চুরি-ডাকাতির অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছিল। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ক্ষমতাসীন দলের লোক হিসেবে এলাকার শান্তি বিনষ্টকারী চোর-ডাকাতদের বিরুদ্ধে বড় ভাইয়ের রাগ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মুক্তিযোদ্ধা এবাদের গতি-প্রকৃতি তারই বেশি জানার কথা। তার অনুমানকে গুরুত্ব দিলেও এবাদের নামে থানায় কেস দিতে যায় নি আফজাল। কারণ মুক্তিযোদ্ধা এবাদ ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে শত শত মানুষের সামনে বড় ভাইকে রিলিপচোর হিসেবে প্রমাণ করে নি শুধু, শাস্তি হিসেবে চুল কেটে মাথায় ঘোল ঢেলে দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। স্ত্রীর কাছে চেয়ারম্যান ভাইয়ের দূর্নীতির অনেক খবর শুনত আফজাল। এবাদের সঙ্গে ঝগড়ার কাহিনীও শুনেছিল। স্বামী-স্ত্রী দু'জন এবাদকে গোপন সমর্থন দিয়েছে। প্রশংসাও করেছিল তার সাহসের। বড় ভাই রিলিপের দুটি বিদেশী কম্বল গোপনে ছোট ভাইয়ের পরিবারেও দান করেছিল। বদনাম হওয়ার ভয়ে, মুক্তার দ্বারা সে কম্বল ফেরত পাঠিয়েছিল আফজাল। ছিনতাইয়ের ঘটনায় এবাদকে আসামী করে থানায় কেস না দেয়ায় বড়ভাই অসন্তুষ্ট হয়েছিল আফজালের ওপর। কিন্তু এবাদ আফজাল মিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল বড়বাড়ি ডাকাতি করতে এসেও। তার নির্দেশেই সম্ভবত এবাদবাহিনী আফজাল মিয়ার ঘরে ঢুকেও লুট করে নি কিছুই। কেবল চেয়ারম্যান জ্যাঠাকে বাঁচাতে গিয়ে মুক্তা ডাকাতের চড় খেয়েছিল একটা।

এবাদ ডাকাতের ওপর মুক্তার রাগ ঘৃণা থাকা খুব স্বাভাবিক। মেয়েটা এমনিতে বড্ড একরোখা। ন্যায্য কথা বাপ-জ্যাঠাকে শোনাতেও ভয় পায় না। সেদিন রাস্তায় এবাদ তার

www.pathagar.com

রিকসা থামিয়ে কথা বলেছিল। এবাদের এইটুকু অভদ্রতাও মেনে নিতে পারে নি সে। আফজাল মিয়া মেয়েকে এবং রিকসাওয়ালা ফজুকে নানাভাবে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হয়েছিল, মুক্তাকে মোটেও অপমান করে নি এবাদ। কিন্তু গ্রামের লোকজন তিলকে তাল বানাতে ওস্তাদ। এবাদ ডাকাত মুক্তার ওড়না টেনে গিয়ে গেছে পর্যন্ত রটনার দৌড় ছিল। স্বভাবতই এসব কথা শুনে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল মুক্তার। মিষ্টি নিয়ে এবাদ বাড়িতে ঢুকলে তাই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু এবাদ ডাকাতকে মেরে বড় ভাই যে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল— সেটা বোঝার মতো বাস্তব জ্ঞান এখনও হয় নি মুক্তার। হলে কুচক্রী বড় জ্যাঠাকে আর শ্রদ্ধা-ভক্তি করত না। যে এবাদ বাড়িতে আসার খবর শুনেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল বড় ভাই, আফজালের ঘরে তাকে খুন করার জন্য লোকজন নিয়ে ছুটে এসেছিল কেন ? ছোট ভাইকে খুনের এক নম্বর আসামী করার মতলব ছিল সন্দেহ নেই। বহুদিন পর নিজের আঙিনায় বড় ভাইকে দেখেই আফজাল মিয়া চক্রান্ত ধরতে পেরেছিল। এবাদ ডাকাতের পক্ষ নিতে তাই দ্বিধা করে নি। আফজাল মিয়া ও তার স্ত্রীর কারণে সেদিন এবাদ অক্ষত শরীরে বড়বাড়ি ছেড়ে পালাতে পেরেছিল। বিনিময়ে এবাদ আজ আফজাল মিয়ার প্রাণে মর্মান্তিক দাগা দেবে— বিশ্বাস হতে চায় না কিছুতেই। ঘটকের কথা মনে হলেই ঘুরেফিরে বড় ভাইয়ের শয়তানির কথা মনে আসে।

রোকেয়া ঘরে ঢুকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বামীর গায়ে হাত দিলে, শরীরে ডাকাতের থাবা পড়ার চমক নিয়ে বিছানায় উঠে বসে আফজাল। হনুফার মাকে সঙ্গে নিয়ে রোকেয়া ফিরে এসেছে। রোকেয়ার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হনুফার মা তীরের বেগে ছুটে গিয়েছিল ভাইয়ের বাড়ি। ভাতিজা এবাদ এবং ভাবির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিজয়ীর বেশে ছুটে এসেছে এই মাত্র।

রোকেয়ার বারংবার সতর্কতার কারণে হনুফার মা যেন পেটের কথা আফজাল মিয়ার কানে পৌঁছাতেও ভয় পায়, এমনই চাপা ফ্যাসফ্যাসে তার কণ্ঠস্বর। দূতিয়ালি অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ শোনায় সে। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে কান পেতে রাখার পর আফজাল মিয়া হনুফার মায়ের কথার সারসংক্ষেপ দাঁড় করায়। ঘটক পাঠানোর কথা শুনে এবাদ নাকি আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। বলেছে, সামান্য দফের ভাটিয়ার মেয়ের যোগ্য নই আমি, বিয়ে করেও বউকে সংসারে ধরে রাখতে পারলাম না, সেই আমি এলাকার মানী মানুষ আফজাল মিয়ার শিক্ষিত সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করার জন্য ঘটক পাঠাবো কোন আক্কেলে! আজকেই ঘটক শালার উপযুক্ত বিচার করবে এবাদ। মুক্তাকে নিয়ে যারা এসব বাজে কথা রটাচ্ছে, তাদের উচিত শিক্ষা দেবে। অতঃপর ফুফুকে এসব বাজে কথা আর কাউকে বলতে নিষেধ করেছে এবাদ। আর এবাদের মা বলেছে, যারা এবাদের নামে বদনাম রটায়, এ নিশ্চয় তাদের কাজ। ডাকাত হলেও বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরার মতো পাগল ছেলে নয় তার এবাদ। সবশেষে হনুফার মা নিজস্ব মত দেয়, ঘটকের দাড়ি ছিড়িয়া তোমরা উচিত কাম করিছেন বাবাজি। দেখা পাইলে মুইও ঐ শয়তান ঘটককে দুইটা কথা শোনায় দিম।

হনুফার মাকে মুখ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় দেয়ার পর আফজাল মিয়া স্ত্রীকে বলে, কথা লিক আউট হতে বেশি সময় লাগবে না। তার আগে মুক্তাকে এ গ্রাম থেকে সরানো দরকার। মেয়েকে গ্রামে আমি রাখবই না আর।

রোকেয়া সিদ্ধান্ত দেয়, কাল ভোরে মুক্তাকে তুমি হোস্টেলে রেখে এসো। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

www.pathagar.com

অবশেষে বিকেলবেলা মুক্তা মায়ের কাছে সরাসরি জানতে পারে সব। বিষয়টা নিয়ে রান্না ঘরে মা-মেয়েতে সইয়ের মতো গোপন কথা হয়। আশ্চর্য যে, সব শুনেও মুক্তার কোনো ভাবান্তর ঘটে না। রাতের রান্নায় মাকে সাহায্য করার জন্য পিড়িতে বসে আলু ছিলছে সে। আলুর দিকে একাগ্র চোখ, যেন নিজের কাজ নিজে তন্ময় হয়ে দেখছে। ছাল ছোলার পর আলুর রঙ বদল সে দেখে, কিন্তু নিজের স্বাভাবিকতা ছিন্ন হতে দেয় না।

মেয়ে আগামীকাল ভোরে চলে যাবে— রোকেয়া তাই মুরগি কেটেছে। দু'হাতে মুরগির পাখা, চামড়া খসাবার কাজের ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকায় সে। চাপা স্বরে জানতে চায়, এবাদ ডাকাত যে বিয়ের জন্য ঘটক পাঠাবে তুই কোনো আভাস পাস নাই আগে ?

প্রশ্নটা বোঝার জন্য মুক্তা মায়ের দিকে তাকায়।

সেদিন রাস্তায় রিকসা আটকে কত কথা বলেছে, তারপর বাড়িতে এসেও গুণ্ডাটা তোকে যেভাবে দেখছিল— অনুমান করতে পারিস নাই কিছু ?

না। ঘটক নানাকে মারাটা আব্বার উচিত কাজ হয় নি। তার কী দোষ ?

এরকম প্রস্তাব শুনলে কারো মাথা ঠিক থাকে ? ভয়ে তোর আব্বা ছটফট করছে এখনো।

ঘটক পাঠালেই বিয়ে হলো! এত সহজ ?

হনুফার মায়ের কাছে এবাদ অবশ্য বলেছে, ঘটক সে পাঠায় নাই। এসব অন্য কারো চক্রান্ত।

মুক্তা এবার খানিকটা বিস্মিত, মায়ের দিকে তাকায়। ইচ্ছে হয়, জোর গলায় বলতে— ঘটক নানাকে প্রস্তাব দিয়ে এবাদ ডাকাতই যে তাকে পাঠিয়েছিল, তাতে আমার একবিন্দু সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন কথা শুনলে মা মুক্তাকেও অহেতুক সন্দেহ করবে।

আমার খালি ভয় করে রে মা। টউনে একা থাকবি, ঐ ডাকাইত যদি ওখানেও তোর পিছু নেয় ? হোস্টেলের বাইরে একা কোথায়ও ঘুরবি না। কলেজের ছাত্রীবাসে বাইরের চোর-ডাকাত সহজে ঢুকতে পারবে না। পারবে ?

মুক্তা হেসে বলে, কী যে বলো মা!

দলবল নিয়ে আমাদের বাড়িতে আবার হানা দেয় যদি ?

ঐ শয়তানটা যদি আবার এ বাড়িতে ঢোকে, নিজের হাতে ওকে খুন করবো আমি।

চুপ। মেয়ে হয়ে এরকম সাহস দেখাস, মুখের ওপর কথা বলিস বলেই তো আমার বেশি ভয় করে। এমনি তো গাঁয়ের মানুষ তোকে নিয়ে বদনাম রটানোর তালে আছে। তোর আব্বা বলেছে, অনার্স পাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। ভাল ছেলে পেলে এখনই বিয়ে দেবে তোর।

www.pathagar.com

আমি যদি তোমাদের মাথার বোঝা হয়ে থাকি, তা হলে ঐ ডাকাইতের হাতেই তুলে দাও মা। মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর কী দরকার ?

ছুরি-আলু রেখে মুক্তা ঝটিতি উঠে দাঁড়ায়। অভিমানী মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে রোকেয়া বলে, তোদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করেই তো তোর আব্বা এ গ্রামে আর একদিনও থাকতে চায় না। এবার মনে হয় টাউনে সত্যি সত্যি বাড়ি করবে। আর শোন, ও বাড়ির কাউকে তোর যাওয়ার কথা বলিস না। তোর আব্বা রিকসা ঠিক করতে গেছে। তুই বই-কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে। কাল ভোরে মোরগ ডাকার আগেই রওয়ানা দিতে হবে।

ঘরে ঢুকে মুক্তা বড় আয়নার সামনে বসে। চিরুনি হাতে মাথা আঁচড়ায় আর নিজেকেই অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে। মনের আয়নায় ভেসে ওঠে এবাদ ডাকাতের স্মৃতি। নিজের দিকে তাকিয়ে মুক্তা আসলে এবাদকেই দেখে শুধু। এবার বাড়িতে আসর পর থেকে দিনে-রাতে, সেই রাস্তা থেকেই এবাদ ডাকাত তার মনে যে ভীষণ জ্বালাতন সৃষ্টি করেছে, এর শেষ কোথায়— মুক্তা জানে না। এবাদের ভয়ে কাল বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলে, শহর থেকে গ্রামে আর কোনোদিন ফিরে না এলেই কি ডাকাতটার হাতে থেকে মুক্তি পাবে সে ?

এবাদ ডাকাতই মুক্তার জীবনের প্রথম পুরুষ যে তাকে ভালবাসার কথা বলেছে, বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। ডাকাতের সাথে গোপন সম্পর্কটুকু লুকাবার জন্য কিশোরী মুক্তা একদা ঘরে ডাকাতকে দেখার প্রতিক্রিয়া কতভাবেই না ব্যক্ত করেছিল!

এবাদবাহিনী বড়বাড়িতে হামলা চালানোর পর অনেকদিন পর্যন্ত গ্রামে এবাদ ডাকাতই হয়ে উঠেছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। ডাকাতরা কোন ঘরে ঢুকে কী কী নিয়েছে, কাকে কতোটা মারধর করেছে এবং তাদের চেহারা কেমন ছিল— বাড়ির প্রত্যেকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু মুক্তার বর্ণনা ছিল উল্টো-পাল্টা, একেক বার একেক রকম। ডাকাত তাদের ঘরে ঢুকে কিছু নেয় নি শুনে অবাক হয়েছিল সাবই। যা নিয়েছিল, সেই লজ্জা লুকাতে মুক্তা মাকে পর্যন্ত মিথ্যে বলেছিল। বড় আব্বার খোঁজ না দেয়ার জন্য ডাকাতটা মুক্তাকে চুলের মুঠি ধরে গালে প্রচণ্ড চড় দিয়েছিল— এ বর্ণনা দিতে গিয়ে মুক্তা কেঁদে ফেলেছিল। ডাকাতটা যা বলে নি এবং যা করে নি, বানিয়ে বানিয়ে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছে মুক্তা। কিন্তু অন্ধকার ঘরে ডাকাতের কাছে প্রাপ্ত ভালাবাসার চুম্বন ভয়ে লজ্জায় গোপন করেছিল, আজ পর্যন্ত গোপনই রয়েছে সে ইতিহাস।

তখনও এবাদ ডাকাতকে দেখা দূরে থাক, মুক্তিযোদ্ধা এবাদকেও চিনত না মুক্তা। কিন্তু কেন জানি না, দস্যু প্রেমিককে এবাদ ডাকাত হিসেবে সনাক্ত করেছিল সে এবং এবাদ সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল মনে।

এবাদের ভাই কোবাদ হাই স্কুলে তাদের ক্লাসে পড়ত। ডাকাত বড় ভাইয়ের প্রাপ্য রাগ, ঘৃণা কতবার যে কোবাদের ওপর বর্ষণ করেছে মুক্তা। কিন্তু কোবাদ ছিল অদ্ভুত রকম শান্ত। একটা খুনী ডাকাতের ভাই এতো ভাল হয় কী করে— ভেবে অবাক হতো মুক্তা। ভাই সম্পর্কে একটি কথারও জবাব দিতো না ছেলেটি। কিন্তু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা, গ্রামের লোকজন এবাদ ডাকাত সম্পর্কে গল্প শুরু হলে থামতে চাইত না। লোকমুখে এবাদ ডাকাতের চেহারা, স্বভাব, সাহস, বীরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গল্প শুনে চুম্বনদাতা ডাকাতের পরিচয় নিয়ে আরো কোনো সন্দেহ ছিল না মুক্তার।

www.pathagar.com

প্রথম দিকে ডাকাতের গোপন উপহারের স্মৃতি সঞ্চয় মনে অস্বস্তি জাগাতো। গা ঘিনঘিন করত, অনেক সময় নিজেকে মনে হতো অপবিত্র। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘরে আবার ডাকাত ঢোকার আতঙ্ক জাগত মনে। ঘুমের মধ্যেও একাধিকার ডাকাতটা ভাল্লুকের মতো কালো জন্তু হয়ে মুক্তাকে চেপে ধরেছিল। গোঙানো আর্তনাদ শুনে মা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল মুক্তার। কিন্তু লোকমুখে এবাদ ডাকাতের গুণগান শুনে ডাকাতিয়া চুম্বনের স্মৃতিস্বাদ অনেক সময় মনে অন্যরকম শিহরণ জাগাতো। তখন এবাদ ডাকাতকে ঘিরে কত রকম দুঃসাহিসক গোপন অভিযানের কল্পনা করতো কিশোরী মুক্তা। কিন্তু বাস্তবে ডাকাতটার সঙ্গে আবার চোখের দেখা হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

ম্যাট্রিক পাসের পর, বৃষ্টির দিনে একদিন ফাঁকা ঘরে রুবেল ভাইয়ের আচরণ এবাদ ডাকাতকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। ঘৃণ্য ডাকাতের চেয়েও নিষ্ঠুর এবং পাশবিক ছিল রুবেলের ব্যবহার। সেদিনই প্রথম এবাদ ডাকাতকে অনেক সভ্য এবং সুন্দর মনে হয়েছিল মুক্তার। কিন্তু যতো সুপুরুষ ও আকর্ষণীয় হোক এবাদ ডাকাত, তাকে একবার চাক্ষুষ দেখার বাসনা কিংবা জীবনে আর দেখা না হওয়ার বেদনা কোনোটাই মুক্তার মনে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না আর। কারণ বয়ঃসন্ধিক্ষণে পাওয়া প্রথম ভালবাসার স্মৃতিকে তুচ্ছ করে ততদিনে দেহমনে বেশ বেড়ে উঠেছে মুক্তা। ম্যাট্রিক পাসের পরই তাকে শহরের সরকারি মহিলা কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। শহরের পরিবেশ, নিজের লেখাপড়া, স্বপ্ন-সাধনার মাঝে একজন জেলবন্দি খুনী আসামীর স্মৃতিকে প্রশ্রয় দেয়ার মতো বোকা মেয়ে ছিল না মুক্তা, তেমন অবকাশও ছিল না।

রাস্তায় এবাদ ডাকাতকে দেখে মুক্তা তাই বেশ চমকে উঠেছিল । এবাদ শুধু তার মনে প্রথম ভালবাসা ও ডাকাতিয়া চুম্বনের স্মৃতিস্বাদ প্রবল জাগিয়ে দেয় নি, মুক্তার জীবনে এবাদ ডাকাতের পুনঃআবির্ভাবকেও নিশ্চিত করে তুলেছিল। বাড়িতে ফিরেই সে ঘোষণা করেছিলো, এবাদ ডাকাত চরম সর্বনাশ ঘটাতে বড় বাড়িতে আবার আসবে, শীঘ্রই আসবে।

মুক্তার কথা অবিশ্বাস করে নি কেউ। এবাদ ডাকাত মুক্তি পাওয়ার পর থেকে বড় আব্বা রাতে বাড়িতে ঘুমাত না। কারণ জেল থেকে বেরুনোর পর ডাকাতটার দাপট নাকি বহুগুণ বেড়েছে। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বড় আব্বার বিরোধী পক্ষের ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাও যোগ দিয়েছে ডাকাতটার দলে। অন্যদিকে এবাদবাহিনীকে প্রতিহত করার ক্ষমতা চেয়রাম্যান থাকার সময়ে বড় আব্বার ছিল না— এখন তো আরো নেই। চেয়ারম্যানী হারিয়ে মানুষটা সবদিক দিয়ে দুর্বল হয়েছে। এবাদ ডাকাতের কথা উঠলে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায় চেহারা। মুক্তার সামনে সেদিন ছেলেমানুষের মতো কেঁদে বলেছিল, 'মা রে, বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিব, তাকেও ষড়যন্ত্র করে খুনীরা সপরিবারে হত্যা করেছে। এবাদ খুনীও আমাদের ছেড়ে দেবে না। তোফাজ্জল ভূঁইয়াকে ক্ষতম করার জন্যই এই সরকার তাকে জেল থেকে বের করে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে।' বড় আব্বার অসহায় অবস্থা দেখে খুব খারাপ লেগেছিল মুক্তার। কিন্তু ডাকাতটার ওপর মনে প্রচণ্ড রাগ, ঘৃণা পুষে রাখা ছাড়া কী করার আছে তার ? সজনা গাঁয়ের পুরুষরা জোট বেধেও যে একা এবাদ ডাকাতকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না— সেদিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে মুক্তা। প্রাণে না মারুক, গণপিটুনি দিয়ে শয়তানটার হাত পা যদি ভেঙে দিতো, তা হলে ডাকাতের বউ হওয়াব প্রস্তাব শুনতে হতো না আজ।

www.pathagar.com

সকালে বাড়িতে ঘটক নানার চেহারা দেখে মুক্তা মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিল, এবাদ পাঠিয়েছে তাকে। কারণ একমাত্র এবাদই কারো চেহারায় অমন আতঙ্ক জাগাতে পারে। মোটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর মুক্তা জানত, ডাকাতটার সঙ্গে তার আবারও দেখা হবে। বাড়িতে, রাস্তায় কিংবা শহরে আবার মুখোমুখি হবে তারা। দেখা হলে কী ঘটবে, কী বলবে— এসব নিয়ে মুক্তা অনেক ভেবেছে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ঘটক পাঠাবার সম্ভাবনার কথা একবারও ভাবে নি সে। আব্বা-মা অবশ্য বিশ্বাস করে নি। হনুফার মা ঠাকুরপাড়া গিয়ে ঘটনার সত্যতা খুঁজে না পাওয়ায় ঘটকের পেছনে ষড়যন্ত্র খুঁজছে তারা। কিন্তু মুক্তার মন বলছে, চক্রান্ত ফক্রান্ত যাই থাক, পাঁচ বছর আগে অন্ধকার ঘরে মুহূর্তের ভালবাসাকে এবাদ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এখন এ সমাজ ছেড়ে মুক্তাকে তাই পালাতে হবে। এবার শহরে গেলে আব্বা আর কেনোদিনই হয়তো মুক্তাকে ফিরিয়ে আনবে না। কিন্তু সারা জীবন আর দেখা না হলেই কি ডাকাতটার কথা ভুলতে পারবে মুক্তা? এবার বাড়িতে আসার পর থেকে এবাদ ডাকাতকে ঘিরে মাথার ভেতরে এইসব ভাবনা, বুকের ভেতরে রাগ, ঘৃণা, কখনওবা আতঙ্কের অনুভূতি নিয়ে দিন কেটেছে মুক্তার। বাড়ির বাইরে আগের মতো অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা নেই, এমনকি ওবাড়ির উঠানে যাওয়াও বন্ধ। কিন্তু ঘরে বন্দি থাকলে যে ডাকাতটার স্মৃতি-ছবি-কল্পনা মুক্তার মনে হামলা চালাবার সুযোগ বেশি পায়, বাবা-মাকে এ কথা বলতেও পারে না মুক্তা। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে। দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা-মায়ের অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে।

সন্ধ্যার মধ্যে আজ বাইরের কাজ-কর্ম শেষ করেছে মা। খাওয়াদাওয়ার পালা চুকতেই বন্ধ করেছে ঘরের দরজা। চোর-ডাকাতের উৎপাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য ঘর পাকা করা হয়েছে। কিন্তু বন্ধ পাকা ঘরে বসেও মুক্তার বাবা-মা আজ বোধহয় নিরাপদ বোধ করে না। ফিসফাস স্বরে কথা বলে। মুক্তা বাবা-মায়ের কথায় কান পাতার চেষ্টা করে না। পাশের ঘরে ছোট ভাই-বোনদের সঙ্গে পড়তে বসেছে সে। টেবিলে হারিকেনের আলোয় বই মেলে, বইয়ের দিকে তাকিয়ে মুক্তা আসলে ভাবছে এবাদের কথা। গোপন ভাবনার ভার কমানোর জন্যেই হয়তো ডাকাতটাকে একটা চিঠি লেখার চিন্তা মাথায় আসে। চিঠির সম্বোধন 'হারামজাদা' অথবা 'কুত্তার বাচ্চা' লেখার কথা ভেবে মুক্তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফোটে, ঠিক তখন বাইরে গুড়াতি ঘটকের কণ্ঠ ভেসে আসে।

ও দামান্দ বাবাজি! এবাদ মোকে বাড়ি হইতে ধরি আনল বাহে। হামার বোলে বিচার করবে।

গুড়াতির কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসার পর ঘরে-বাইরে ভূতুড়ে স্তব্ধতা। ভূতের ভয়েই যেন মুক্তা পাশের ঘরে ছুটে যায়। তার পিছু ছোট ভাই-বোন দুটিও। মুক্তার বাবা-মা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বোবা। বাইরে এবার স্বয়ং এবাদ ডাকতের কোমল কণ্ঠস্বর।

মিয়াভাই, ও মিয়া ভাই, সন্ধ্যাতেই ঘুমায় পড়েছেন নাকি? গুডাতি ঘটক সকালে আমার নামে কী যাতা কথা বলে গেছে। বেরিয়ে আসেন ভাই, সামনা-সামনি মোকাবেলা করব। সেই কারণে আমি ঘটক দাদাকে নিয়ে আসলাম।

ঘরের ভেতরে থমথমে নীরবতা। বাইরে গুড়াতি ঘটকের কণ্ঠ কান্নায় খান খান হতে থাকে।

বিচার করি মোকে মারি ফেলাও তুই। ঘটকগিরি করি চৌদ্দ পুরুষের আক্কেল হইছে মোর। মোকে মারি ফেলাউক, তবু তোমরা দরজা খোলেন না জামাই। ও বাবারে, মোকে শেষ করি

www.pathagar.com

ফেলাইল রে...

ও মিয়া ভাই, আপনি বেরিয়ে এসে বিচার না করলে কিন্তু গুড়াতি ঘটকের লাশ আপনার বাড়িতে ফেলে রেখে যাব আমি।

ও দামান্দ। ও বাবা রে। এবাদ মোকে মারি ফেলাইল বাহে, ও চেয়ারম্যান সাহেব, তোমরা আগায় আইস বাহে...

বাইরে একটা মানুষের মরণ-কান্না ও সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার শুনেও আব্বা-মায়ের ভয় কাটে না দেখে মুক্তাই প্রথম নীরবতা ভাঙে।

নানাকে বুঝি মেরে ফেললো। দরজা খুলে দেখেন। বড় আব্বাকে ডাকেন।

রোকেয়া মেয়ের মুখ চেপে ধরে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়। জানালা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাবার চেষ্টা করে, তখন দরাজয় এবাদের করাঘাত। তার হাত ও গলার ভদ্র আওয়াজ শুনে মনে হয় না কোনো কুমতলব আছে।

ও মিয়া ভাই, ঘটক আমার নামে কী বলেছে তার বিচার হওয়া উচিত। তা না হলে আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন । কোনো ভয় নেই আপনার, বাইরে আসেন একটু।

কে ? এবাদ ? দাঁড়াও, আমার তো সন্ধ্যাতেই ঘুমানো অভ্যাস।

পাশের ঘর থেকে মুক্তা দরজা খোলার শব্দ এবং দরজা খোলা মাত্র এবাদের ঘরে ঢোকাটা টের পায়। বাবা-মায়ের সঙ্গে তার কথাবার্তা কানে আসে।

কী ব্যাপার ? কীসের বিচার তুমি করতে চাও ?

সকালে ঘটক আমার নামে কী বলেছে আপনাকে ?

ওসব কথা আমি বিশ্বাস করি নাই এবাদ। সে জন্যে ঐ বুড়ো শয়তানকে যা শাস্তি দেওয়ার আমি দিয়েছি। এখন আবার কীসের বিচার ?

কিন্তু ঘটক যে আমাকে বললো, আপনি রাজি হয়েছেন এবং এক মাস পরে মুক্তাকে আমার হাতে তুলে দেবেন।

ছি! ছি! এসব কী কথা বলছো তুমি! তোমাকে আপন ছোট ভাইয়ের মতো ভাবি এবাদ। ডাকাত হলেও তোমার ধর্ম, তোমার আদর্শকে আমি শ্রদ্ধা করি।

বেশ ভাল কথা। আমিও আপনাদের আপন হয়ে থাকার জন্য প্রস্তাবটা পাঠিয়েছিলাম। এখন এসেছি আপনাদের মেয়ে মুক্তার মতামত জানার জন্য।

তোমার কি মাথা খারাপ হইল এবাদ ? আমাদের মেয়ে অনার্সে পড়ে, ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েই আছে। আমার মেয়ের জীবন নষ্ট করার আগে তুমি আমাকে গুলি করে মারো, করো গুলি।

করবো। তার আগে মুক্তাকে ডাকেন। আমি তার মুখে কথাটা শুনতে চাই।

মুক্তা তো বাড়িতে নাই। বিকেলে ওর নানার সাথে ওকড়াবাড়ি গেছে।

মুক্তা পাশের ঘরে দরজার আড়ালে লুকিয়ে ডাকাতটার সঙ্গে বাবা-মায়ের কথাবার্তা শুনছিল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, লোক জড়ো করার জন্য চিৎকার শুরু করবে, নাকি চেলাকাঠটা হাতে ডাকাতের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে— কর্তব্য স্থির করতে না পেরে বুক ঢিপঢিপ করছিল

www.pathagar.com

তার। এমন সময়ে হাততালির আওয়াজ এবং পরক্ষণে বাবা-মায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার শুনে মুক্তা পাশের ঘরে ছুটে যায়।

এবাদ ডাকাতের মুখোমুখি হয়ে মুক্তা বোবা হয়ে যায়। কারণ একা এবাদ নয়, ঘরে আরো তিনজন মুখোশ পরা ডাকাত ঢুকেছে। একজন তার বাবার গলা পেঁচিয়ে ধরে মুখ চেপে ধরেছে। একজন লম্বা ছুরি উঁচিয়ে মাকে ধমকায়— চোপ। আর একজন সম্ভবত বন্দুক হাতে দরজায় দাঁড়ানো।

এবাদ মুক্তার হাত চেপে ধরে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, তুমি যদি আপসে এ প্রস্তাবে রাজি না হও, স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে না যাও, তাহলে তোমার জীবন নষ্ট হবে, তোমার আব্বা-মা-জ্যাঠাকেও হারাবে।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মুক্তার মা প্রতিরোধের চেষ্টায় গলা ছেড়ে চিৎকার করে, ও আল্লা রে... আগান বাহে... এবাদ ডাকাইত হামার মুক্তাকে শেষ করল বাহে...

চোপ। চিৎকার করে লাভ নেই।

বাইরে গুলি বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ মানুষের বাকশক্তিকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দেয় যেন। মুক্তাকে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবাদ।

এবাদ ডাকাতের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে একদল ডাকাতের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মুক্তার মনে হয়, ভয়ঙ্কর একটি দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। বড়বাড়ির চিৎকার, হৈচৈ পেছনে মিলিয়ে যাওয়ার পর চারপাশের পরিচিত গ্রামখানাও সে আজ চিনতে পারে না। একাত্তরে বড় বাড়িতে পাকিস্তানী মিলিটারি আসার খবর শুনে ভয়ে সবাই দিগ্বিদিক পালিয়েছিল— এবাদ বাহিনীর বন্দুকের আওয়াজ শুনে গাঁয়ের মানুষ তেমনি বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে কি? সন্ধ্যার অন্ধকারেও আজ মধ্যরাতের সুনসান স্তব্ধতা। এমন গা ছমছম করা নির্জন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার ভয়েই যেনবা মুক্তা একমাত্র পরিচিত এবাদের হাত আঁকড়ে ধরে। এবাদ তাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে— মুক্তা একবারও তা জানতে চায় না।

ঠাকুরপাড়ার সুরেশ বাবুর বাড়ি পুজো দেখতে এসে দূর থেকে একবার এবাদ ডাকাতের বাড়ি দেখেছিল মুক্তা। আজ সেই বাড়িতে পৌঁছে লণ্ঠনের আলো এবং অনেক লোকজন দেখতে পায় সে। এ গ্রামের লোকগুলো যেন আজ ডাকাতের বউ হিসেবে মুক্তাকে বরণ করে নেয়ার জন্য জড়ো হয়েছে এবাদের খুলিতে। এবাদ বাড়ি ভরা লোকজনের ভেতর দিয়ে মুক্তাকে নিয়ে একটা ঘরে ঢোকে। ঘরের দরজায় ভিড় করে দাঁড়ায় অপরিচিত নারী মুখ। এবাদ মুক্তার হাত ছেড়ে দিয়ে এই প্রথম কথা বলে, এভাবে তোমাকে ঘরে তোলা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। মৌলবি ও কাজিকে খবর দেয়া হয়েছে। ধর্ম ও সমাজ সাক্ষী রেখে আমাদের বিয়ে হবে। বিয়ের পর তুমি আমাকে যা শাস্তি দাও মাথা পেতে নেবো আমি।

মুক্তা এবাদ ডাকাতকে নয়, যেন তার নিয়তিকে জীবনে এই প্রথম স্বচক্ষে দেখার বিস্ময় নিয়ে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। এবাদ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দরজার কাছে দাঁড়ানো মেয়েদের উদ্দেশে বলে, কই রে পেয়ারি। বিয়ার কইন্যাকে পাহারা দাও, খাতির যত্ন করি সাজায় দাও।

www.pathagar.com

ঘরে ঢুকে অচেনা মেয়েগুলো মুক্তাকে আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দে কলকল করতে থাকে। তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের ভাতিজি, আফজাল মিয়ার মেয়ে ও শরফ হাজির নাতনী হিসেবে তাকে সনাক্ত করার পরও একজন জানতে চায়, তোমার নাম মুক্তা না?

মুক্তা জবাব দেয় না। পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েগুলোকে ডাকাত পক্ষের এবং ডাকাতটার নিকট আত্মীয়-স্বজন ভেবে তাদের চেনার কৌতূহল পর্যন্ত জাগে না। মুখোমুখি দাঁড়ানো মেয়েটি নিজের পরিচয় দেয়, আমি এবাদ ডাকাইতের বইন— পেয়ারি। মানুষ ডাকাইত কয়, কিন্তু ভাইজানের মতো ভালা মানুষ আর হয় না। বিয়া করবে বলে গতকাল শ্বশুরবাড়ি হইতে আমাকে নাইওর আনিছে। কিন্তু পাত্রী কে, বাড়ি কোথায়, কার মেয়ে, কী বৃত্তান্ত— এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু কয় নাই। তোমাকে কি বাড়ি হইতে জোর করিয়া উঠায় আনল, নাকি আপন ইচ্ছায় আসলেন?

মুক্তার হয়ে অন্য মহিলা দুটি কথা বলে, আপন ইচ্ছায় না হইলে এবাদের হাত ধরিয়া হাঁটি হাঁটি আইসে? জোর করি আনলে কাঁদাকাটি করিল হয়। কই কইনার চক্ষে পানি কই?

মুক্তা তবু কাঁদে না। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে নরম গলায় বলে একজন, যাই কন, এবাদের কাজকারবার একেবারে দুনিয়া ছাড়া? তোমাকে কোণ্ঠে থাকি ধরি আনল? তোমার বাপ-মা...

ঘরে এসেই যে মহিলাটি কনের গা-মাথায় হাত বুলিয়ে তার অব্যক্ত কান্না নিজের কণ্ঠে ধারণ করে, তাকে ডাকাতের মা হিসেবে চিনতে বিলম্ব হয় না।

হায় খোদা! ডাকাইতের বাচ্চাটা এ-কী আগুন লাগাইল মা! সেই জন্যে বৈকালে মোকে কয়, এমন মেয়েকে মুই বউ করিম যার জন্যে মোর জীবনটা নতুনভাবে শুরু হইবে, না হয়তো আইজ রাইতে মোর মৃত্যু হইবে। হনুফার মা সকালে আইল, তার কাছে ঘটক পাঠানোর কথা পর্যন্ত কবুল করে নাই। তোকে বিয়া করতে চায় জানলে ডাকাইতের বাচ্চাকে নিজে বাড়ি হইতে বার করি দিনু হয়। তোর চেয়ারম্যান জ্যাঠোর চক্রান্তে মোর ভাল বেটাটা ডাকাইত হইল, আজ আবার সেই মানুষ ভাতিজিকে সঁপি দিয়া এবাদ ডাকাইতকে জামাই বানাইতে চায় ক্যানে? নিশ্চয় এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। যা মা, তুই পালায় তোর বাপ-মায়ের কাছে ফিরি যা।

পেয়ারি মাকে ধমক দেয়, এবাদ ডাকাইত যাকে বিয়া করার জন্য বাড়ি হইতে তুলি আনছে, পলায় গেইলেই তার কি অন্যখানে আর বিয়া হইবে? অসম্ভব। তাছাড়া ভাইজানের বিয়াতে কত মানুষ জড়ো হইছে। তোফাজ্জল চেয়ারম্যান নিজে আসছে। বিয়ার পর আল্লার রহমতে সব ঠিক হইবে। আর ভাল হওয়ার জন্যে তো ভাইজান আবার বিয়া করতোছে।

আফজাল মিয়ার বেটিকে ধরি আনার কথা শুনিয়াই কোবাদ বাড়ি ছাড়ি পলায় গেল। এ বিয়াতে কোবাদ থাকবে না, মুইও বাড়ি ছাড়ি চলি যাইম। বান্দরের গলায় মুক্তার মালা দেখলে দুনিয়ার মানুষ কেউ সহ্য করবে না রে।

এবাদের মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মুক্তা পেয়ারির সঙ্গে প্রথম কথা বলে, আমি বাথরুমে যাব।

পেয়ারি এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে মুক্তার হাত চেপে ধরে বাইরে বেরয়। আঙিনায় নেমে

www.pathagar.com

মুক্তা বাড়ির খুলিতে হ্যাজাক বাতির আলো ও নিজের বিবাহ-মজলিশ লক্ষ করে। বাড়িভরা লোকজনের কলরব। কুয়ার পাড়ে যাওয়ার বদলে বিয়ের পাত্রীকে উঠানে থমকে দাঁড়াতে দেখেই পেয়ারি সতর্ক গলায় বলে, হাতমুখ ধুইতে যাবেন না ?

না। আমার বড় আব্বা কোথায় ? তাকে ডাক।

হায় আল্লা! বিয়ার কইনাকে মানুষ বাইরে দেখলে কবে কী! আইসেন ঘরে আইসেন। আপনার বড় আব্বা এখন ঘরে আসবে।

মুক্তাকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে বিছানায় বসিয়ে দেয় পেয়ারি। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, বিয়া পড়ানো মনে হয় শেষ। এখন কাঁদাকাটি করি কোনো লাভ নাই ভাবি। গ্রামের মুরব্বিরা উপস্থিত থাকি বিয়া পড়াইল। কয়দিন বাদে দেখবেন তোমর বাপ-মা সবাই মানিয়া নেবে। এ আন্দাজ আমার শ্বশুর ঠেটার হদ্দ। বেটাকে ত্যাজ্য করিয়াও আবার আপস করছে। আল্লা কলম দিয়া যার সাথে যার জোড়া লেখি রাখে, কোনো বান্দা কি তা খণ্ডাইতে পারে ?

উপস্থিত অন্য মহিলারাও পেয়ারির দালালিতে সায় দেয়। মুক্তা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমি পালাবো না। আমার বড় আব্বাকে ডাক।

তোফাজ্জল ভূঁইয়া ঘরে ঢুকে মুক্তাকে দেখেই হুহু কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু মুক্তা যেন আনন্দ-বেদনার বাস্তব জগত থেকে অনেক দূরে, দুঃস্বপ্নের ঘোরে বন্দি এখনো। অবাক হয়ে বড় জ্যাঠার কান্না দেখে। পাঞ্জাবি দিয়ে চোখ মুছে ভাঙা গলায় কথা বলে তোফাজ্জল চেয়ারম্যান, মা রে, এবাদ তোকে যেমন বাড়ি হইতে ছিনিয়ে আনি কলঙ্কিত করল, আমাকেও তেমনি ধরি আনিয়া অপরাধী করিল রে মা। কারণ তোর বাপ-মা আমাকে ভুল বুঝবে। এবাদের হাত হইতে তোকে উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই রে মা। সেই জন্য আল্লার ওপর ভরসা করি এক লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করি এবাদের হাতেই তোকে তুলে দিলাম মা। দোয়া করি, আল্লা তোর কপালে সুখ রাখলে ডাকাইতের ঘরে সুখে থাকবি তুই।

বড় আব্বা, আপনি কাঁদছেন কেন ? এবাদ তো আপনার মতো আমাকে ছিনিয়ে আনে নাই। আমি নিজেই তার হাত ধরে চলে এসেছি। আপনারা এতগুলো মানুষ এবাদ ডাকাতের সাথে পারলেন না। কিন্তু আমি একাই যেদিন তাকে চরম শিক্ষা দিতে পারবো, সেদিন বাড়ি ফিরে যাবো। আব্বা-মাকে বলবেন আমার জন্য চিন্তা না করতে।

নববধূর কথা শুনে ঘরের নারী-পুরুষ সকলেই স্তব্ধ হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। মুক্তাকে অপলক তাকিয়ে দেখে সবাই। অচেনা পুরুষ একজন হেসে মন্তব্য করে, যোগ্য মেয়েকেই বিয়া করল এবাদ ডাকাইত। আমাদের আর কিছুর বলার নাই। করারও নাই।

আর একজন লোক ভয়ে ভয়ে মুক্তার দিকে কাগজ-কলম এগিয়ে দেয়, এখানে আপনার সই লাগবে।

মুক্তা ছাপানো ফরমে নিষ্কম্প হাতে স্বাক্ষর করে বলে, বড় আব্বা, নতুন জামাইয়ের বাড়ি এসেছেন। না খেয়ে যাবেন না।

তোফাজ্জল ভূঁইয়া ও তার পিছু পিছু অন্যরাও দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

www.pathagar.com

ডাকাতরা যুবতী মেয়েকে অপহরণ করার পর আফজাল মিয়ার মাথা খারাপের লক্ষণগুলো ক্রমে নিজের মাথায়ও স্পষ্ট হতে থাকে।

ঘটনাটি ঘটেছে রাত নয়টার দিকে। তারপর আর ঘরের দরজা লাগায় নি সে। গাঁয়ের মধ্যে আফজাল মিয়ার ঘরটি যেমন পাকা, তেমনি দরজাও সার-কাঁঠালের। দুটি সিটকিনি ছাড়াও শক্ত খিল ছিল দরজায়। কৌশলে এমন নিরাপদ ঘরে ঢুকে এবাদ ডাকাত অফজাল মিয়ার নয়নের মণি মুক্তাকে তারই চোখের সামনে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বাধা দেয়া দূরে থাক, আফজাল টু শব্দটি করতে পারে নি। এখন আর দরজা বন্ধ করে কী লাভ? মুক্তা ফিরে আসবে না, কিন্তু এবাদ বাহিনী আবার ফিরে আসুক, আফজাল মিয়ার স্ত্রী, অবশিষ্ট দুই সন্তান সুক্তি, অঙ্কুর এবং ঘরের সমুদয় মাল-ছামানা লুট করুক, আফজাল বিছানায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে দেখবে শুধু।

বাড়িতে লোকজন জড়ো করেছে আসলে রোকেয়া। মুক্তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়েও সে ডাকাতদের অস্ত্রের মুখে চিৎকার করেছে। আঙিনায় গুলি ও বোমা ফাটানোর বিকট আওয়াজ রোকেয়ার গলা-ফাটানো কান্না অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের কানেও পৌঁছতে দেয় নি। ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর রোকেয়ার সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও গলা মিলিয়েছে।

আফজালের বড় ভাইদের পরিবার-পরিজন ছুটে এসেছে প্রথম। কারণ চাল-চুলা উঠান ভিন্ন হলেও বাড়ি তো একটাই। একজনের বিরুদ্ধে কানকথা হলে অন্যদের কানে অনায়াসে পৌঁছে যায়। কাজেই অফজালের পরিবারের চেঁচামেচি ও বোমার আওয়াজ শুনতে পাইনি বলার উপায় নেই তাদের। বড়ভাবি বাইরে থেকে শিকল খুলে মুক্ত করেছে তাদের। তারপর আফজাল মিয়ার সর্বনাশ সবার কাছে মেলে ধরার জন্য রোকেয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়েছে সবাই। হইচই ও ছোটাছুটি ক্রমশ বাড়ছে।

মুক্তাকে ছাড়া ডাকাতরা বড়-বাড়ির এক টাকার সম্পদও লুট করে নি। অন্ততঃপক্ষে মুক্তার সঙ্গে ডাকাতরা তার বাবা-মায়ের চোখের ঘুম হরণ করে নিয়ে যাবে— সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মেয়েকে হারিয়ে আফজাল মিয়ার ঘুম পাচ্ছে যেন। বিছানায় শুয়ে পড়েছে সে। পাড়া-পড়শীরা রাতের ঘুম হারাম করে মুক্তাকে উদ্ধারের জন্য ছোটাছুটি এবং হইচই করছে। এবাদ ডাকাত-বিরোধী কথাবার্তা হচ্ছে নানারকম এবং এবাদ ডাকাতের হাত থেকে মুক্তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয় বলছে যারা, তারাও অন্তত মুক্তার মা-চাচীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদছে, কিন্তু স্বয়ং মেয়ের বাবা বিছানায় শুয়ে চুপচাপ। লোকজনকে মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে কি আফজাল মিয়া? মানী মানুষ, মেয়েকে হারাল, মান-সম্মানও গেল। তাছাড়া মুখ চেপে ধরে ডাকাতরা কি তার কথা বলার মুখও চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে গেছে? এরকম সন্দেহ জাগে অনেকের।

সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পর বাড়িতে সাহায্যকারী লোকজনের ভিড় ও নানামুখী মন্তব্য অসহ্য লাগে আফজাল মিয়ার। মুক্তা অপহরণের মতো ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনাটি সহজে হজম

www.pathagar.com

করতে পারছে না কেউ। ফলে ঘটনাটি লোকজনের মুখে বার বার ঘটতে থকে। যারা প্রত্যক্ষ করে নি, তারা লোকজনের বয়ান শুনে এবং যারা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না, তারাও এবাদ ডাকাত ও তার বাহিনী সম্পর্কিত নানারূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে মন মেজাজ। কিন্তু আফজাল মিয়ার অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গেছে। উপস্থিত লোকজনসহ নিজের ঘরবাড়িকে মনে হয় ফাঁদের মতো— যেখানে আটকা পড়ে অসহায় আফজাল মিয়ার শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু আর করার নেই। এই ফাঁদ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ ছিল গ্রাম ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু যথাসময়ে পালাতে না পারার জন্যে কাকে দায়ী করেব সে ? কাউকেই দায়ী করার কোনো মানে হয় না আর। একাত্তরে পালিয়ে বাঁচার কথা মনে পড়ে।

তখন সপরিবারে শহরের ভাড়া বাসায় থাকত আফজাল মিয়া। তার ভাড়াটে বাসার কাছেই ছিল আওয়ামী লীগের জেলা-প্রধান নেতা ও নামজাদা এক উকিলের বাড়ি। পঁচিশে মার্চের কালরাতে হঠাৎ গোলাগুলির বৃষ্টি শুরু হলে, ভয়ে দিশেহারা আফজাল ছুটে গিয়েছিল পরিচিত নেতার বাড়িতে। একই দল করত বলে বড় ভাইয়ের সঙ্গে ভাল চেনাজানা ছিল উকিল সাহেবের। সেই সুবাদে আফজালকেও তিনি ছোটভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। গোলাগুলির শব্দ শুনে আফজাল তাই ছুটে গিয়েছিল প্রতিবেশী নেতার বাড়িতে। কিন্তু নেতা ও তার পরিবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। খবরটা জানার পর বাসায় ফিরে আতঙ্ক বেড়ে গিয়েছিল আফজালের। বাকি রাত আর ঘুম হয় নি। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে উৎকর্ণ থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছে, আর গুলির উৎস ও কারণ নিয়ে গবেষণা করেছে।

রাতের উদ্বেগ-আতঙ্ক দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল দেশময়। শহরের রাস্তায় মেশিনগান উঁচিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারির সাজোয়া গাড়ির ছোটাছুটি দেখে এবং রেডিয়োতে কার্ফু জারির খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা শহর। আন্দোলন নেই, নেতা নেই, রাস্তায় মিছিল-শ্লোগান নেই, আকাশে স্বাধীন বাঙলার পতাকা ওড়ে না, বাতাসে জয় বাংলা ধ্বনি ভাসে না— গৃহবন্দি শহরবাসী মানুষের হায়হায় করা ছাড়া তখন কিছু করার নেই। ঘরে থেকেও আফজাল মিয়া মৃত্যুভয়ে ছটফট করছিল দিনরাত। মুক্তা তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। সুক্তি কোলে, আর অঙ্কুরের তখনও জন্ম হয় নি। মেয়ে দুটিকে নিয়ে শহরের বাসায় থাকা মুহূর্তের জন্যেও নিরাপদ বোধ করে নি আফজাল। ভয়টা বেড়ে গিয়েছিল মূলত প্রতিবেশী নেতার কারণে। মিলিটারি যে-কোনো সময় নেতার সন্ধানে আসতে পারে এবং নেতাকে খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে আগুন না জ্বালাক, এলোপাতাড়ি গুলি চালাবে নির্ঘাত। সেরকম কিছু ঘটলে সপরিবারে মৃত্যুবরণ করার ভয়টা আজগুবি ভয় ছিল না মোটেও। আর এরকম আশঙ্কা থেকেই হয়তো গ্রামের বাড়িতে গুজব রটেছিল, নেতার সঙ্গে আফজাল মিয়াও মিলিটারির গুলিতে নিহত হয়েছে।

নেতা এবং ছোট ভাইয়ের খোঁজ নিতে আফজালের চেয়ারম্যান বড় ভাই অবশেষে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহরে এসেছিল। মওলানার ছদ্মবেশ নিয়ে মিলিটারির গাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে আফজাল মিয়ার বাসায় ঢুকে, ছোট ভাইকে জীবিত দেখে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল সে। নিজের মৃত্যু-রটনা বড়ভাইয়ের মুখে প্রথম শুনেছিল আফজাল। তারপর রটনাটি সত্যি ঘটনা হয়ে হয়ে ওঠার আগে, চাকরির মায়া ত্যাগ করে সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে এসেছিল আফজাল মিয়া।

মুক্তিযুদ্ধের সময়টায় গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিরাপত্তাবোধ জাগালেও মিলিটারি—

www.pathagar.com

আতঙ্ক দূর করতে পারে নি। রাতে বিছনায় শুয়ে কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠত। রোকেয়াকে বারবার জিজ্ঞেস করত, মিলিটারি যদি গ্রামেও ছুটে আসে? লোকজন বলাবলি করত, রাজাকাররা গোপনে পাকবাহিনীকে গ্রামে ডেকে আনলে, চেয়ারম্যান-বাড়িতেই হানা দেবে প্রথম। শত্রুবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারানোর চেয়ে এসময় স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত হারানোর শঙ্কাটাই বড় হয়ে উঠেছিল আফজাল মিয়ার কাছে। মুক্তা তখন সবে ওড়না পরতে শুরু করেছে। বয়সের তুলনায় বাড়ন্ত শরীর, নিজের মেয়েকেও মাঝেমধ্যে অবাক ও মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখত আফজাল, নারী-শরীর শিকারী জানোয়ারগুলিকে মুক্তা যে আকৃষ্ট করবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তার। রাতে মিলিটারি প্রসঙ্গে কথাবার্তার সময় রোকেয়ার কাছে একদিন ভয়টা খোলাখুলি প্রকাশ করেছিল আফজাল, মুক্তাকে নিয়ে কেন জানি না আমার খুব ভয় করে। মেয়েটা বড় হচ্ছে, চোখে ধরার মতো সুন্দর হয়ে উঠছে— কখন যে কী হয়।

রোকেয়া নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছিল, 'মিলিটারি এলে তোমার মেয়ে-বউ কাউকে রেহাই দেবে না। তোমার চোখের সামনেই হয়তো বেইজ্জত করবে। হায় আল্লাহ, তার আগে যেন জালেমরা আমাদের সবাইকে একসাথে গুলি করে মারে।

আফজাল মিয়া সেদিনও নীরব ছিল। শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হলে, স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত ও জীবন রক্ষার জন্য নিজের করণীয় সম্পর্কে ভেবে পায় নি কিছু। প্রতিরোধের সাহস কিংবা আত্মরক্ষার কৌশল নির্ধারণ করতে পারে নি। সে জন্যেই কি মুক্তাকে ওরা এত সহজে ঘর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

রোকেয়া ঘরে এসে স্বামীকে মরার মতো বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে নিজে আরো বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে। কান্না থামিয়ে লড়াকু মেজাজে হুঙ্কার দেয়, ঘরের কোণে বিলাইয়ের মতো পলায় থাকলে তোমার বেটির ইজ্জত রক্ষা হবে? যাও, এই দণ্ডে থানায় যাও। মুক্তাকে নিয়ে ওরা যাতে টাউনে পালাতে না পারে, স্টেশনে লোক পাঠাও এক্ষুণি।

পাকবাহিনীর সামনে খালি হাতে কেউ দাঁড়াতে পারে? দাঁড়িয়ে লাভ আছে?

কীসের পাকবাহিনী? ঠাকুর পাড়ার সামান্য চাষার বেটা এবাদ, যত পালোয়ান ডাকাতই সে হউক, যত বড় বাহিনী তার থাকুক, বাড়বাড়ির মেয়েকে ছিনতাই করিয়া সে পার পাবে? পাকবাহিনীর ভয়ে পালার দিন আর নাই। স্বাধীন দেশে এবাদবাহিনীর আত্যাচার মুখ বুজে সইতে হবে? দেশে আইন-আদালত নাই, বিচার সালিশ নাই?

উপস্থিত লোকজন এবার দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়ায়। যেন আফজাল মিয়া কী করে— দেখতে চায় সবাই। আসল ছিনতাই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার অপূর্ণতা যেন স্বামী-স্ত্রীর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে পূরণ করে নিতে চায়। কিন্তু আফজাল মিয়াকে আগের মতো চুপচাপ নির্বিকার দেখে হতাশ হয়ে ওঠে অনেকে। হতাশা কাটাতে, কথায় কথায় নিজেরাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে লোকজন।

একজন নেতৃত্ব দেয়ার ঢঙে উদাত্ত আহ্বান জানায়, লাঠি-সোটা নিয়ে চলো বাহে সবাই। এই রাইতেই ঠাকুরপাড়া গিয়া এবাদ ডাকাইতের বাড়ি এ্যাটাক করি। চল সবাই হামার মুক্তাকে উদ্ধার করি আনি।

মুক্তা কি টাকা-পয়সা, নাকি সোনার জিনিস? বাড়ি তো দূরের কথা, এ জায়গার কোনো বাড়িতে মুক্তাকে লুকিয়ে রাখবে— এমন বোকা এবাদ ডাকাইত নয় বাহে।

কথা ঠিক। মুক্তাকে নিয়া ডাকাইতরা মনে হয় ঢাকা পালায় যাইবে। এতক্ষণে রাইতের মেল

www.pathagar.com

ট্রেনে উঠছে মনে হয়।

স্টেশনে যাওয়া দরকার।

চেয়ারম্যান গেইছে কোণ্ঠে ? তার বুদ্ধিটা আগে শোনা দরকার।

রুবেলের বাপ তো বিকালবেলা হইতে বাড়িতে নাই।

রুবেলরা ডাকাইতের পাছে কোন দিকে দৌড়ায় গেল বাহে ?

খালি হাতে এবাদবাহিনীর পাছে ছোটাটা বোকামি। শালাদের হাতে আইফেল-বন্দুক। ধরতে গেলে গুলি ছুড়বে।

তা হইলে পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার।

পুলিশের খায়া-দায়া কামকাজ নাই, এতো আইতে এলায় ডাকাইতের পাছে ছোটপে!

এবাদ ডাকাইতের নাম শুনলে পুলিশ থানার ভেতরে ডুলিতে গিয়া পলায় থাকে।

বেশি বেশি ঘুষ পাইলে এলায় মিছামিছি আইফেলখান ঘাড়ত নিয়া ছোটাছোটি করবে।

আরে ও বাহে ভূইয়ার বেটা, তোমরা চুপচাপ শুতি থাকলে কাম হইবে ?

লোকজনের হাকডাক উপেক্ষা করে আফজাল মিয়া তবু মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। লোকের মুখ সে বন্ধ করতে পারবে না। মুক্তা হাইজ্যাকের ঘটনা ইতোমধ্যে লোকের মুখে গান হয়ে গেছে। এবাদ ডাকাত ও মুক্তার গান কাল থেকে সজনাগাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-নারী-পুরুষ সবাই গাইবে। মেয়েকে এভাবে হারানোর শোক ও লজ্জা হাজার কথা বলেও সে আড়াল করতে পারবে না, প্রকাশও করতে পারবে না। লোকজনের সহানুভূতি প্রকাশ তার লজ্জা বাড়াবে বৈ কমাবে না।

বাইরে ডাকাত-বিরোধী উত্তেজনা হইচই যখন অনেকটা থিতিয়ে এসেছে, প্রতিবেশী নওসের প্রথম মুক্তার সন্ধান দিয়ে বাড়িতে নতুন করে বোমা ফাটানোর মতো চমক সৃষ্টি করে। খোলা ঘরের বিছানায় শুয়ে গভীর রাতে মেয়ের শুভ বিবাহের খবরটা জানতে পারে আফজাল মিয়া। মুক্তার খোঁজ নিতে নওসের একাই ছুটে গিয়েছিল ঠাকুরপাড়া। এবাদের বাড়িতে হ্যাজাক বাতির আলো, শত শত লোক। বিয়ের দাওয়াতী সবাই। মৌলবি কাজি উপস্থিত ছিল। মুক্তাকে বাড়িতে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য খবর হলো, বড়বাড়ির বড় কর্তা স্বয়ং চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে ভাইঝিকে তুলে দিয়েছে এবাদ ডাকাতের হাতে। যে এবাদ ডাকাত ছিল চেয়ারম্যানের জানের দুশমন, সে হলো এখন পেয়ারের জামাই।

নওসেরের আনা গোপন খবরের চমক হজম না হতেই তোফাজ্জল চেয়ারম্যান বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। আফজাল মিয়া ছাড়া চেয়ারম্যানকে ঘিরে দাঁড়ায় সব লোকজন। চেয়ারম্যান একই সঙ্গে লোকজনকে শাসন ও শোক প্রকাশের গরজে উচ্চস্বরে কথা বলে।

আমি না হয় বাড়িতে ছিলাম না, বাড়ির আর সবাই কি ঘাস কাটতে গেছিল ? এতগুলো লোকজন থাকতেও মেয়েটাকে এবাদ ধরে নিয়ে গেল কীভাবে ? জীবন দিয়ে হলেও ঠেকাইতে পারলে না তোমরা ? সেদিন দিনের বেলা মোটরসাইকেল নিয়ে যখন এ বাড়িতে ঢুকল, আমি শেষ করতে চাইলাম তাকে। হারামজাদা বুক আগলায় দিয়া রক্ষা করল ডাকাইতকে। কিন্তু আইজ সর্বনাশ হইল কার ? এ লজ্জা আমি রাখব কোথায় ?

ডাকাত দলের অভিযানের পুরো বর্ণনা শোনার আগেই তোফাজ্জল ভূঁইয়া নিজের অবস্থান

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করে। সন্ধ্যার পর বাজারে ছিল সে। এবাদের দলের ছেলেদের কাছে মুক্তা হাইজ্যাক হওয়ার ঘটনা শুনে এক সেকেন্ড বিলম্ব করে নি। আপন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ছুটে গিয়েছিল এবাদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে তার আক্কেল গড়ুম। মুক্তাকে উদ্ধার করবে কী, এবাদ ডাকাতের চক্রান্তের জালে নিজেই বন্দি হয়ে পড়েছিল চেয়ারম্যান। মুক্তাকে বিয়ে করার জন্য এবাদ নাকি সকালে ঘটক পাঠিয়েছিল। সেই ঘটককে চড় মেরে বাড়ি থেকে বের কের দিয়েছিল আফজাল। বাড়িতে এত কাণ্ড-কীর্তি ঘটল, অথচ আপন বড় ভাইকে ভাল-মন্দ কিছুই জানাবার প্রয়োজন বোধ করে নি তারা। মুক্তাকে এবাদ ডাকাত হাইজ্যাক করার পরও এই কলঙ্কময় বিয়ে ঠেকার অনেক চেষ্টা করেছিল তোফাজ্জল। কিন্তু যে মেয়ের দুঃখে চেয়ারম্যান কেঁদে বুক ভাসায়, সেই মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, বড়আব্বা কাঁদেন কেন ? এবাদ ডাকাত জোর করে আমাকে বাড়ি থেকে ছিনিয়ে আনে নাই। আমি নিজেই তার হাত ধরে চলে এসেছি। শুধু কি তাই ? জ্যাঠার মতামত জানার আগেই বিয়ের কাবিননামায় স্বাক্ষর করেছে মুক্তা। এরপর বংশের মান-সম্মান ধূলায় মিশিয়ে জানের দুশমন এবাদ ডাকাতকে জামাই বলার লজ্জা কোথায় রাখবে চেয়ারম্যান ?

বড় ভাসুরের বক্তব্য শুনে রোকেয়া গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে সে ঘরে ছুটে যায় স্বামীর কাছে— শুনলে তোমার শয়তান বড় ভাই কী বলছে, শুনলে ?

আফজাল মিয়া বিছানায় উঠে বসেছে। স্ত্রীর অপেক্ষাতেই যেন এতক্ষণ ছটফট করছিল সে। চাপা ও অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে জানতে চায়, ডাকাতটা ফিরে এসেছে ? কোথায় ? ঐ ডাকাতটাকে আগে খতম করতে হবে। বন্দুক তো নাই, আমার বল্লমটা দাও, তাড়াতাড়ি দাও।

স্বামীর অসংলগ্ন কথা, দৃষ্টি, উঠে দাঁড়ানো দেখে রোকেয়া কাঁদতেও ভুলে যায়। মেয়ের শোকে মানুষটা কি সত্যই পাগল হয়ে গেল ? রোকেয়া কিছু বুঝে ওঠার আগে আফজাল দরজার কাঠটা হাতে তুলে নেয়। তারপর নিজের উন্মত্ততা জাহির করার জন্য ছুটে যায় বড় ভাইয়ের আঙিনায়।

বাড়ির লোকজন ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশী অনেকে ঘিরে রেখেছিল চেয়ারম্যানকে। শত্রুকে লাঠির আওতায় না পেয়ে, কিংবা ভিড়কে শায়েস্তা করার জন্যেও হতে পারে, আফজাল মিয়ার হাতের লাঠি হঠাৎ ঘরের টিনের বেড়ায় প্রচণ্ড আঘাত করে। আল্লাহ এবং বাবা-মাকে স্মরণ করে আর্তনাদ করে ওঠে অনেকেই। অতঃপর ডাকাতকে পরাস্ত করার মতো বিক্রম দেখানোর রাস্তা খুলে যায় আফজাল মিয়ার। বড় ভাইয়ের উদ্দেশে হুঙ্কার দেয় সে, পলাইস ক্যানে রে হারামজাদা। তুই আমার মেয়েকে হাইজ্যাক করেছিস। রিলিপ কম্বল চুরি করে ধরা পড়েও শিক্ষা হয় নাই তোর ? এবাদ ডাকাতের দলে যোগ দিয়া ডাকাতি করা শুরু করেছিস— আমার মেয়েকে হাইজ্যাক করে সর্বনাশ করতে চাস আমার ? তার আগে তোকে আমি খুন করবো হারামজাদা, বের হয়ে আয় ঘর থেকে।

টিনের বেড়ায় ঝমঝম আওয়াজ বাড়িতে আবার ডাকাত পড়ার আতঙ্ক ফিরিয়ে আনে যেন। কিন্তু এবাদ বাহিনীর স্থলে আফজাল মিয়াকে আবিষ্কার করে এবং বন্দুকের বদলে তার হাতে কাঠের লাঠি দেখে ভিড়ের প্রাণে সাহস ফিরে আসতে সময় লাগে না। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তোফাজ্জল ভূঁইয়া ভিড়ের লোকদের কাছে জানতে চায়, কী কয় বাহে, হামার ভিজা বিলাই মিয়া বলে কী ? মেয়েকে নিজে এবাদ ডাকাইতের হাতে তুলে দিয়া এখন আমার ওপর পালোয়ানি দেখায়! শালা ভদ্রলোকের বাল, ডাকাইতের হাত ধরি তোর বেটি বাড়ি

www.pathagar.com

হইতে বের হয়ে যাওয়ার সময় তোর তেজ কোথায় ছিল রে হারামজাদা ?

এবাদ ডাকাত আমার মেয়েকে লুট করে নাই। চক্রান্ত করে তুই আমার মুক্তার সর্বনাশ করেছিস। তোকে ছাড়ব না আমি, নিজের হাতে তোকে শেষ করব আমি। তারপর জেল ফাঁসি যা হবার হবে।

শান্তিপ্রিয় লোকজন জাপটে ধরে আফজাল মিয়ার লাঠি যথাসময়ে কেড়ে না নিলে, খুন না হোক, তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের মাথা ফাটত নির্ঘাত। জায়গা জমির ভাগ নিয়ে দু'ভাইয়ের ঝগড়া ও মামলা-মোকদ্দমার বিষয় গ্রামবাসী জানে। বড় ভাই ও তার পরিবারের মুখ দর্শনে অরুচি বোঝাতে উঠানের মাঝখানে বাঁশের বেড়া দিয়েছে আফজাল মিয়া। হঠাৎ মুখোমুখি হলেও মুখ ফিরিয়ে নেয় দু'জনে। বহুদিন পর আজ দু'ভাইয়ের মুখোমুখি বাক্যালাপের সুযোগটিও নষ্ট করে দেয় লোকজন। আফজাল মিয়াকে ধরে তার বাড়ির সীমানার ভেতরে নিয়ে আসে।

তোর ডাকাইত জামাই তোফাজ্জল চেয়ারম্যানকে মারতে সর্বহারা দল করেছিল। এখন সে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দলে যোগ দিয়েছে। নিজের বাহিনী ছাড়াও এবাদের এখন অনেক ক্ষমতা, অনেক টাকা। আমাকে ক্ষতম করার জন্য নিজের মেয়েকে ঘুষ দিয়ে এবাদ ডাকতকে হাত করেছিস— বুঝি না আমি ? আল্লায় যেন তোর মনস্কামনা পূর্ণ করে।

সীমান্তের ওপার থেকে বড় ভাইয়ের কণ্ঠে এধরনের দোয়া বর্ষণ হতে থাকলে রোকেয়া স্বামীকে ঘরে টেনে নিয়ে যায়। কান্নার গলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সে, আজ হোক, কাল হোক, আসল সত্য প্রকাশ পাবেই। তখন কুচক্রীর বিচার অবশ্যই হবে।

মুক্তার বাবা-মা, জ্যাঠা নীরব হয়ে গেলে সাহায্যকারী গ্রামবাসীদের আর কী করার আছে ? একে একে বড়বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে থাকে তারা। সুক্তি ও অঙ্কুর ডাকাত-আতঙ্ক ও বোনের শোকে ক্লান্ত বিপর্যস্ত। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়িটি নির্জন ও স্তব্ধ হয়ে আসার পরও বিছানায় বসে থাকে রোকেয়া। আফজাল মিয়া বিছানায় লম্বা হয়ে মুখ লুকিয়েছে। ঘুমন্ত মানুষের মতো শরীর স্বাভাবিক দেখালেও সহোদর ভাইকে খতম করার প্রতিজ্ঞা যে একটুও দুর্বল হয় নি, স্বামীর কথা শুনে টের পায় রোকেয়া।

শোনো, আমি ঠিক করলাম। সকালে এবাদ ডাকাতের বাড়ি গিয়ে তাকে জামাই হিসেবে মেনে নেব। শর্ত থাকবে একটাই— আমাদের বাড়ির কুচক্রী শয়তানটাকে যেভাবেই পারুক— খুন করতে হবে। তারপর মেয়ে-জামাইকে যা কিছু দেয়ার, সবই দেব আমি।

তুমি আসলে পাগল হয়ে গেছ। আমার মুক্তা কস্মিনকালেও ঐ ডাকাতকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারেবে না। আমার মন বলছে কী জানো— মুক্তা আজ রাতেই ডাকাতটাকে খুন করে বাড়িতে ছুটে আসবে। মুক্তা ফেরা মাত্রই তাকে নিয়ে তুমি প্রথমে টাউনে চলে যাবে। গ্রামে বাস করার হাউস আমার জন্মের তরে মিটে গেছে।

মুক্তার ফেরার অপেক্ষায় কি রোকেয়া খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বসে আছে ? আরেকটি দুর্ঘটনার আশঙ্কায় চমকে ওঠে আফজাল মিয়া। বড় ভাইকে খুন করার চিন্তায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগে নি। কিন্তু মেয়ে ডাকাত জামাইকে খুন করতে পারে শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে কেন ? রোকেয়ার ধারণাকে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। বড় একরোখা মেয়ে মুক্তা। শহরে থেকে লেখাপড়া শিখছে বলে চালচলন গাঁয়ের অবলা মেয়েদের মতো নয়। গাঁয়ের ছেলেরা কথা বলতে ভয় পায় তার সঙ্গে। এবাদ ডাকাতকে প্রকাশ্যে মেরে হাত-পা ভেঙে দেয়ার জন্য

www.pathagar.com

লোকজনকে হুকুম দিতে পারে যে, আজ সকল অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঘুমন্ত ডাকাত স্বামীর বুকে ছুরি চালানোটা তার জন্য কঠিন কাজ নয়। আর সত্যই যদি এরকম কিছু ঘটে, এবাদবাহিনী তার পিছু নেবে না ?

আফজাল মিয়া স্ত্রীকে হঠাৎ ধমক দেয়, দরজাটা খোলা রেখেছ কেন ? বন্ধ করে দাও।

কী হবে আর দরজা লাগিয়ে ?

আফজাল মিয়া নিজেই বিছানা থেকে নেমে দরজা লাগায়। স্ত্রীর সঙ্গে আর একটিও কথা না বলে চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকে।

সকালে রোকেয়া চুলা জ্বালায় নি। আফজাল রোজকার মতো অফিস যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। রাতে যে নারীগণ বড়বাড়িতে আসতে পারে নি, মুক্তাবিহীন বড়বাড়ির শূন্যতা দেখতে তারা সতাসকালে আসতে শুরু করেছে। রোকেয়া রাতের দুঃস্বপ্ন স্মরণ করে বরফের মতো জমে আছে যেন। আফজাল মিয়ার অফিস যাওয়ার তাড়া অন্য দিনের চেয়েও বেশি। প্যান্ট-সার্ট পরে সাইকেলখানা নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে।

গ্রামের মধ্যে আফজাল মিয়া একমাত্র ভদ্রলোক, যে গাঁয়ের কাঁচা রাস্তা সাইকেলে ভেঙে ছয় মাইল দূরের থানা সদরে সরকারি অফিসে যাতায়াত করে। অফিস যাওয়ার আগে প্রতিদিন নিজের ক্ষেতের আবাদ তত্ত্বাবধান করার জন্য কামলাকিষাণদের প্রয়োজনীয় আদেশ নির্দেশ দেয়। কিন্তু আজ ধানকাটার কামলারা আগ বাড়িয়ে বাড়ির খুলিতে এলেও আফজাল মিয়া তাদের সঙ্গে কথা বলে না। কাজের কথা বলতে গেলেও ওরা রাতের ঘটনাটি আবার জীবন্ত করে তুলবে। তেমন সুযোগ সে কাউকে দিতে চায় না। পথে পরিচিতজন অনেকে সালাম দেয়। আফজাল আজ সালামের জবাবও ঠিকমত দেয় না। কারো দিকে না তাকিয়েও সে লোকজনের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট দেখতে পায়। কারো কথায় কান দিতে না চাইলেও লোকসমাজের কথার সুর কানে বাজে।

মুক্তাকে অপহরণ করায় এ গ্রামের মানুষ কেউ কি আফজালের দুঃখে বিশুদ্ধ চোখের জল ফেলেছে ? বিশ্বাস করে না সে। সাংঘাতিকরকম ঈর্ষাকাতর এ সমাজের লোকগুলি। আফজাল মিয়া বাড়ি থেকে চাকরি করে, মাসে মাসে বেতন পেয়ে, অন্যদের চেয়ে বেশি বেশি ফসল ঘরে তোলে, বাড়িতে নতুন দালান ওঠায়— এক কথায় আফজাল মিয়ার উন্নতি দেখলে চোখ টাটায় সবার। গ্রামসমাজে বাস করেও আফজাল কারো সাতেপাঁচে থাকে না। কারো ক্ষতির চিন্তা করে না। পরিবার নিয়ে ভদ্রলোকের মতো সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে চায়। তাও যেন সহ্য করতে প্রস্তুত নয় কেউ। আপন ভাই প্রধান শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীর আর দোষ কী ? ভাইদের ছেলেমেয়েদের তুলনায় আফজালের মেয়ে লেখাপড়ায় ভাল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে, দেখতে সুন্দর, শহরে হোস্টেলে থেকে অনার্স পড়ে, পাশ করার পর আফজাল মিয়া ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার জামাই পাবে— এটাও যেন স্বজনদের চোখে আফজালের বড় অপরাধ। ম্যাট্রিক পাশ করার আগে থেকেই মুক্তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছিল। কিন্তু মুক্তার এম,এ পাশ করার জেদ এবং মেয়েকে নিজেরে চেয়েও উচ্চশিক্ষিত মানুষ করার জন্য আফজালের স্বপ্ন ভালো চোখে দেখে নি কেউ। আড়ালে মুক্তার স্বভাবচরিত্র নিয়ে অনেক বাজে কথা হতো। সামনাসামনি সুযোগ পেলে বাঁকা মন্তব্য ছুড়ত অনেকে। কাজেই এবাদ ডাকাত মুক্তাকে ঘর

www.pathagar.com

থেকে তুলে নিয়ে বিবাহ করে আফজাল মিয়াকে উচিত শিক্ষা দিছে বাহে— আনন্দিত লোকজনের এরকম মন্তব্য আফজাল স্পষ্ট শুনতে পায়।

থানায় পৌঁছে আফজাল সরাসরি ওসি সাহেবকে খোঁজে। কনস্টেবলটি নিজেই দারোগার মতো ব্যক্তিত্ব নিয়ে জানতে চায়, কী ব্যাপার ? অসি সাহেবকে খোঁজেন কেন ?

সেটা ওনাকেই বলতে হবে। কোথায় উনি ?

স্যারকে তো এখন পাবেন না। সেকেন্ড স্যার আছেন। কোনো কেস আছে নাকি— চুরি ডাকাতি না অন্য কিছু ?

আফজাল মিয়া আগে কখনও থানার ভেতরে ঢোকে নি। তার বড় ভাইকে নিশ্চয় দারোগা পুলিশ সবাই চেনে। কিন্তু সামান্য কনস্টেবলটিও তাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুচ্ছ এক কনস্টেবল ডীল করতে চায় দেখে, সেও নিজের গুরুত্ব বাড়াবার চেষ্টা করে, আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টে সরকারি চাকরি করি। সেকেন্ড অফিসারকে একটু ডাকেন।

আফজাল মিয়াকে অফিসে বসতে বলে ডিউটিরত কনস্টেবলটি বেরিয়ে যায় কোথাও। মিনিট পাঁচেক পর সেকেন্ড অফিসার পান চিবুতে চিবুতে ঝুমে আসে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

ভাইয়ের বাড়ি কোথায় ? আছেন কোথায় ?

চেয়ারে বসে সেকেন্ড অফিসার বেশ ভদ্র ব্যবহার করে। আফজাল মিয়া তার পরিচয় সম্পূর্ণ করার সুযোগ পায় না। সজনা গ্রামের নাম শুনেই ছোট দারোগা আগ বাড়িয়ে ঘটনাটি জানতে চায়।

আপনাদের গ্রামের তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের মেয়েকে নাকি এবাদ ডাকাত বাড়ি থেকে কিডন্যাপ করে বিয়ে করল ? ব্যাপারটা কী বলেন তো। চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের সঙ্গে লাভ ছিল নাকি এবাদের ?

আমি সেই বিষয়ে কেস দিতে এসেছি। মেয়ে আমার। গতরাতে এবাদ তার বাহিনী নিয়ে আমার বাড়ি ডাকাতি করতে আসে, অস্ত্রের মুখে মুক্তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারপর কী হয়েছে আমি ঠিক জানি না।

ও তাহলে তোফাজ্জাল চেয়ারম্যানের মেয়ে নয় ?

বললাম তো আমার মেয়ে। তোফাজ্জল আমার বড় ভাই, এই ঘটনায় সেও এবাদ ডাকাতের সঙ্গে ছিল। তাকেও আমি আসামী করতে চাই।

ওহ। তাহলে আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি— ঘটনাটা সত্য। তোফাজ্জল চেয়ারম্যান নিজে উপস্থিত থেকে মেয়ে মানে ভাতিজিকে বিয়ে দিয়ে এবাদকে জামাই করেছে। বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছে। আসল ব্যাপারটা কী বলেন তো ভাই।

এটা একটা গভীর কনসপিরেসি। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার বড় ভাই তোফাজ্জল ভূঁইয়াও জড়িত। আমি তাকেও আসামী করব।

আপনার মেয়ের বয়স কত ?

কত আর উনিশ-বিশ হবে। অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী, আজ সকালে তার টাউনে হোস্টেলে যাওয়ার কথা। মেধাবী ছাত্র, সামনে তার পরীক্ষা।

www.pathagar.com

সেকেন্ড অফিসারের সহানুভূতি আদায়ের জন্যই হয়তো, নিজের অজান্তে আফজাল মিয়ার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। সেকেন্ড অফিসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বটে, কিন্তু কথায় মজা পাওয়ার সুর।

এই জন্যেই বলে, লাভ ইজ ব্লাইন্ড। এবাদও বোধহয় আপনার মেয়ের প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল। আপনার মেয়েও হয়তো তার নামডাক অথবা মে বি এবাদের চেহারা দেখে মজে গিয়েছিল। আফটার অল টেরর হলেও এবাদের চেহারা তো খারাপ না। যে-কোনো মেয়ে পটতেই পারে।

কী যা তা বলছেন! আমার মেয়ে কোন দুঃখে একটা দাগি আসামিকে ভালবাসতে যাবে। আপনি কেস এন্ট্রি করুন, তদন্ত করলে আসল সত্য বেরিয়ে যাবে। টাকা যা লাগে আমি খরচ করব।

মেয়ের বাবা যখন হয়েছি, আপনার মনের অবস্থাটা বুঝি রে ভাই। এবাদ যখন সর্বহারা গ্রুপ করত, তার নামে একটা কেন, একশোটা কেস নিতেও আমাদের আপত্তি থাকত না। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার মেয়ে নাবালিকা হলেও এবাদের বিরুদ্ধে আমরা কেস নিতে পারতাম না।

কেন ?

আপনি শিক্ষিত মানুষ। এবাদের বর্তমান পজিশন নিশ্চয় জানেন। সবচেয়ে বড় কথা, আপনার মেয়েকে বিবাহ করে এবাদ তো বেআইনি কাজ করে নাই। তাছাড়া এবাদ আমাদেরকেও তার বিয়ের দাওয়াত দিয়েছিল। দেখি যাব একদিন তার নতুন বউকে দেখতে।

আপনারাও যদি ক্রিমিনালদের পক্ষে কথা বলেন, আমরা যাব কোথায় ?

বসেন, বসেন। আগে চা খান ভাই।

কিন্তু আফজাল মিয়া আর বসে না। সাইকেল নিয়ে থানা চত্বর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে।

দুপুরের দিকে বাড়িতে ফিরে ঘরে-বাইরে লোকজনের ভিড় দেখে আফজাল মিয়া চমকে ওঠে। মুক্তা কি তবে ফিরে এসেছে ? ফেরার পথে এই চিন্তাটাই মাথায় সারাক্ষণ ঘুরপাক খেয়েছে। যত চক্রান্ত করে মুক্তাকে সে বিয়ে করুক, ঠাকুরপাড়ার এবাদ ডাকাত মুক্তার মতো মেয়েকে তার বাড়িতে আটকে রাখতে পারবে না। সুযোগ পেলেই মুক্তা বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসবে। নিরাপরাধ মেয়ের কলঙ্ক মুহূর্তেই ক্ষমা করে দেবে আফজাল মিয়া। কিন্তু এই গ্রামসমাজকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না সে। আর এ কারণে বিষয়-সম্পত্তি বেচে শহরে স্থায়ী হবে আফজাল। জন্মভূমি গ্রামের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখবে না। সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার উত্তেজনায় অবাঞ্ছিত ভিড়কে উপেক্ষা করে, সরাসরি ঘরে ঢোকে আফজাল মিয়া।

ঘরের মধ্যে আফজাল মিয়ার বৃদ্ধ শ্বশুর শরফ হাজি, গুড়াতি ঘটক, বড় সম্বন্ধী ও ভাইপো রুবেল বসে ছিল। আফজাল মিয়াকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু আফজাল হাজি শ্বশুরকে সালাম দেয়ার বদলে চারদিক চোখ ঘুরিয়ে জানতে চায়, মুক্তা কই ? আমার মুক্তা কোথায় ?

সবাই আফজাল মিয়ার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। রোকেয়া কণ্ঠে কান্না ও ক্ষোভ

www.pathagar.com

মিশিয়ে জবাব দেয়, তোমার মুক্তা ডাকাইতের বউ সেজে ভালই আছে। হনুফার মা সালামের দাদিরা দেখতে গেছিল। বলে দিয়েছে, আব্বা যেন আমার জন্য চিন্তা না করে। আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। আর এবাদের মা বলেছে...

চোপ। এইসব ছোটলোকদের কথা আমার কাছে কখনও উচ্চারণ করবি না।

আফজাল মিয়ার আকস্মিক গর্জনে রোকেয়া বোবা বনে যায়। তার বৃদ্ধ শ্বশুর কম্পিত কণ্ঠে বলে, বসো বাবা। খবরটা শোনার পর হইতে রাইতে হামার কোরো চোখে ঘুম ছিল না। সকাল হইতে তোমার জন্যে বসে আছি বাবাজি।

গুড়াতি ঘটক শ্বশুরের চেয়েও বেশি দরদ দেখায়, দমান্দ বাহে, মুক্তার দুঃখে মোরও মাথার বেরেন আউট হইছে। কাল আইতে ছোটাছুটি করিয়া, অন্তত কয়েক শো মানুষ জড়ো করিছনু মুই। সবাই মিলিয়া এবাদ ডাকাইতের বাড়ি ঘেরাও করলে এবাদের চৌদ্দ গুষ্ঠী খতম হইত। কিন্তু তোমার শ্বশুর রাজি হইল না।

শোনেন, আমার মেয়ে মুক্তাকে নিয়ে যদি আর একটা কথা বলেন, সেদিনের মতো অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেব। আমার মেয়ে মুক্তা মরে গেছে। আপনারা এসেছেন ভাল কথা। খাওয়া-দাওয়া করে চলে যান।

আফজাল মিয়া পাশের ঘরে ঢুকে একা হয়। এ ঘরে মুক্তা ভাইবোনকে নিয়ে ঘুমাত। মেয়ের বিছানায় শুয়ে চাদর-বালিশে মৃত মেয়ের ঘ্রাণ পেয়েই যেন অস্বস্তিতে গুলিয়ে ওঠে আফজাল মিয়ার দেহমন। এ সময় চোখ পড়ে দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে। হাসিমুখে মুক্তা বাবাকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। ইন্টারমেডিয়েটের রেজাল্ট পাওয়ার পরে তোলা ছবি। আফজালই শহর থেকে বেঁধে এনেছিল। ছবিটা পেড়ে মেঝেতে আছড় দেয় সে। ঝনঝন শব্দের সঙ্গে ভাঙা কাঁচের টুকরা ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়।

দুঃস্বপ্নের মতো বিয়ের রাতটা কাটতে না কাটতেই ভোরবেলা মুক্তার পরণে নববধূর সাজ-পোশাক দেখে বাড়ির সবাই অবাক হয়েছে। বাড়ি থেকে ছিনিয়ে আনার সময় তার পরনে ছিল সাধারণ সালোয়ার-কামিজ ও একটি কালো ওড়না। এবাদের ঘরে বন্দি হয়ে এই পোশাকে পাথুরে মূর্তির মতো গম্ভীর হয়ে বসে ছিল মুক্তা। কনের অস্বাভাবিক চেহারা দেখে বিয়ে-বাড়ির লোকজন ভয় পেয়েছিল নিঃসন্দেহে। সেই মেয়ে সাতসকালে নিজেই বিয়ের শাড়ি-ব্লাউজ পরে ঝলমলে নতুন বউ সেজেছে দেখলে কে না অবাক হবে? বাইরে থেকে মুক্তাকে দেখে খুনী ডাকাতের বউ সাজার রহস্য এবং মানসিক যন্ত্রণা কেউ তেমন আঁচ করতে পারে না। নতমুখ দেখে নতুন বউয়ের লজ্জাটাকে বড় সত্যি ভাবছে হয়তো সবাই।

পেয়ারি বিয়ের রাতেই মুক্তাকে সাজাবার জন্যে অনেক জোরজুলুম করেছিল। মুক্তার কথা শুনে ভয়ে পলিয়ে গিয়েছিল তার শুভাকাঙ্ক্ষী জ্যাঠা। কিন্তু মেয়েটা নতুন ভাবিকে একান্তে পেয়ে মশকরার গলায় কথা বলেছিল, ভাবি, তোমার কথা শুনিয়া কেন বা আমারই বুক

www.pathagar.com

কেমন কেমন করে। এমনি কি আর ভাইজান মাকে এমন ডাকাতিনী বউ ঘরে তোলার কথা বলছিল। ভাইজানকে এবার তোমরাই সোজা ঘাটায় ওঠাইতে পারবেন।

তোমার ভাইজান কোথায় ?

আছে। মানুষজন বিদায় হইলে তোমরা ঘরে এলায় সারা রাইতে যুদ্ধ করেন। এখন ওঠো তো, তোমাকে সাজায় দেই। সুটকেস ভরায় তোমার জন্য টাউন থাকি কত কিছু কিনে আনি রাখছে।

পেয়ারি একটা লেদার সুটকেস এনে বিছানায় রেখেছিল। সুটকেসের ঢাকনা খুলে মুক্তাকে বিয়ের শাড়ি, ব্লাউজ, স্নো-পাউডার, ক্রীম ইত্যাদি দেখিয়েছে আর খুশিতে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

পছন্দ হয় নাই ভাবি ?

না। আমি এসব পরব না। তুমি এগুলি নিয়ে যাও।

ও মা! আমাকে সব দিলে ভাইজান তো আমাকেই খুন করে ফেলবে। তুমি সালোয়ার-কামিজ খুলে বিয়ের শাড়ি পরো। বিয়া তো হয়েই গেছে। এখন আর আপত্তি করি লাভ আছে ? ওঠো।

না। তুমি বেরিয়ে যাও আমার সামন থেকে।

নতুন বউয়ের ধমক পেয়ারি আর সহ্য করতে পারে নি। সাজ-পোশাকের ডালা বিছানায় খোলা রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এরপর মুক্তা নির্জন ঘরে একা বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। এ সময়টায় ডাকাতের বউ হওয়ার অবিশ্বাস্য ঘটনাটি বিক্ষিপ্তভাবে মনে জেগেছিল। কিন্তু বিক্ষুব্ধ মন বিদ্রোহে জ্বলে উঠতে পারে নি। পাথরের মতো বিছানায় নিশ্চল বসে ছিল সে। আশু কর্তব্য স্থির করতে পারে নি। এ বাড়িতে ঢোকার মুখে লোকজন দেখে চকিতে মনে হয়েছিল, তাকে উদ্ধার করার জন্য বাবা-জ্যাঠাদের নেতৃত্বে সজনা গাঁয়ের হাজার হাজার মানুষ হয়তো ঠাকুরপাড়ায় ছুটে আসবে। কিন্তু জ্যাঠাকে দেখে মুহূর্তেই বুঝে গেছে মুক্তা, তাকে উদ্ধার করার জন্য কেউ আর এগিয়ে আসবে না। এবাদের মায়ের কথা শুনে পালাবার কথা ভেবেছিল সে। কিন্তু অপমান ও কলঙ্কের ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে পালাতেও লজ্জা হয়েছে মুক্তার। বুকের ভেতরে প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে পাথুরে মূর্তির মতো বসে ছিল চুপচাপ। কাজের অছিলায় পেয়ারি বার কয়েক ঘরে এসেছে, আড়চোখে নতুন ভাবির দিকে তাকিয়েছে, কিন্তু মুক্তা একবারও ফিরে তাকায় নি। গর্ভবতী মেয়েটার কিশোরীসুলভ চলাফেরা দেখে গা ঘিণঘিণ করেছিল তার। খাওয়ার অনুরোধ জানালে মুক্তা শুধু মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

অবশেষে বিয়েবাড়ির ধুম-ধাড়াক্কা ভেঙে যাওয়ারও অনেক পরে এবাদ ঘরে এসেছে। বাইরে তখন গভীর রাতের স্তব্ধতা। ঘরে ঢুকেই এবাদ দরজার খিল লাগানোর পর আলগা একটা কাঠ বন্ধ দরজায় চেপে দিয়েছে। ডাকাতেরও বুঝি বাড়িতে ডাকাত পড়ার ভয় কিংবা সতর্কতা কাজ করে। ডাকাতি পোশাক বদলে এবাদ তখন একটা সাদা পাঞ্জাবি পরেছে। বিছানায় মুক্তার পাশে বসেই সে সিগারেট জ্বালিয়েছিল। বিড়ি সিগরেটের গন্ধ এমনিতেই মুক্তার অসহ্য লাগে। এবাদের সিগারেটের ধোঁয়া ভেতরের পুঞ্জিভূত ঘৃণার আবেগে আগুন জ্বালিয়ে দিলে, মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মুক্তা, ডাকাতটাকে রাতেই খুন করবে; না পারলে

www.pathagar.com

অবশ্যই আত্মহত্যা করবে সে।

এবাদ পাশে বসেও মুক্তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে নি। মুক্তার জন্য কেনা খোলা সুটকেসের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথা বলেছিল এমন নরম সুরে, যেন শুধু দয়া-মায়া-প্রেম-অভিমানে পূর্ণ তার ডাকাত হৃদয়, নিষ্ঠুরতা কাকে বলে সে জানেও না।

যাকে এত ঘৃণা কর, তার জিনিস যে তোমার পছন্দ হবে না— আমি জানতাম। ঠিক আছে, এগুলি তোমাকে পরতে হবে না। কোনো ফকির-মিসকিনকে দান করে দেবো।

এবাদ সুটকেসটা বন্ধ করে বিছানা থেকে সরিয়ে রেখেছিল। আবার সে বিছানায় পাশে বসার আগে উত্তেজিত মুক্তা কথা বলেছিল প্রথম, মরার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দেবে এবাদ ডাকাত?

এবাদ নীরবে নববধূকে তাকিয়ে দেখেছে কয়েক মুহূর্ত। আরো বেশি কোমল সুরে জবাব দিয়েছে, অনেক সত্যি কথা বলার জন্যেই তো তোমাকে এভাবে ঘরে তুলেছি। বলো কী তোমার প্রশ্ন?

এ বিয়েতে আমার বড় আব্বা এলো কীভাবে?

বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তোমার আব্বার কাছে আমি ঘটক পাঠিয়েছিলাম। তার আগে তোমার বড় আব্বার কাছে আমি নিজ মুখে বলেছিলাম তোমার কথা। তার মত নিয়েই, তার কথা মতোই সব কিছু ঘটেছে।

ঠিক আছে। আর বলতে হবে না। এখন বলো, আমাদের বাড়ি ডাকাতি করতে গিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকেছিল কে?

এবাদবাহিনীর লীডার এবাদ নিজে। খাটের তলা থেকে সে-ই তোমাকে টেনে বের করেছিল।

আমার অপরাধ কী? বড় আব্বার সঙ্গে তোমার শত্রুতা। কিন্তু আমার নীরিহ বাবা, আমার মা কী ক্ষতি করেছে তোমার? কেন বিনা দোষে তাদেরকে এই আঘাত দিলে? আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিলে কেন?

ডাকাত-জীবনের একটি মধুর স্মৃতির প্রসঙ্গ তুলে মুক্তা হঠাৎ এমন বিস্ফোরণ ঘটাবে, এবাদ ভাবতে পারে নি সম্ভবত। বাসর ঘরে হঠাৎ নতুন বউয়ের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে, রাগে ঘৃণায় মুক্তাকে কাঁপতে দেখে এবাদ বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। লোকজন ছুটে আসার আশঙ্কায় আস্তে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছিল মুক্তাকে। কিন্তু বউকে শাসন করার জন্য পাল্টা রাগ বা হিংস্রতার আভাস মাত্র ছিল না ডাকাতটার চেহারায়। অপরাধের প্রাপ্য শাস্তি বরণ করে নেয়ার জন্যেই যেন মুক্তার দিকে সে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ।

জবাব দাও এবাদ ডাকাইত। হয় আজ আমি মরব, না হলে তুমি মরবে আমার হাতে।

ডাকাতটাকে মারার মতো জিঘাংসা ও সাহস কমতে শুরু করেছিল বলে কি মুক্তা নিজে মরার কথা আগে ঘোষণা করেছিল? তার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা শুনে এবাদ ম্লান হেসে ঠাণ্ডা কণ্ঠে জবাব দিয়েছে, ঠিক আছে। তোমার হাতে, তোমার কারণে মরার জন্যই তো তোমাকে এভাবে ঘরে তুলেছি মুক্তা। তার আগে কেন এ কাজ করলাম— শুনবে না? আসল অপরাধী আমার ভালবাসা মুক্তা। তোমার প্রেমে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। শত্রুকে খতম করতে গিয়ে সেই যে তোমাকে চুমু খেতে চাইলাম, তুমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললে— সেই স্মৃতি আমি জেলে

www.pathagar.com

বসেও ভুলতে পারি নি। জেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দেখা হলো তোমার সাথে। তারপর থেকে মনে যে কী ঝড় শুরু হয়েছে— তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমাকে আবার দেখার লোভে মিষ্টি নিয়ে গেলাম বড়বাড়িতে। তুমি লোকজন দিয়ে আমাকে মারতে চাইলে, হাত-পা ভেঙে দিতে বললে। সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বাঁচলে তোমাকে নিয়ে বাঁচবো। মরতে হয়তো তোমার হাতেই মরবো। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি। এখন তুমি যে শাস্তি দাও আমি মাথা পেতে নেবো।

এবাদের দিকে তাকিয়ে, তার কথা শুনতে শুনতে মুক্তার মনে মুহূর্তের জন্য প্রশ্ন জেগেছিল, একটি খুনী ডাকাত কি এত সুন্দর প্রেমের অভিনয় করতে পারে? কিন্তু কোনো অভিনয়ে ভোলার মতো মেয়ে না মুক্তা।

এবাদ তার কথার সত্যতা বোঝাতে বিছনার তলা থেকে একখানা ধারলো ছুরি ও কোমর থেকে একটি কালো পিস্তল বের করে বলেছিল, এই নাও মুক্তা। তুমি আমাকে গুলি করে মারতে পারো, জবাই করেও মারতে পারো। মারার পর পুলিশ যাতে তোমাকে ধরতে না পারে, সে জন্যে একটা কাগজে আমি আত্মহত্যা করার কথা লিখে দিচ্ছি। আরো লিখে দেব, এবাদ ডাকাতের জীবনের এই পরিণতির জন্য মুক্তা কোনোভাবেই দায়ী নয়।

পিস্তল ছোরা দেখে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল মুক্তা। তারপর পরাস্ত যোদ্ধার মতো হুহু কান্নায় ভেঙে পড়েছে বিছানায়। তখন আর বিজয়ী এবাদ ডাকাতকে রুখবে কে?

মুক্তার বুকভাঙা কান্না, প্রবল ঘৃণা, শরীরী প্রতিরোধ, কাতর মিনতিসহ সম্পূর্ণ মুক্তাকে বাঁধভাঙা ভালবাসার বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল এবাদ। আবেগে গদগদ কণ্ঠে ভালবাসার কত না কথা বলেছে ডাকাতটা! ...সেই ছোটবেলায় ভালবাসার কথা শুনে যেভাবে মাথা দুলিয়েছিলে, তেমনি আজো আমাকে স্বামী হিসেবে মেনে নাও মুক্তা। তোমার ভালবাসা পেলে আমি ভাল হয়ে যাব, সারাজীবন তোমায় মাথায় তুলে রাখব, তুমি যা বলবে তাই শুনব ...এইসব প্রাপ্তির বিনিময়ে স্বামীর কাছে পরাজিত মুক্তার প্রথম চাওয়া ছিল, 'আমাকে তুমি মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে।' এবাদ তখন একটু একটু করে, কোমল ভালবাসা আর প্রবল শারীরিক শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ মেরে ফেলেছিল মুক্তাকে। বিবস্ত্র মুক্তার বিধ্বস্ত শরীরে বুঝি তখন চেতনাও ছিল না।

ঘুমন্ত এবাদের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে এক সময় হুঁশ ফিরে পেয়েছে মুক্তা। তখন টিনের চালের ফুটো এবং বাঁশের বেড়ার অসংখ্য ছিদ্রপথে ভোরের আলো বাসরশয্যায় উঁকি দিয়েছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঘুমন্ত এবাদ ডাকাতের চেহারা। কিন্তু স্বামীর দিকে তাকাবার আগে, নিজের শরীরের পরিবর্তন লক্ষ করে লজ্জায় চমকে উঠেছিল সে। অন্ধকারে নববধূর বস্ত্র হরণের পর পরনের সালোয়ার-কামিজ ফিরে পায় নি মুক্তা। এবাদ সুটকেস খুলে নতুন শাড়ি দিয়েছিল একখানা। সেই নতুন শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সন্তর্পনে বিছানা থেকে নেমেছে মুক্তা। পুরনো পোশাক খুঁজে পেয়েছে চৌকির নিচে। সেগুলি ছিড়ে ফেড়ে ব্যবহারের অযোগ্য করে রেখেছে ডাকাতটা।

পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে আপন অস্তিত্ব ছিন্নভিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে মুক্তা ঘুমন্ত এবাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ। প্রথমে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ হিংস্র সাপের মতো ফণা তুলেছিল। রাতের সেই ছুরিটা পেলে ঘুমন্ত ডাকাতের বুকে মুহূর্তেই বসিয়ে দিতে পারে সে। কিংবা দরজার কাঠটা দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করতে পারে মুক্তা। কিন্তু তারপর?

www.pathagar.com

দরজা খুলে মুক্তা এক ছুটে বাড়িতে যেতে পারবে। কিন্তু লুণ্ঠিত শরীর ও ডাকাতের বউ হবার ঘটনা অস্বীকার করে মুক্তা কি আবার আগের মুক্তা হতে পারবে? বাবা-মা ছোটবেলার মতো বুকে টেনে নেবে তাকে? রাতের ঘটনা বাসি হতে না হতেই নতুন করে মুক্তার কলঙ্ক তোলপাড় করবে গ্রাম-সমাজকে। তখন কোথায় মুখ লুকাবে সে? এসব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে না পাওয়ায়, কিংবা হতে পারে এবাদের পৌরুষদীপ্ত শরীর খানিকটা মোহ-মুগ্ধতা জাগাবার কারণে, কিংবা হতে পারে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দেয়ার প্রয়োজনেও, মুক্তার ভেতরে লেলিহান প্রতিশোধ স্পৃহা ক্রমে থিতিয়ে এসেছে। ডাকাত স্বামীকে ভাল করে চেনার জন্যেই যেনবা অপলক তাকিয়ে থেকেছে।

চিৎ-শয়নে এবাদের শরীরে তখন বস্ত্র বলতে পরনের লুঙ্গিটা, তাও বিস্রস্ত। ভোরের আলোয় মুখখানা এমন শান্ত ও সুন্দর যে— কে বলবে এই মানুষটি গতরাতে অমন নৃশংশ কাণ্ড ঘটিয়েছে। রাস্তায় গেঞ্জি গায়ে এবাদকে একবার দেখেও মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হয়েছিল সে। সেই গোপন মুগ্ধতাবোধ নগ্ন হয়ে পড়ার লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অবশেষে। কিন্তু ভোর হয়ে এলেও একা বাইরে বেরুনোর সাহস হয় নি মুক্তার। কারণ এবাদের বাড়ি ও বাইরের পরিবেশ অচেনা। ডাকাত স্বামীকে ডাকতে গিয়েও বেশ দ্বিধা জেগেছিল। তার শরীরে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিয়েছে, যেন ছুঁয়ে দিলেই ডাকাতটাকে স্বামীর স্বীকৃতি দেয়া হবে। কিন্তু গয়ে হাত দিয়ে ধাক্কা না মারা পর্যন্ত ঘুম ভাঙে নি এবাদের। বিছানায় ধড়ফড় উঠে বসে বিহ্বল দৃষ্টিতে নতুন বউয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

আমি বাইরে যাব। বাথরুম কোথায়?

এবাদ বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলেছে। রাতের মতো অপরাধী কণ্ঠে ফিসফাস স্বরে কথা বলেছে, তোমাদের বাড়ির মতো এ বাড়িতে ল্যাট্রিন গোসলখানা নাই। তোমার জন্য সব করে দেব মুক্তা। এখন কুয়াতলার পেছন দিকের ঐ বাঁশঝাড়টায় যাও। আমিও বের হচ্ছি চলো।

ভোরের আবছা আলোয় নির্জন বাঁশঝাড় থেকে ফিরে এলে এবাদ নিজে কুয়া থেকে বড় বাল্টিতে পানি তুলে দিয়েছে। কানে কানে পরামর্শ দিয়েছে, কেউ জাগার আগে গোসলটা সেরে নাও। নইলে পরে শরম পাবে। এরপর নতুন বউয়ের গোসলের জন্য এবাদ কুয়াতলায় নতুন লাক্স সাবান, একটি নতুন তোয়ালে, পেটিকোট, ব্লাউজ ও বিয়ের শাড়িখানা রেখে গেছে।

গোসলের পর বিয়ের দামী শাড়িখানা না পরে উপায় ছিল না মুক্তার। এবাদ তাকে নতুন বউয়ের পোশাকে সাজতে বাধ্য করার জন্যেই হয়তো পরনের পোশাক খুলে নিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ডাকাতের বউ সেজে একদিকে নিজের সর্বস্ব হারানোর বেদনা, অন্যদিকে এবাদের দুঃসাহসী চতুর চক্রান্ত অনুভব করা ছাড়া এখন কী আর করার আছে মুক্তার?

সকাল থেকে বিছানায় নিষ্প্রাণ প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে বসে আছে মুক্তা। প্রথমে ননদ পেয়ারি নতুন ভাবিকে দেখে দৃষ্টি ফেরাতে পারে নি। তার মুগ্ধ চোখের প্রচ্ছন্ন ঠাট্টা দুষ্টুমিকে মুক্তা বিন্দুমাত্র আমল না দেয়ায় অভিমানী কণ্ঠে বলেছিল সে, রাতে আমার হাতে সাজলে কী দোষ হইত। ডাকাইত ভাই বুঝি নিজের হাতে এসব পেন্দায় দিছে ভাবি?

মুক্তার বিষণ্ন গম্ভীর চেহারায় পেয়ারি বাসর রাতের মধুর অভিজ্ঞতার ছাপ ছাড়া আর কিছুই যেন দেখতে পায় না। বয়সে মুক্তার চেয়ে কিছু ছোট হলেও অভিজ্ঞতায় এত ভরপুর যে, যেন চেপে রাখতেও আর পারে না। স্বামী-সহবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে অল্পবয়সে মা হতে

www.pathagar.com

যাচ্ছে পেয়ারি। তাতেও যেন তার আনন্দ। মুক্তার অস্বাভাবিক বিবাহ নামক দুর্ঘটনার স্মৃতি-যন্ত্রণা ভুলে পেয়ারি শুধু মুক্তার নববধূ বেশ দেখে, মুক্তার চেহারায় ফুলশয্যার মধুর অভিজ্ঞতার ছাপ খোঁজে।

সকালবেলা ফরজ গোসলের কথাটা ঠিকই মনে হইছে। কিন্তু বিছানার চাদরখানা ধুইতে হবে না ? এ মা ছি ছি ! ভাবি ওঠ, চাদরখানা আমি ধুয়ে দেই।

মুক্তাকে বিছানা থেকে সরিয়ে দিয়ে পেয়ারি চাদরখানা তুলে কুয়াতলায় নিয়ে গেছে। অন্য একটি চাদর এনে পেতে দিয়েছে বিছানায়।

ভাবি তোমাকে যা সোন্দর লাগতেছে! এমনিই কি আর ভাইজান পাগল হইছে ? হায় হায়! কানে সোনার দুল দুইটা পরো নাই ক্যানে ? আমি এখনই পরায় দেই।

পেয়ারি স্যুটকেস খুলে সোনার দুল বের করে। ভাবির কানে পরানোর আগে, নিজের কানের লতিতে ঝুলিয়ে ভাবিকে দেখায়, ডিজাইনটা একদম নতুন। তোমাকে খুব মানাবে ভাবি।

আমাকে দিতে হবে না। ও দুটো আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। তুমি নাও।

মাথা খারাপ! তোমার জন্যে শখ করিয়া ভাইজান কিনেছে, তাই আমি নেবো ? তার চাইতে তোমার ইমিটেশনের দুল জোড়া আমাকে দাও ভাবি।

নতুন ভাবির ঔদার্য দেখে পেয়ারি বেশ আহ্লাদি হয়ে উঠেছিল। মুক্তাকে জড়িয়ে ধরে তার কানে দুল পরিয়েছে। গতরাতে কিশোরী ননদের স্ফীত উদর দেখে, কিংবা গর্ভবতী ননদের কিশোরীসুলভ চালচলন দেখে গা ঘিণ ঘিণ করেছিল মুক্তার। কিন্তু সকালবেলা মেয়েটার প্রতি বিরক্তি এবং কান টানাটানিতে ভীষণ অস্বস্তিবোধ জাগলেও মুখ ফিরিয়ে নেয় নি মুক্তা। অন্যের প্রাপ্য রাগ ঘৃণা নির্দোষ মেয়েটার ওপর ঝেড়ে কী লাভ ? তবু কণ্ঠে অবদমিত হিংসা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ মুক্তা জানতে চায়, তোমার ভাইজান কোথায় গেল ?

বাপ রে বাপ! সারা রাইত এক সাথে থাকিয়াও চক্ষের আড়াল হইতেই ছটফটানি শুরু হইছে।

ছি! তুমি সবসময় বাজে কথা বলো কেন ? ডাকো তোমার ভাইজানকে। তার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।

কিন্তু ভাইজান কি দিনে বাড়িতে থাকে ? বিশ্ব দেওয়ানী। এলা হইতে তাকে আঁচলে বাঁধি রাখেন। দেখি আমি কোথায় গেল ডাকাইতের সর্দারটা।

মুক্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ডাকাত স্বামীকে কেন খুঁজছে, কী জরুরি কথা বলবে— মুক্তা জানে না। রাতে প্রতিশোধ গ্রহণের যে হিংস্র আবেগ বুকে ধক ধক করেছিল, সেই আবেগটা সে ফিরে পায়। রাতে সুযোগ পেয়েও শত্রুকে বধ করতে পারে নি। দিনে বউ সাজতে বাধ্য করার জন্যে কী প্রতিশোধ নেবে সে ? মুক্তা ভেবে পায় না। তবু এবাদের আসার অপেক্ষায় ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে দেহ-মন।

বাইরের উঠানে এবাদের মায়ের উপস্থিতি টের পায় মুক্তা। চুলা জ্বালিয়েছে। রান্না করছে হয়তো। রাতে ডাকাত ছেলের জবরদস্তিমূলক বিয়ের প্রতিবাদ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। নির্বিঘ্নে শুভ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ফিরে এসেছে আবার। ভয় কেটে গেছে সম্ভবত। কিন্তু কোবাদ কোথায় ?

গরম ক্ষীরের থাল নিয়ে এবাদের মা ঘরে আসে।

www.pathagar.com

এ বাড়িতে আসার পর হইতে এলাও দানাপানি কিছু মুখে দিস নাই মা। তোর জন্যে সকালে ক্ষীর রাঁধনু, খা মা।

রাতে মহিলা মুক্তাকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। এখন এসেছে যেন মুক্তাকে নতুন করে বরণ করে নেয়ার জন্য। কিন্তু মুক্তা কি পারবে ডাকাতকে স্বামী ও এই মহিলাটিকে শাশুড়ি হিসেবে মেনে নিতে? মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে সে।

এবাদের মা নববধূর মাথায় হাত বুলিয়ে একইসঙ্গে আদর ও সান্ত্বনা দেয়। রাতে ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে এ গাঁয়ের মান্যগণ্য অনেকের কাছে, এমনকি সুরেশ বাবুর কাছেও গিয়েছিল সে। সবাই বলেছে বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপরও এবাদের মায়ের মন মানে নি। কারণ মুক্তা বড়লোকের মেয়ে, এবাদের চেয়েও বেশি পাস দিয়েছে, শরীরে রূপ আছে, অন্যদিকে তার ছেলে জেলখাটা আসামি ছাড়া তো অন্য কিছু নয়। একবার বিয়ে করেও সংসার করতে পারে নি। ডাকাত হিসেবে দুনিয়াজোড়া নাম করেছে। রাজকন্যার মতো মেয়েকে গায়ের জোরে বিয়ে করে আবার সংসার করতে চাইলেই কি এবাদ সুখী হতে পারবে? ভাবতে গেলেই এবাদের মায়ের বুক উথাল-পাতাল করে।

শাশুড়ির অন্তরঙ্গ কথা শুনে মুক্তার মনে এই প্রথম সতীনের অস্তিত্ব কাঁটার মতো খচখচ করে বেঁধে। জানতে চায় সে, আপনার ছেলের আগের বউ কোথায়?

একটা ছাওয়া রাখিয়া এবাদ জেলে থাকার সময় গেল বছর মারা গেছে সে।

অতপর পুত্রবধূর মৃত্যুশোক নিয়ে এবাদের মা তার সুপুত্র ও মুক্তিযোদ্ধা এবাদের এবাদ ডকাতে রূপান্তরিত হওয়ার করুণ কাহিনী শোনায়। কিন্তু শাশুড়ির কাছে তার ছেলের ইতিহাস যতটুকু শোনে, এবাদ ডাকাতকে ঘিরে তার চেয়ে অনেক বেশি গল্প-কাহিনী বিয়ের আগে মুক্তা শুনেছিল। কিংবদন্তীর মতো বিখ্যাত এবাদ ডাকাতের বউ হওয়ার কথা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নি সে। তার এই দূর্ভাগ্য স্বয়ং এবাদের মাও মেনে নিতে পারছে না দেখে, নিজের ধৈর্যসহ্য আর ধরে রাখতে পারে না মুক্তা। গত রাতের কান্নাটা দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে আসে, কথা বলতে গিয়ে চোখ ফেটে জল গড়ায়।

আমার বড় আব্বার সঙ্গে আপনার ছেলের শত্রুতা। কিন্তু আমি বা আমার বাবা-মা তো তার কোনো ক্ষতি করি নাই। বিনা দোষে আমার জীবনটা সে নষ্ট করল কেন?

এবাদের মা যেভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে, যে বিশ্বাস নিয়ে সকালবেলা পুত্রবধূর জন্য ক্ষীর রেঁধে এনেছে, সরল বিশ্বাসে মুক্তাকেও তাই বলে সান্ত্বনা দেয় সে, আল্লার হুকুম ছাড়া তো এ কাম হয় নাই মা। আল্লার ইচ্ছায় যখন তুই এবাদ ডাকাইতের বউ হইলি, তখন নিশ্চয় এর মধ্যে আল্লার ভাল ইচ্ছা আছে। তোর কারণে মোর ডাকাইত বেটা হয়তো এবার সুপথে আসবে।

কিন্তু আমি আল্লার এ হুকুম মানি না। আপনার ডাকাত ছেলেকে আমি কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারব না। মুক্তা চিৎকার করে এরকম ঘোষণা দিলেই হয়তো বুকখানা মুহূর্তেই হালকা হয়ে যেত। কিন্তু চিৎকার করতে না পারার ব্যর্থতায় মুক্তা বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

চোখের পানি মুছে দিয়ে এবাদের মা তাকে সান্ত্বনা দেয়, কাঁদিস না মা। মনটা শক্ত কর। মানুষ মোকে ডাকাইতের মাও কয়, আড়ালে হামার কত বদনাম করে, তোর পেন্দনে দামী শাড়ি গয়না দেখিয়া তোকেও এলা হইতে ডাকাইতের বউ কইবে। কিন্তু তোর কারণে এবাদ যদি ভাল হয়, সবাই তোর সুনাম করবে।

www.pathagar.com

এ সময় ঘরে ঢোকে এবাদ। বাইরে পুকুর থেকে স্নান করে এসেছে। টেবিল থেকে আয়না চিরুনি নিয়ে সে মাথা আঁচড়ায়। লাজুক হাসি দিয়ে নতুন বউয়ের সঙ্গে কথা বলে মায়ের মাধ্যমে।

কী মা, তোর বউ কাঁদে কেন ? সর্বহারা এবাদের সংসারে থাকতে চায় না ? নয়া বউকে এত কাঁদতে দেখলে মানুষ যে খালি আমাকে গাইলাবে।

হারামজাদাটার কথা শোনো। বাবা-মা'র অমতে জোর করিয়া বিয়া করি সবার মনে দাগা দিলু। মা হামার কাঁদবে না তো কি হাসবে ?

এত কাঁদাকাটির কী আছে! মন না টিকলে তো কারো মনের ওপর জোর খাটানো যাবে না। আমি তো দাওয়াত না পাইলে শ্বশুর বাড়ি যেতে পারব না। কিন্তু তার যাওয়ার রাস্তা তো খোলা আছে। মন না টিকলে যে-কোনো সময় বাপের বাড়ি চলে যেতে পারে। আমি আর ফিরিয়ে আনব না।

মেয়েটার জীবনে কলঙ্ক দিয়া এলা তাকে বাপের বাড়ি যাইতে বলিস কোন আক্কেলে ? বাপের বাড়ি গেলে মানুষ কি তাকে এবাদ ডাকাইতের বউ কবার নয় ? তারচাইতে মানুষ যাতে আর হামার শিক্ষিত বউকে ডাকাইতের বউ কইতে না পারে, সেইভাবে চল তুই। দফের মোল্লার বেটি মরি গেছে, কিন্তু আফজাল মিয়ার বেটির কিছু একটা হইলে তোকে মুই আর ক্ষমা করিম না রে শয়তান।

এমনি কি আর মানুষ তোকে ডাকাইতের মাও কয় ? আমাকে গাইল দিস দে, কিন্তু নতুন বউয়ের সাথে ঝগড়া করিস না যেন।

দোষ করলু তুই। আর মানুষের নির্দোষ মেয়ের সাথে মুই ঝগড়া করিম ক্যানে রে শয়তান ?

ঠিক আছে, আমি তো সারাদিন বাড়িতে থাকব না। বউকে আদরযত্ন করে রাখিস। এখন খাইতে দে আমাকে।

এবাদ ঘরে আসার পরই মুক্তার কান্না থমকে গিয়েছিল। এবদের কথা শুনে বুক ধকধক করছিল তার, হয়তো চূড়ান্ত বোঝাপড়া শুরু করার উত্তেজনায়। শাশুড়ির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে মুক্তা এবাদের দিকে সরাসরি তাকায়, তাকিয়ে থাকে। লজ্জা পেয়ে এবাদের মা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

মূর্খ হলেও আমার মা খুব সোজা মানুষ মুক্তা। মানুষ ঝগড়ী বলে, কিন্তু মনটা ভাল। ভোরে উঠে তোমার জন্য ক্ষীর রেঁধেছে। মুরগি জবাই করেছে। কিন্তু তুমি খাচ্ছ না কেন ? নাও, আমি তোমাকে নিজ হাতে একটু খাওয়াই। তুমি তো আর আমাকে কখনও নিজের হাতে খাওয়াবে না। তুমি আমার হাতে একটু খেলে, সারা জীবন আমার মনে থাকবে সে কথা।

মুক্তা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বিয়ের আগে ডাকাতটাকে শক্ত কথা শুনিয়ে অপমান করতে একটুও ভয় পায় নি সে। আজ বলার অনেক জরুরি কথা বুকে উথাল-পাতাল করার পরও মুক্তা মুখ খুলতে পারে না বলে নিজের ওপর তার রাগ হয়।

এবাদ নিচু স্বরে কথা বলে, শোনো, আমি এখন জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি। সারা দিন দেখা হবে না। রাতে আমাকে যা শাস্তি দেবার দিও, কিন্তু উপাস থেকে খামোখা নিজেকে কষ্ট দিও না।

এবাদের মা আরেকটি থাল নিয়ে আসে। ছেলেকে ধমকায়, বউমাকে দিনু, আর তুই অক্ষসের মতো খাবার লাগছিস!

www.pathagar.com

মুই টাউনে যাইম মা। তোর বউয়ের জন্যে কিছু আনতে হলে বল।

আর একখান পেন্দনের শাড়ি আনিস। আর বেলা ডোবার আগে বাড়ি ফিরে আসিস বাবা। মোর জিউটা এলাও কেন যে ছটফট করে— আল্লায় জানে।

মুক্তা যদি ঠিক থাকে মা, সব ঠিক হবে। মুক্তা আমাকে মেনে নিলে সবাই আমাকে মেনে নেবে। এবাদকে আর ডাকাইত বলবে না মানুষ, বলবে আফজাল মিয়া এবং চেয়ারম্যানের জামাই।

সেরকম সম্মান পাওয়ার যোগ্য হওয়ার চেষ্টা কর এবার।

এবাদের খাওয়া এবং খেতে খেতে মায়ের মাধ্যমে স্ত্রীর উদ্দেশে কথা, হাসি এবং ভবিষ্যৎ-সুখের স্বপ্ন মুক্তার নীরব গাম্ভীর্য ভাঙতে পারে না। খাওয়া শেষ করে এবাদ জামা-কাপড় পরে। ঘরের মোটর সাইকেলখানা বাইরে বের করে ন্যাকড়া দিয়ে ধূলাবালি মোছে। তার মোটর সাইকেলের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পর, আপাতত ডাকাত স্বামীর সঙ্গে জরুরি মোকাবেলার দায় থেকে মুক্তি পেয়েই যেনবা, মুক্তা কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। শাশুড়ি এসে খাওয়ার অনুরোধ জানালে আর না করে না সে।

ঠাকুরপাড়ার সম্পূর্ণ অচেনা কিংবা সামন্য মুখচেনা বউ-ঝিরা একে একে, কখনওবা দল বেঁধে দিনভর নতুন বউকে দেখতে আসে। দেবী প্রতিমার মতো মুক্তা ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। তার বিষণ্ন গাম্ভীর্য দেখে অনেকে কাছে ঘেষতে সাহস পায় না, আবার অনেকে নববধূর শরম অগ্রাহ্য করে একান্ত কাছে এসে শাড়ি নেড়ে দেখে, গহনা দেখে, এটা-সেটা জানতে চায়। মুক্তা বিরক্ত বোধ করে। তার হয়ে ননদ পেয়ারি কিংবা শাশুড়ি জবাব দেয়, পান-সুপারি খাওয়ায় অনেককে। দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় যারা, তারাও মুক্তাকে শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে কিংবা মুক্তার শাশুড়ি-ননদের সাথে কথা বলে। অধিকাংশ কথা মুক্তার প্রশংসা বা গুণগান করার জন্য উচ্চারিত হয়। আবার কেউবা এবাদেরও গুণ-কীর্তন শোনায় মুক্তাকে। যারা সান্ত্বনা দেয়, তাদের সবার কথার মূল সুর একটাই— মেয়েমানুষ সে, রূপবতী, বি.এ, এম.এ পাশ হোক, আর খেদিবুচি মূর্খ হোক, স্বামী হিসেবে আল্লা যাকে নির্বাচন করে রেখেছে— তার ঘরেই তাকে আসতে হবে। নানা বয়সের মেয়েরা ছাড়াও কৌতূহলী বালক, এমনকি বয়স্ক পুরুষ মুখও দরজায় উঁকি দিতে দেখে মুক্তা। এবাদকে খুঁজতে এসে এবাদের নতুন বউকে দেখার সুযোগ মুহূর্তেই লুফে নেয় সবাই।

দর্শনার্থীদের ভিড়ে এক সময় নিজ গ্রামের নিকট প্রতিবেশী মহিলাদের দেখে মুক্তার স্থির থাকাটা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। ওরা যে মুক্তার বাপের বাড়ির প্রতিনিধি হয়ে এসেছে, সেটা বোঝানোর জন্য বাড়িতে এসে কান্নাকাটি এবং ঝগড়া শুরু করে দেয়, বিশেষ করে এবাদের বাপের বোন হনুফার মা। হনুফার মা গতকাল মুক্তার বাবা-মাকে আশ্বস্ত করেছিল— মুক্তাকে বিয়ে করার জন্য এবাদের ঘটক পাঠানো আসলে অন্য লোকের ষড়যন্ত্র। আজ নিজেই ষড়যন্ত্রকারী ও মিথ্যেবাদী অপবাদ নিয়ে ছুটে এসেছে ডাকাত ভাইপোর সঙ্গে ঝগড়া করতে। এবাদকে বাড়িতে না পেয়ে এবাদের মায়ের সাথে সে গলা ছেড়ে ঝগড়া করে। ঝগড়ায় ডাকাতের মা জান্নাতিও যে কম যায় না, ঘরে বসে প্রমাণ পায় মুক্তা। তার ছেলে যে ডাকাত নয়, মানুষ চক্রান্ত করে ডাকাত অপবাদ দিয়েছে এবং মানুষের চক্রান্তেই এ বিয়ে হয়েছে, সেটা নানাভাবে প্রমাণ করার পরও এবাদের মায়ের গলার তেজ কমে না। চেঁচিয়ে হনুফার

www.pathagar.com

মাকে আশ্বাস দেয়, বেয়ানিকে গিয়া কইস, বড় মানুষের বেটিকে ডাকাইতের মাও বাঁচি থাকতে কোনো কষ্ট দিবার নয়। শিক্ষিত বউ হামার এ বাড়িতে ঝাঁটা হাতে নেবে বা, ঢেকি বানবে না, গোবর ফেলবে না— ডাকাইতের মা বাঁচি থাকতে মুক্তা মায়ের কোনো কষ্ট হবে না।

ঘরে বসে মুক্তা চুপচাপ এইসব জটলা দেখে আর শোনে। তাকে দেখতে এসে অচেনা এক মহিলা অন্তরঙ্গ গলায় ঠাট্টা মস্করা করে। জবাব না পেয়ে গলায় সুর তুলে গীত গায় মহিলাটি। এবং গীতের সঙ্গে নাচতেও শুরু করে—

ও সোন্দর ময়না তোরে কারণে রে
এলা ক্যানে তোর বাপে দাও না-দাও করে রে
ও লাল ময়না তোরে কারণে রে...

গীতের সুরে তাল দিতে ঘরে এসে অনেকে জড়ো হয়। নতুন করে মুক্তাকে ঘিরে উৎসব শুরু হয় যেন। একজন ঘোষণা দেয়, এবাদ ভাই পলায় আনি বিয়া করলে হামরা মানব না বাহে। নতুন করিয়া কইনার গায়ে হলুদ দেমো, গীত গামো... ও ডাকাইতের মাও চাচী, বিয়ার খাওয়া না খায়া হামরা এ বাড়ি ছাড়ি যাবার নই... গাবরুর মাও পালায় বাহে..

নিজেকে ঘিরে আনন্দ-বেদনার এই গ্রাম্য কোলাহল সহ্য হয় না মুক্তার। তার এতক্ষণে শহরে থাকার কথা। কিন্তু এবাদ ডাকাত তাকে ঘরে বন্দি করে রেখে নিজে শহরে চলে গেছে। এবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ না করে গ্রাম-সমাজকে কীভাবে মোকালো করবে মুক্তা? নতুন বউয়ের অসহায় লজ্জা নিয়ে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে শুধু।

চাকরি নেই, ব্যবসায় নেই, খেত-খামারে যায় না, সারাদিন সে বাইরে বাইরে ঘোরে। রাতেও বাড়িতে ফেরার সময়-অসময় নেই। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, নানা ধরনের লোকজন আসে তার কাছে। মুক্তাকে অপহরণ করে বিয়ে করার পর, রাতে শোয়ার সময়টুকু ছাড়া বউয়ের প্রতি তার আর কোনো দায়িত্ব নেই। মুক্তাও আজ এবাদের সঙ্গে বাইরে যাবে, অথবা ডাকাত-স্বামীকে ঘরে বন্দি করে রাখবে সারাদিন।

এবাদ বাইরের পুকুরে গোসল করতে যাওয়ার পর মুক্তা আলনা থেকে স্বামীর সকল জামা-কপাড় সরিয়ে বাক্সে লুকায়। ঘরে এসে এবাদ আলনার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, কী ব্যাপার! আমার গেঞ্জি জামা প্যান্ট সব গেল কোথায়?

আমার সালোয়ার-কামিজের যে দশা করেছ, তোমার জামা-প্যান্টেরও সেই দশা করেছি। ওগুলি আর পরতে পারবে না।

তার মানে! আমি বাইরে যাব কীভাবে?

বাইরে যেতে হবে না। ডাকাতি-মাস্তানি ছাড়া বাইরে তোমার কোনো কাজ নেই।

বাইরে আমি কোথায় যাই, কেন যাই— তোমাকে তো সবই বলেছি মুক্তা।

www.pathagar.com

তোমার ওসব নোংরা পলিটিক্স আমি পছন্দ করি না। ডাকাতির রাজনীতি তোমাকে আর করতে দেব না আমি।

আরে সর্বনাশ! আজ আমাদের লিডার মেজর সাহেব থানায় আসবে। পার্টির জরুরি মিটিং। এমনি কি আর তিনি আমাকে মোটর সাইকেল দিয়েছেন।

বললাম তো, তোমার প্যান্ট-সার্ট ছুরি দিয়ে কেটে বাঁশঝাড়ের পায়খানায় ফেলে দিয়েছি। বিশ্বাস না করলে দেখ গিয়ে।

ডাকাইতের বউ বলে কী! সারাদিন তোমার আঁচলের বাতাস খাইলে আমার চলবে ?

আমার অনেক জরুরি কথা আছে। আজ তোমাকে সব শুনতে হবে। চূড়ান্ত বোঝাপড়া হবে তোমার সঙ্গে।

মুক্তার এই তেজস্বিনী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবাদ। বিয়ের পর মুক্তা এত সহজে বশ হবে, স্বামী হিসেবে এত দ্রুত মেনে নেবে— ভাবতে পারে নি। জীবনকে বাজি রেখে মুক্তাকে ঘরে তুলেছে এবাদ। ভয়টা এখনও পুরো কাটে নি। আজ দিবালোকে মুক্তার বিদ্রোহী রূপ একইসঙ্গে পুরনো ভয় ও নতুন আকর্ষণ জাগায়। মুগ্ধ এবাদ স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যায়। হাসে।

সব কাপড় যখন ছিড়েফেড়ে গুতে ফেলে দিয়েছ, পরনের লুঙ্গিটা আর বাকি থাকে কেন ? এটাও ছিড়ে এবাদ ডাকাতকে ল্যাংটা করে দিনরাত আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখ।

এ সময় পেয়ারি ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত বোধ করে। তড়বড়িয়ে কথা বলে, ও ভাবি, বাবুর বাড়ি বেড়াতে যেতে চাইলে যে। যাবে না ?

না। তোর ভাইয়ের সঙ্গে দরকারি কথা আছে আমার। তুই যা এখন।

পেয়ারি বেরুনোর সময় আলগোছে ঘরের দরজা বন্ধ করতে গেলে, মুক্তা ধমক দেয়, এই, দরজা দিচ্ছিস কেন ? খোল, খুলে রাখ।

এবাদ মুক্তার ঘাড়ে হাত রেখে চাপা স্বরে বলে, জরুরি কথা তো দরজা দিয়ে বলাই ভাল। লোকে শোনে যদি ?

মুক্তা ঝটকা মেরে এবাদের হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

তোমার আসল পরিচয় আজ আমাকে জানতে হবে। দাঁড়াও মাকে ডাকি। মায়ের সামনে সব কথাবার্তা হওয়া ভাল।

মুক্তা শাশুড়ির খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে, স্বামীর সঙ্গে জরুরি ঝগড়া ও ঘরে ফেরার কথা মুহূর্তেই ভুলে যায়। কারণ কোবাদ বাড়িতে ফিরে এসেছে। তাকে ঘিরে ব্যস্ত ও আনন্দিত তার মা ও বোন। স্কুল-সহপাঠী দেবরকে দেখে মুক্তা যতটা লজ্জিত, কোবাদ লজ্জা পায় তার চেয়েও বেশি।

পেয়ারি ঠাট্টা করে, দুনিয়ার মানুষ নয়া ভাবিকে দেখি দেখি বুড়া করি ফেলাইল, আর তোর এ্যাদ্দিনে সময় হইল ছোট ভাই ? ভাবি বাড়িতে আসতে না আসতে ভয়ে বাড়ি ছাড়ি পলায় গেলু। তাকে না দেখিয়া বুঝি আর থাকতে পারলু না ?

জান্নাতিও ছেলে ফিরে আসার আনন্দে হেসে যোগ করে, তোর ভাবির ভয়ে কি পলায় গেছিল ? রক্ষীবাহিনীর ডাণ্ড খাওয়ার পর হইতে ভয়পাদুরটার খালি পুলিশের ভয়। আরে, পুলিশ আর এ বাড়িতে আসবে না বাহে। পুলিশ আসার ঘাটা হামার বউমাই বন্ধ করি দিছে।

www.pathagar.com

কোবাদ তবু মুখ তুলে ভাবিকে দেখে না। ঘরে যেতে যেতে বলে, আমি বাড়িতে থাকতে আসি নাই মা। লজিং ঠিক করেছি, বই-কাঁথা-বালিশ নিয়ে এখনই চলে যাব।

চলি যাবু মানে। এবাদ তোর ওপর এমনি রাগ করি আছে, তার ওপর এ কথা শুনলে দেখিস এলায়।

আগুন হওয়ার কী আছে! আমি আমার মতো থাকবো।

এ সময় জ্বলন্ত সিগারেট হাতে এবাদ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

কী হইছে মা ? হারামজাদাটা ফিরেছে— কোথায় ? এই, এদিকে আয় আগে।

কোবাদ ঘর থেকে বেরিয়ে ভাইয়ের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়।

আমার বিয়ের দিন তুই বাড়ি থেকে পলায় গেছিলি ক্যানে রে ? বিয়ের আগে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আজ আমার বিয়ে হবে। তারপরেও তুই বাড়িতে থাকলি না কেন ?

কোবাদ জবাব দেয় না। একইভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থকে। ডাকাত ভাইকে সে ভীষণ ভয় পায়, নাকি অপছন্দ করে— মুক্তা ঠিক বুঝতে পারে না।

লজিং ঠিক করেছিস শুনলাম। বাড়িতে আর থাকবি না— কারণ কী ?

ভয়ে-লজ্জায় জড়োসড়ো দেবরের নীরবতা ভাঙাতে মুক্তা হাসে, ভাবিকে মনে হয় পছন্দ হয় নি কোবাদের। সেই জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালাতে চাইছে।

কোবাদ মুক্তাকে চকিতে দেখে নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, মুক্তাকে এভাবে হাইজ্যাক করে বিয়ে করাটা শুধু আমি কেন, এলাকার কোনো ভাল লোক পছন্দ করে নাই। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময় এবাদ ডাকাতের যে সুনাম ছিল, এখন আর সেটা নাই। সাধরণ পাবলিকও এ ঘটনার পর এবাদ ডাকাইতের নিন্দা করছে।

পাবলিক আজ নিন্দা করছে, একদিন আবার সুনাম করবে। কিন্তু তুই যে তোফাজ্জল চেয়ারম্যানের মতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে পলিটিক্স শুরু করেছিস। এসবের মানে কী ?

কোনো পলিটিক্সে আমি নাই। বাড়ি ছেড়ে আমি লজিং থেকে পড়াশুনা করব।

এত বড় স্পর্ধা হয়েছে তোর! আমার মুখের ওপর কথা বলিস। আমাকে না বলে আমার হুকুম ছাড়া বাড়ি ছাড়ার প্লান করেছিস। ভাল, বেশ ভাল।

বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ এবাদ মনে হয় অভিমান নিয়ে ঘরে ঢোকে। এবাদের মা ছোট ছেলেকে বোঝায়, বাড়ি ছাড়ার কথা আর কইস না বাবা। বউমা হামার কী ভাববে ?

ভাইজান আসলে তোর ওপর খুব রাগ হইছে ছোট ভাই।

ঠান্ডা মেজাজে কথা বলতে বলতে এবাদের রাগ যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে, মুক্তা ভাবতে পারে নি। একখানা মোটা দড়ি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। দড়ি দিয়ে কোবাদের হাত বাঁধতে শুরু করলে মুক্তা অবাক হয়ে জানতে চায়, ওকে বাঁধছ কেন ? এবাদ ঠান্ডা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে, প্রথম দিনে বেশি শাস্তি দেব না। হাত-পা বেঁধে বাইরের গাছে লটকে রাখব। গ্রামের মানুষ দেখুক, এবাদের বিরোধিতা করলে এবাদ ডাকাত ভাইকেও ক্ষমা করে না।

কোবাদ বন্দিত্ববরণে যেটুকু আপত্তি ও ভয় প্রকাশ করে, তা স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এবাদ প্রথমে তার দু'গালে পর পর দু'টি চড় দেয়। এরপর কোবাদকে অবাধ্য গরুর মতো টেনে-

www.pathagar.com

হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। বধ্যভূমিতে যাওয়ার সময় কোবাদ ডুকরে কাঁদে ও ক্ষমা চায়। জবাবে এবাদ ভাইকে এমন ধমক ও প্রহার দেয় যে, চিৎকার করার মতো তেজও আর অবশিষ্ট থাকে না কোবাদের শরীরে। তখন জান্নাতি ও পেয়ারি গলা ছেড়ে চেঁচায়। মা ও বোনের আতঙ্কিত কান্না, প্রতিবাদ ও কোবাদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা এবাদকে থামাতে পারে না। ফাঁসির আসামির মতো ছোটভাইকে খুলির কাঁঠালগাছে ঝোলাতে থাকে। কোবাদের শাস্তি দেখতে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে।

মুক্তা উঠানের কোণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খুলির গাছে ভাইকে ঝুলিয়ে রেখে বিজয়ীর আনন্দ নিয়ে এবাদ বাড়ির ভেতরে ফিরে বউকে হুকুম দেয়, মুক্তা ঘরে আস।

নির্দোষ দেবরকে উদ্ধার করবে, নাকি ডাকাত স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে— বুঝতে না পেরে মুক্তার বুক ধকধক করে। বাইরে কোবাদের কান্না ঘিরে হৈচৈ। ঘরে এবাদের ডাক। অবশেষে মুক্তা ঘরে ঢুকে এবাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

বাইরে আমার অনেক জরুরি কাজ। কিন্তু আমার জামা-প্যান্ট ছিড়ে আমাকে ঘরে আটকে রাখার মতলব কেন তোমার ?

মুক্তার চকিতে মনে হয়, তাকেও বুঝি ডাকাতটা এবার শাস্তি দেবে। কিন্ত ভয় পাওয়ার বদলে হিংস্র প্রতিরোধে তার কণ্ঠ চিরে যায়, বললাম তো, আমার অনেক জরুরি কথা আছে।

কী তোমার জরুরি কথা ? বলো এক্ষুণি।

তুমি কোবাদকে ওভাবে মারলে কেন ?

দোষ করলে তো শাসন করবই।

এরপর তো ও বাড়ি ছেড়ে সত্যি সত্যি চলে যাবে।

না, আর যাবে না। আমার হুকুমের বাইরে চললে মেরে হারামজাদার ঠ্যাং নুলো করে বাড়িতে ফেলে রাখব।

কোবাদের মতো আমিও তো একদিন এবাদ ডাকাতের সংসার ছেড়ে চলে যেতে পারি। তখন কী করবে আমাকে ?

অন্তরের গভীর সত্য উচ্চারণের আবেগে মুক্তার গলা কাঁপে। কিন্তু এবাদের চোখেমুখে অবিশ্বাস— ঠাট্টার হাসি।

আমার মুক্তা দুনিয়ার যেখানেই পালাক, তাকে আগে খুঁজে বের করব।

তারপর ?

তারপর, তারপর তাকে এমন শাস্তি দেব— দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

এবাদ বিছানা থেকে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করার পরও মুক্তা তার মতিগতি বুঝতে পারে না। ভয় হচ্ছে, আবার প্রতিরোধের সাহসও বাড়ছে। এবাদ তাকে প্রবল আলিঙ্গনে বেঁধে চাপা গলায় আবেগ প্রকাশ করে, তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব না। যাওয়ার আগে তুমি নিজ হাতে আমাকে খুন করে যেও।

মুক্তার শারীরিক প্রতিরোধ কণ্ঠেও তীব্রভাবে প্রকাশ পায়, দরজা বন্ধ করলে কেন ? বাড়িতে কত লোকজন! ছি ছি!

লোকজন সব বাইরের খুলিতে। এই সুযোগে তোমাকে একটু ভালবাসি।

নাহ্।

www.pathagar.com

মুক্তার না-বলা মুখ এবাদ দু'ঠোঁটে চেপে রাখে। এবাদের চুম্বন ও নাঙা শরীরের বলিষ্ঠতা, ঘেমো গন্ধ মুক্তার অন্তরের ক্রোধ-ঘৃণার আগুন শুষে নেয়, কোমল হয়ে আসতে থাকে তার শরীর। এবাদ ব্লাউজের হুকে হাত দিলে নরম গলায় বলে সে, ঠিক আছে। তুমি বস, আমি দেখে আসি ওরা কী করছে।

দরজা খোলার আগেই এবাদ মুক্তার কৌশল ধরে ফেলে। ছুটে এসে মুক্তাকে দু'হাতে পাজাকোলা করে শূন্যে তুলে নেয়, বিছানার দিকে এগোতে এগোতে বলে, আজ তোমাকে ছাড়ব না। অনিবার্য পতন ঠেকাতে স্বামীর গলা আঁকড়ে না ধরে উপায় থকে না মুক্তার।

এক সময় দরজা খুলে এবাদ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মুক্তা তবু বিছানায় জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকে। কেউ দেখে নি, ডাকাডাকি করে নি কেউ, তবুও মুক্তার ধারণা, বাড়ির সবাই জেনে গেছে। আব্রু ঢেকে শরীর স্বাভাবিক রাখার পরেও মুক্তা সহজ হতে পারে না। বিধ্বস্ত শরীরে কলঙ্কের দাগ নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। বাইরে যখন কোবাদ কাঁদছিল, ঘরে ডাকাত স্বামীর আদর-ভালবাসা ভোগ করছিল মুক্তা। এ কেমন ভালবাসা? ভাইকে নির্মমভাবে মারধর করে, ঘরে ঢুকে একইরকম হিংস্রতা নিয়ে মুক্তার শরীর-সত্তা তছনছ করে দিয়েছে ডাকাতটা। আর এই শরীরী-নির্যাতনকে ভালবাসা ভেবে মুক্তা বারবার তাকে আঁকড়ে ধরে। এবাদের নিষ্ঠুর শরীর তার শরীরে আনন্দ-শিহরণ জাগায় এবং স্বামীকে পাল্টা আদর জানায় সে। সত্যই কি তবে মুক্তা এবাদকে ভালবাসে, ভালবাসে কিন্তু নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায় না?

নিজের গোপন অনুরাগ স্পষ্ট ও সত্য করে তোলার আগে তার প্রতি এবাদের ভালবাসার গভীরতা আজ মাপতে চেয়েছে মুক্তা। এবাদ যখন বলে, মুক্তার প্রেমে অন্ধ হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে মুক্তাকে এভাবে ঘরে তুলেছে, যখন মুক্তার হাতে মরণ কামনা করে, তখন ডাকাতটার বেপরোয়া আবেগকে গভীর ভালবাসা ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু মুক্তা এর মধ্যে বুঝে গেছে, এবাদ শুধু দুঃসাহসী ডাকাত নয়, চতুরও বটে। তার ভালবাসার কথা, ভান ও আবেগ হয়তো ছলনা মাত্র। ছলে বলে মুক্তাকে বিয়ে করা এবং এই শরীরখানা ভোগের জন্য বউয়ের মর্যাদা দিয়ে মুক্তাকে এ বাড়িতে বন্দি করে রাখাটাই তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু মুক্তার নিয়তি কি তবে এবাদ ডাকাতের ভোগের সামগ্রী হয়ে বাকি জীবনটা এ বাড়িতে কাটানো? এবাদকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়ে এ বাড়িতে দিন গুজরানোর সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে সে? না পারে নি। মুক্তা আজ তাই এবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত ফয়সালা করতে চেয়েছিল। এবাদকে স্বামী হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত দেওয়ার কথা ভেবে রেখেছে সে। কিন্তু সে সব শর্ত পূরণের যোগ্যতা ডাকাতটার যদি না থাকে? তখন কী করবে মুক্তা— নিজেও জানে না সে।

গ্রামখানা পার হলেই তার নিজের বাড়ি, বাড়িভরা আপনজন। নানার বাড়িও খুব একটা দূর নয়। অথচ নিকটজনেরা কেউ এখনও মুক্তার খোঁজ নিতে এল না। ছোট ভাইবোন দুটি লুকিয়ে যে-কোনো সময় আসতে পারে, আব্বার ভয়ে আসে না হয়তো। আব্বা নাকি মুক্তাকে মৃত ঘোষণা করেছে। এরকম মনে হলে মুক্তার সত্যই বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ না করে মরেই বা কোন যুক্তিতে?

পেয়ারি এসে ডাকাডাকি করে মুক্তার ঘুম ভাঙায়।

কী-রে ভাবি, খাওয়া-দাওয়া করা লাগবে না?

www.pathagar.com

আমার খিদে নেই। খাব না।

ওদিকে ছোট ভাইও গোস্বা হয়ে আছে। তুমি না খাইলে ছোট ভাইও খাবে না। চল ভাবি।

তোর ভাইজান কোথায় গেছে ?

খালি ভাইজানের খোঁজ। ছোট ভাইয়ের একটা জামা গায় দিয়া কইবা গেল।

দূরে যে কোথাও যায় নি, ঘরে রাখা মোটর সাইকেল দেখে নিশ্চিত হয় মুক্তা।

কোবাদটা আমার কারণে বিনা দোষে মার খেল পেয়ারি।

গালে এখনও ডাকাইতের আঙুলের দাগ বসে আছে।

বাঁধন খুলে দিল কে ?

তোমরা ঘরে ঢুকিয়া দরজা লাগানোর পরই মা ছোট ভাইয়ের বাঁধন খুলে দিয়া গাছ থেকে নামায় দিছে।

মুক্তা যে লজ্জা আড়াল করার জন্যে এতো কথা বলে, ননদের চোখে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠায় ম্লান হাসে।

আমি আগে গোসল করব। কুয়ার পড়ে চল।

বাড়িতে ফিরে এবাদ আবার নির্লজ্জের মতো চেঁচিয়ে ডাকে, মুক্তা। ও মুক্তা। ও মা, মুক্তা কোথায় ?

বউ গোসল করছে জেনেও হাকডাক কমে না তার।

আমি বাইরে যাব। তাড়াতাড়ি আমাকে খাইতে দে।

মুক্তা ভেজা চুলে গামছা বেঁধে রান্নাঘরে শাশুড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। জান্নাতি ছেলের জন্য ভাত বাড়ে এবং মুখে গজর গজর করে, ডাকাইতটা বাড়িত থাকলেও অশান্তি। যা তো মা, ওর ভাত ঘরে দিয়া আয়। খায়া ভটভটিখান নিয়া চলি যাউক। ডাকাতি করুক আর দেওয়ানগিরি করুক, বাইরে গিয়া যা ইচ্ছা করুক হারামজাদা। বাড়িতে অশান্তি আর ভাল লাগে না।

আপনার ছেলের সঙ্গে আমি কিছু জরুরি কথা বলব মা। আপনার সামনেই বলতে চাই । চলেন আপনি।

জান্নাতি অবাক হয়ে পুত্রবধুকে দেখে, যেন চিনতে পারে না।

আগে ভাতটাত খাউক, তারপাছে যা বলার বলিস, না হইলে মেজাজ পাগলা কুত্তা হইবে এলায়।

ঠিক আছে, আমি ভাত নিয়ে যাচ্ছি, আপনিও আসেন।

খেতে বসে এবাদ প্রসন্ন মেজাজে ছোট ভাইয়ের খোঁজ নেয়, কোবাদ খায় নাই মা ?

যে ডাঙ ডাঙালু, আর সে ভাত খায়! ডাকাত ভাইয়ের সাথে এক সাথে বসবাস করবে না আর। জীবনে কথাও বলবে না তোর সাথে।

যাও তো মুক্তা। শয়তানটাকে ডেকে আনো তো।

নাহ্। আমি পারব না।

এবাদ মুক্তার দিকে তাকিয়ে, চিৎকার করে ভাইকে ডাকে। দু'বার ডাকতেই কোবাদ ঘরে

www.pathagar.com

এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়।

বস আমার পাশে। দে মা, কোবাদের ভাত দে।

কোবাদ লক্ষ্মী ছেলের মতো ভাইয়ের পাশে বসে এবং খাওয়া শুরু করার আগে মুক্তার দিকে তাকিয়ে প্রথম কথা বলে, ভাবি, আপনিও বসেন।

কোবাদের প্রতিবাদ, কোবাদের অভিমান এত সহজে জল হয় দেখে মুক্তার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। ডাকাত ভাইকে কি সে যমের মতো ভয় পায় ? নাকি ভালও বাসে ?

এবাদের প্রসন্ন মেজাজ আরো খোলতাই হয়ে ওঠে।

দে মা, তোর বউকেও ভাত দে। মুক্তা বলতে গেলে টাউনের মেয়ে। স্বামীর সাথে বসে খেতে শরম পাবে না।

শোনো এবাদ ডাকাত, আমি তোমার ভাই কোবাদ নই যে এত অপমানের পরও লক্ষ্মী বউয়ের মতো তোমার সঙ্গে বসব। এখনও চেনো নি আমাকে ? তুমি কি জানো, অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস পাওয়ার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করার স্বপ্ন দেখে সে ? তুমি কি জানো— তোমার মতো কুখ্যাত এক ছোটলোকের গাঁয়ের বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকার স্বপ্ন কোনোদিন দেখে নি সে ? জানো না। অন্যের স্বপ্নসাধ ধ্বংস করে কেবল নিজেরটা আদায় করতে জানো তুমি। তোমার ভাই আমাকে কিছুটা জানত বলে সরাসরি চোখ তুলে তাকাবার সাহস পায় নি কখনও। শিক্ষা, বংশ, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, বাড়ির পরিবেশ— কোন দিক দিয়ে তুমি আমার উপযুক্ত ? তোমার ভালাবাসার ছলনা বিশ্বাস করি না আমি। তোমার ডাকাত-সর্দারি চেহারা আর দুঃসাহস দেখে ভয় পাবার মতো মেয়ে নয় মুক্তা।

মুখ খোলার আগে মুক্তার জরুরি কথার স্রোত ভেতরে আলোড়ন জাগালে, এবাদ আদেশ করে, বস। আমার সাথে আজ খাবে তুমি।

ছেলের বেলাজ স্বভাব ও বউয়ের কঠিন মুখ দেখে জান্নাতি অস্বস্তি নিয়ে বলে, বউ কীবা জরুরি কথা বলবে তোকে। সেই জন্যে মোকে ডাকায় আনল।

কী জরুরি কথা তোমার ? ঠিক আছে খেতে খেতে বল।

আমি এবাদ ডাকাতের ভাত খাব না। ডাকাতের সংসারও করব না।

মুক্তার আকস্মিক স্পষ্ট ঘোষণা শুনে এবাদ-কোবাদ দু'ভাইয়েরই খাওয়া থেমে যায়। অবশ্য কয়েক মুহূর্তের জন্য। বউ খাবে না শুনে এবাদ গম্ভীর হয়ে নিজে দ্রুত খেতে থাকে। কোবাদ মাথা নিচু করে রাখে, ভাইয়ের ভয়ে সম্ভবত ভাতে পানি ঢেলে দেয়ার সাহস পায় না। জান্নাতি মাথায় হাত দিয়ে তার মানসিক আঘাত প্রকাশ করে, বিয়া হইতে না হইতেই এ কেমন কথা বউমা! মানুষ শুনলে কী কইবে ? নিজের বেটা-বেটির চাইতেও তোকে আপন করি নিনু এই জন্যে ?

এবাদ স্ত্রীকে হারানোর বেদনা সহজভাবে মেনে নিয়ে ভাইকে আদেশ দেয়, খাওয়া হলে একখান গরু গাড়ি ভাড়া করে আন কোবাদ। তোর ভাবিকে তার বাপের বাড়ি সজনায় রেখে আয়।

কেন ? বাপের বাড়ি যাব কেন ? বাপের বাড়ি যাওয়ার মুখ রেখেছো আমার ?

বাপের বাড়ি যাবে না, আমারও সংসার করবে না, তাহলে কী করতে চাও তুমি ?

www.pathagar.com

মুক্তা চট করে এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। তবে কিছু একটা করার জন্য যে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তার চেহারা দেখে আঁচ করতে পারে সবাই।

খাওয়া শেষ করে এবাদ উঠে দাঁড়ায়। সিগারেট ম্যাচ হাতে নিয়ে বলে, শিক্ষিত মেয়ে হয়েও তুমি একটা ভুল করেছ মুক্তা। বিয়েতে এত সহজে রাজি হাওয়া মানে রেজিস্ট্রি ফরমে স্বাক্ষর দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই। তাহলে এবাদ ডাকাতের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করার সুযোগ পেতে। তোমার আব্বাও তোফাজ্জল চেয়ারম্যানকে এক হাত নেয়ার সুযোগ পেত।

এবাদ ডাকাতের ওপর প্রতিশোধ নিতে আমার মামলা-মোকদ্দমা করতে হবে না। মুক্তা একাই যথেষ্ট।

সে সুযোগও তোমাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তেমন সুযোগ তোমাকে আর নাও দিতে পারি। এখন ইচ্ছে করলে আমার বউকে আমি মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখলেও কারও কিছু বলার নেই।

চোপ হারামজাদা। আমি বাঁচি থাকতে বউয়ের গায়ে হাত দিলে তোর হাত কাটি ফেলাইম মুই।

ছেলেকে ধমক দিয়ে জান্নাতি মুক্তার হাত ধরে, চল তো মা তুই মোর সাথে। আগে মোকে ভাঙি বল— হঠাৎ কী হইল তোর ?

আপনি বসেন মা। আপনাদের সামনে আমি এবাদ ডাকাতের কাছে কয়টা সত্য কথা জানতে চাই।

ওহ। তোমার জরুরি কথা তাহলে আরো আছে ?

উৎসাহিত এবাদ সিগারেট জ্বালে। ভাতের থালে পানি দিয়ে কোবাদ মাদুরের ওপর স্থির বসে থাকে।

তুমি এই যে দামী সিগারেট খাও, মোটর সাইকেলে সারাদিন ঘুরে বেড়াও, বউকে দামী শাড়ি গহনা এনে দাও— এতো টাকা কোথায় পাও তুমি ? সত্যি কথা আমাকে বলতে হবে।

তার মানে তুমি জানতে চাও আমি আগের মতো দলবল নিয়া ডাকাতি লুটপাট করে টাকা রোজগার করি কি-না।

হ্যাঁ। ডাকাতি না করলে কী ভাল কাজটা করো তুমি ?

বউ হামার আসল জায়গায় হাত দিয়েছে। মোরও একই কথা, ডাকাতি করিস না তো দুনিয়ার মানুষ তোকে এবাদ ডাকাইত কয় ক্যানে ? এই যে বিয়া করি বউকে এত জিনিস দিলু, গরিবের বেটা হয়া মোটর সাইকেল দাবড়াইস— মানুষ কতো কথা বলে!

আহা মা তুই চুপ কর তো। তুই যা এখান থেকে, মুক্তা যা জানতে চায় আমি আজ সব সত্যি কথা বুঝিয়ে বলব তাকে।

ক্যানে রে গুন্ডা, নিজের মাওকে বিশ্বাস করিস না তুই ? মুই কি তোমার গোপন কথা দশজনের কানে লাগায় বেড়াইম ?

আহা মা, তুই এত ফ্যাদলা পাড়লে ভাইজান জবাব দেবে কী। চুপ করে বসে থাক। ভাই-ভাবির কথা শোন আগে।

কোবাদের ধমক খেয়ে জান্নাতি তার পুরনো উত্তেজনা সামলে জড়সড় হয়ে বসে।

এবাদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি মুক্তা জানো ? ডাকাতি গুণ্ডামি আমি

www.pathagar.com

করি না। ডাকাত কোনোকালে ছিলামও না, তবু গ্রামের লোকজন আমাকে ডাকাইত বানিয়েছে। এমনকি নিজের মাও আমাকে ডাকাইত ছাড়া কিছু ভাবে না।

আবার মিথ্যে কথা বলছ কেন ? আমাকে ছিনিয়ে আনার আগেও তুমি একবার আমাদের বাড়ি ডাকাতি করেছ। করো নি ?

হ্যাঁ করেছি। তখন আমি সর্বহারার রাজনীতি করতাম। সর্বহারা এবাদের একটা আদর্শ ছিল, একটা বিশ্বাস ছিল।

কীসের বিশ্বাস ? কোথায় তোমার সেই আদর্শ ?

নেই। আগে ছিল, এখন নেই। সেই জন্যে সরকারি দলে যোগ দিয়েছি। তবে সমাজের আসল ডাকাত শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা আর শোষিত শ্রেণীর অর্থাৎ সর্বহারাদের প্রতি দরদটা আগের মতই আছে। ক্ষমতা থাকলে তাদের ভাল করার চেষ্টা করব।

এই জন্যে সরকারি দল তোমাকে টাকা দেয় ?

টাকা আসলে এমনি কেউ কাউকে দেয় না মুক্তা। ক্ষমতা দেখিয়ে কৌশল খাটিয়ে টাকা আদায় করতে হয়। তাছাড়া অন্যায়ভাবে টাকা যারা কামায়, এবাদ ডাকাত ও এবাদ বাহিনীকে হাতে রাখার জন্য ভয়ে তারা আমাকে টাকা দেয়। চাইলে দেয়, না চাইলেও দেয়।

এইভাবে টাকা রোজগার করাটা তোমার কাছে কোনো অন্যায় কাজ নয় ?

দেখ মুক্তা, তুমি এবং কোবাদও আমার চেয়ে বেশি ডিগ্রি নিয়েছ। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান আমার চেয়ে তোমাদের বেশি না। দেশ সমাজ কীভাবে চলছে— আমার চেয়ে তোমরা বেশি জান না। মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্স করেছি, জেল খেটেছি, রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে বড় বড় তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের কাছে অনেক ছবক নিয়েছি।

তুমি আগে কী করেছ সেটা আমার জানার বিষয় না। এখন যা করছ সেটা অন্যায় কিনা বলো।

না। অন্যায় নয়। এ সমাজে বেশিরভাগ লোক দু'বেলা খেতে পায় না। মৌলিক চাহিদা মেটে না তাদের। অন্যদিকে কিছু লোক রাতারাতি লাখপতি কোটিপতি হচ্ছে। চাকরিজীবীরা ঘুষ দুর্নীতি না করে সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা শ্রম বেচে, তারা ন্যায্য মজুরি পায় না। কিন্তু ধান্ধাবাজি করে অনেকে হাজার হাজার টাকা কামায়। ক্ষমতায় থেকে অভাব অনটনে থাকে না কেউ। এসব যদি তোমার কাছে অন্যায় মনে না হয়, তাহলে আমিও কোনো অন্যায় করছি না। তাছাড়া আমি এখন পলিটিক্স করি, পলিটিক্স করা অন্যায় হবে কেন ?

এবাদ ডাকাত যে ঝানু পলিটিশিয়ান, আজ তোমার কথা শুনে তা ভাল করে বুঝতে পারছি। তা রাজনীতি কর ভাল কথা, তোমার সঙ্গে অস্ত্র থাকে কেন ?

শোনো, একটা কথা আছে— বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস। আমার তো তোমাদের মত জমি-জমা ধন-সম্পদ নাই। অস্ত্র এবং নিজের বাহিনী আমার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা না থাকলে সমাজ বল সরকার বল আমাকে কোনো দাম দিত না।

এই অস্ত্র দিয়ে তুমি তোমার সর্বহারাদের কী উপকারটা করছ ?

সেই জন্যে তো সরকারি দলে যোগ দিয়েছি। দেখ, প্রেসিডেন্ট জিয়াও তো একসময় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীন দেশে ক্রমে ক্রমে সেনাবাহিনী প্রধান হলেন। তারপর ভোটে

www.pathagar.com

জিতে প্রসিডেন্ট হয়ে দেশ চালাবার ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন বলেই না এখন জনগণের জন্য ভাল কিছু করতে পারছেন। তেমনি আমি এমপি মিনিস্টার হতে না পারি, ভোটে দাঁড়ালে আগামীতে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হতে পারব— তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তখন দেখে নিও, এলাকার গরিবের উপকার করতে না পারি অন্তত তোমার জ্যাঠার মতো রিলিপ চুরি করব না। লোকে তখন তোমাকে ডাকাতের বউ বলবে না মুক্তা, বলবে চেয়ারম্যানের বউ।

তা হলে তো আমাকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে একটা ভাল কাজ করেছ। কোনো অন্যায় করো নি। কী বলিস কোবাদ ?

কোবাদ নড়েচড়ে বসে, গলা খাকারি দেয়। তার আগে জান্নাতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কী জানি মা। হারামজাদাটা যে কী কয় না কয়, মোর মাথায় কিছু সোন্দায় না। জেলে থাকিয়া মনে হয় ওর মাথাটা খারাপ হইছে।

কিন্তু আমার মাথা এখনও ঠিক আছে মা। এবার আমার আসল কথাটা শোনেন সবাই। আপনার ছেলেকে আমি স্বামী হিসেবে মেনে নেব, সংসার করব, কিন্তু আমার কয়টা শর্ত আছে।

কী শর্ত ?

এক নম্বর, তোমার ঐ পালিটিক্স, ডাকাতি, সন্ত্রাসী একদম ছেড়ে দিতে হবে।

তারপর ?

সামনে আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। আমাকে কলেজে হোস্টেলে রেখে আসবে। কষ্ট করে হলেও আমার পড়ার খরচটা চালাতে হবে।

তারপর ?

তারপর পাস করে একটা না একটা চাকরি আমার হবে, অন্তত স্কুল মাস্টারি তো পাবই। তখন আমাদের ছোট সংসার গ্রামে হোক আর শহরে হোক, সুন্দরভাবে চলে যাবে। তুমি পারলে আবাদ সাবাদ দেখবে, সৎভাবে কোনো ব্যবসা করবে, আর কিছু না করো যদি বসে বসে আমার রোজগারের টাকায় সিগারেট ফুকবে।

এবাদ হঠাৎ হো হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তার হাসি থামতে চায় না। তিনজন অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। জান্নাতি ধমক দেয়, হাসিস ক্যানে রে শয়তান, হামার শিক্ষিত বউ কি তোকে হাসির কথাটা কইল ?

এবাদ হাসি থামিয়ে মুক্তাকে দেখে, কিন্তু কথা বলে মায়ের উদ্দেশে, তোর শিক্ষিত বউ এবাদ ডাকাইতকে তার গোলাম বানিয়ে রাখতে চায় মা।

ডাকাতি করি বদনাম কুড়ার চাইতে বউয়ের গোলামি করাটাই ভাল।

কোবাদ আবার গলা খাকারি দেয়। মুক্তার দিকে সরাসরি মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে রেখে উচ্ছ্বসিত গলায় কথা বলে, ভাবি আপনি একদম খাঁটি কথা বলেছেন। আপনার শর্তের সাথে আমি ষোল আনা একমত। এই কথাটা আমি ভাইজানকে অনেক বুঝিয়েছি, মাও প্রায় বোঝায়, কিন্তু আমাদের কথার কোনো দাম দেয় না ভাইজান।

মুক্তা শপথ উচ্চারণের দৃঢ়তা নিয়ে বলে, আমার শর্ত না মানলে আজ থেকে এ বাড়িতে আমি থাকব না।

কোথায় যাবে ?

www.pathagar.com

তোমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আমি বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। এবাদ ডাকাতকে শিক্ষা দিতে না পারি, বিষ খেয়ে মরতে তো পারব।

ওহ! তা হলে আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এইসব শর্ত দিলে তুমি ?

স্বামী হিসেবে আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই। আর আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যদি সত্য হয়, হাসিমুখে তোমার এই সামান্য শর্ত মেনে নেয়া উচিত। আর এ কারণে তোমার মা-ভাইয়ের সামনেই এসব কথা বললাম।

হাসিমুখে সম্মতি জানাবার বদলে এবাদ বেশ গম্ভীর হয়ে যায়। আবার সিগারেট জ্বালে।

তুমি খুব চালাক মেয়ে মুক্তা। তোমার মতো শক্ত মেয়ে এ গ্রামদেশে কেন, শহরেও খুব কম আছে। তোমাকে জোর করে বিয়ে করে আমি ভুল করি নি। কিন্তু তোমার প্রথম শর্ত মানা আমার জন্য বেশ কঠিন।

কেন কঠিন কেন ?

যে ভাল হইতে চায় আল্লাও তার পাশে থাকে।

আমি তোমাদের কী করে বোঝাব, এ সমাজে ভাল মানষের কোনো দাম নেই। আমি ভাল থাকতে চাইলেও সমাজ আমাকে ভাল থাকতে দেবে না। আর রাজনীতির বাইরে যারা থাকে, তারাই রাজনীতির বেশি শিকার হয়।

কোবাদ তর্কের উত্তেজনায় উঠে দঁড়ায়, আপনার এ কথায় আমি একমত না ভাইজান। আসলে ভাবির কথাকেও কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না আপনি।

জান্নাতি কোবাদের সঙ্গে গলা মেলায়, বউ মা যদি আজ বাড়ি হইতে বারায় যায়, তবে আল্লার কসম, মুইও আর ডাকাইত বেটার সংসারে থাকিম না।

মা শোন, কাউকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে না। আমি মুক্তার শর্ত মেনে নেব। কিন্তু আমারও দুটি শর্ত আছে।

ঠিক আছে বলো। মানার মতো হলে অবশ্যই আমি মানব।

এক নম্বর, তোমার বাবা-মাকে জামাই হিসেবে আমাকে মেনে নিতে হবে।

অবশ্যই মানবে। কিন্তু তার জন্য সময় দরকার। অন্য শর্ত কী ?

তুমি তো জানো মুক্তা, আমার আগের বউয়ের একটা ছেলে আছে। ছেলেটা নানার বাড়িতেই থাকে। মা ওকে আদর দিয়ে এ বাড়িতে রাখতে পারে নাই। তুমি আমার মা-মরা সোহরাবকে ছেলে হিসেবে মেনে নেবে এবং এ বাড়িতে যতদিন থাকবে, ওকে মায়ের আদর দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করবে।

ঠিক আছে, তোমার এ শর্ত এক্ষুণি আমি মেনে নিলাম।

কোবাদ খুশিতে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। বলে, আমি সোহরাবকে নিয়ে আসি। আর নতুন ভাবির জন্য মিষ্টি কিনে আনি।

পেয়ারি প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিল। ফিরে এসে সকলের হাসিমুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে জানতে চায়, কী হইছে ? ছোট ভাই কীসের মিষ্টি আনিস ?

জান্নাতি ধমক দেয়, চোপ। ঘরের কথা যেন ঘরেই থাকে।

www.pathagar.com

জাদরেল এবাদ ডাকাতকে মুক্তা বশ করতে পারে, কিন্তু তার আট বছরের শিশুপুত্রকে বশে আনতে হিমসিম খেয়ে যায়। কাজটি খুব সহজ হবে, ভেবেছিল সে। বিয়ের মাস না পুরতেই মা হওয়ার প্রস্তাবটি বেশ মজার মনে হয়েছিল। কিন্তু সোহরাবকে দেখে তার মাতৃহৃদয়ে স্নেহ তেমন উথলে ওঠে না। হাহাকারও জাগে না। ছেলেটির মৃত মায়ের কথা ভাবে সে। এবাদ তার প্রথম স্ত্রীকেও নিশ্চয় ভালবেসেছিল। হয়তো মুক্তার চেয়েও বেশি। প্রথম প্রেমের স্মৃতি ভুলতে পারে না বলেই সম্ভবত সন্তানকে কাছে রাখতে চায়। সান্ত্বনা খোঁজে এবং ছেলেকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়াটা খুব স্বাভাবিক।

এসব ভাবনায় মৃত সতীন মুক্তার মনে যতটা জীবন্ত হয়ে ওঠে, অস্বস্তিকর জ্বালা হয় তারচেয়ে বেশি। কারণ ডাকাতটাকে বশে আনতে পারলেও তার সম্পূর্ণ ভালবাসা সে পাবে না। এবাদের একমাত্র প্রেমিকা হওয়ার ভাগ্য তার হয় নি। তাছাড়া শর্ত দিয়ে এবাদের স্বভাব কি মুক্তা পুরোপুরি পাল্টে দিতে পারবে ?

মোটর সাইকেল নিয়ে সারাদিন বাইরে ঘোরাটা বন্ধ হয়েছে তার। দলের কাজেও শহরে যায় না, কিন্তু বাড়ির বাইরে যাওয়াটা এবাদের বন্ধ হয় নি। সময়-অসময়ে নানা ধরনের লোক আসে, এমনকি কখনওবা রাতদুপুরেও অনেকে খোঁজ করে। ওদের নিয়ে আলাপ করতে বাড়ির বাইরে যায় এবাদ, অনেকটা সময় কাটিয়ে ঘরে ফেরে। জিজ্ঞেস করলে মুক্তাকে সান্ত্বনা দেয়, হুট করে অন্য মানুষ হওয়া যায় ? আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি। একটু সময় তো লাগবে।

শাশুড়ি ও দেবর-ননদের মনে নতুন আশার আলো জ্বালাতে পেরেছে মুক্তা। এবাদ যতটকু বদলেছে এবং বউয়ের বশ মেনে সংসারে মন দিয়েছে, তাতেই তারা মহা খুশি। মুক্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আদর-যত্ন প্রকাশে সবাই খুব আন্তরিক। শাশুড়ি বলেছে, প্রয়োজন হয় জমি বেচে মুক্তার পড়ার খরচ যোগাবে সে। শহরে যাওয়ার তারিখও মোটামুটি ঠিক। এখন হনুফার মা মুক্তার মায়ের কাছ থেকে গোপনে তার বই-খাতাপত্র এনে দিতে পারলেই হয়।

এবাদের শর্ত মেনে তার ছেলেকে আপন করে নিতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নি মুক্তা। মুশকিল হলো, ছেলেটি মুক্তাকে মা, নয়া মা, এমনকি খালা ডাকতেও রাজি নয়। কাছে ঘেষতে চায় না কিছুতেই। প্রথম দিনে বাড়ির লোকেরা নতুন মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করেছে। মুক্তা কাছে টেনে নিয়ে বলেছে, বলো তো সোনা মানিক, আমি কে ?

তুমি হইলা ডাকাইতের বিটি।

সোহরাবের নানা-নানী ভাটি এলাকার মানুষ বলে ছেলেটির কথার টান এমনিতে মধুর, তারওপর এই জবাব শুনে হেসে বাঁচে না সবাই। মুক্তা লজ্জা ঢাকতে মা ডাক শুনতে চাপাচাপি করেছিল। কিন্তু সোহরাব তীক্ষ্ণ প্রতিবাদী কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে, তুমি আমার কেউ না। আমার মা আল্লার বাড়িতে গেছে।

www.pathagar.com

এরপর মা ডাক শুনতে চেয়ে মা-হারা ছেলেটির মনে কষ্টের স্মৃতি জাগাতে চায় না মুক্তা। সম্বোধন ছাড়াই ছেলের সঙ্গে নানা কৌশলে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। সকাল-সন্ধ্যা তাকে পড়াতে বসায়। কোবাদ কিছু চকলেট ভাবির হাতে তুলে দিয়ে কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে। একটি চকলেটের লোভ দেখিয়ে সোহরাবকে অনেক কিছু করানো সম্ভব, এমনকি মা ডাক শোনাটাও।

ছেলেকে নিয়ে সন্ধ্যার পর মুক্তা যখন আজ বিছনায় বই নিয়ে বসেছে, এমন সময় বাইরে থেকে এসে এবাদ সুখবর শোনায়।

ও মুক্তা, দেখ দেখ, বাড়িতে আজ কোন মেহমান আসল।

বাপের বাড়ি থেকে কেউ এসেছে ভেবে মুক্তার বুকে হঠাৎ খুশি যেভাবে চলকে ওঠে, ভুল ভেঙে যাওয়ায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া একইভাবে তাকে গ্রাস করে। গুড়াতি ঘটককে দেখে মুক্তা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। অশুভ আশঙ্কায় বুক কাঁপে।

এবাদ ডাকাতের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গুড়াতি ঘটক যেদিন বড়বাড়িতে গিয়েছিল, সেদিনও তাকে দেখে অশুভ আশঙ্কায় বুক কেঁপেছিল মুক্তার। এবাদ মেহমানকে ঘরে এনে বসাবার পর মুক্তা তাকে হেসে স্বাগত জানায় না, বুড়োর দিকে তাকায় না পর্যন্ত। মুখ ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চায় শুধু, কী নানা, আবার আজকে কী চক্রান্ত নিয়ে এ বাড়িতে আসলেন?

গুড়াতি ঘটক জবাব দেয়ার আগে এবাদ হেসে সুখবরটি জানায়, তোমার আমার বিয়ের ঘটকালি তো ফেল করেছে ঘটক নানা। এখন এসেছে আপোসের ঘটকালি করতে। তোমার নানা নাকি নাতিজামাইকে ডেকে পাঠিয়েছে।

কেন? এতো লোক থাকতে আপনাকে ডাকতে পাঠাল কেন?

মুই তার কী জানো বুবু! তোমার নানা-মামারা মোকে জোর করি পাঠায় দিল। এবাদ ভাইকে সাথে করি নিয়া যাইতে কইছে। আপোস করার জন্য কথাবার্তা কইবে মনে হয়।

আপোস করতে চাইলে নানাজি নিজে আসবে। তুমি যাবে না।

এটা তুমি কেমন কথা বললে মুক্তা। সবাইকে ছেড়ে তিনি নাতিজামাইয়ের বাড়ি আগে একা আসেন কীভাবে? আসলে আমার আগেই যাওয়া উচিত ছিল। নানাজির পায়ে পড়লে তিনি ক্ষমা না করে পারবেন না। আর নানাজি আমাদের পক্ষে থাকলে তোমার আব্বা-আম্মার মন অটোমেটিক নরম হয়ে আসবে।

তুমি আপোস করার জন্য এত অস্থির হয়েছো কেন?

তোমাকে এভাবে বিয়ে করার পর চারদিকে আমার খুব বদনাম হচ্ছে মুক্তা। এবাদ ডাকাতের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তুমি মেনে নিয়েছো। এরপর তোমার বাবা-মা মেনে নিলে কোনো শালার কিছুই বলার থাকবে না। নাকি বলেন ঘটক নানা?

গুড়াতি ঘটক ঘুরেফিরে মুক্তাকে দেখছিল। এবাদ ডাকাতের বউ সেজে মুক্তা বহাল তবিয়তে আছে দেখে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

মুক্তা খোঁচা দেয়, কী গো নানা, ডাকাইতের বউকে এমন করে কী দেখছেন? নানার বাড়িতে গিয়ে বলবেন আমি ভাল আছি, সুখেই আছি।

বুবুরে, তোর জন্যে মুল্লুকের মানুষ খালি এবাদ ডাকাইতের বদনাম করে না, মোকেও দোষ দেয়। কিন্তু মোর কী অপরাধ? এবাদ তো খালি ডাকাইত নয়। এখন সে তোর স্বামী। তোর

www.pathagar.com

স্বামীকে তুই পুছ করে দেখ, মোর কোনো দোষ আছিল কি-না।

দোষ তো অবশ্যই আছে ঘটক নানা। এমন ঘটকালি করলেন যে, শেষ পর্যন্ত মুক্তাকে হাইজ্যাক করতে হইল। আজ আপনার আপোসের ঘটকালি যদি ফেল করে, নানাশ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে যদি অপমান হই, আপনাকে আমি ছাড়ব না নানা।

এবাদের ঠাট্টার জবাবে গুড়াতি ঘটক গভীর দুঃখের সঙ্গে জানায়, আল্লাহ্ যদি তোর হাতে মোর মরণ লেখিয়া থুইছে, মানুষ কি আর মোকে বাঁচাইতে পারবে ? চল দাদা, তাড়াতাড়ি। আপোস না হইলে মোকে আইজ খুন করি ফেলায় আসিস তুই।

অতপর নানাশ্বশুরবাড়ি ওকড়াবাড়ি যাওয়ার জন্য এবাদ বেশ উৎসাহ নিয়ে জামাই-সাজ সাজে। মোটর সাইকেলখানা বাইরে বের করে। গুড়াতি ঘটককে পেছনে বসিয়ে স্টার্ট নেওয়ার পর মাকে চেঁচিয়ে ডাকে এবাদ ।

ও মা, প্রথম নানাশ্বশুরবাড়ি যাইতেছি। খালি হাতে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

জান্নাতি পরামর্শ দেয়, ছি ছি! খালি হাতে কেমন যায়। বাজার হইতে অন্তত দুই সের মিষ্টি কিনি নিয়া যাইস।

কিন্তু কঠোর গলায় বাধা দেয় মুক্তা, না। নানাজি কিংবা মামা নিজে এসে যখন তোমাকে দাওয়াত দিতে আসবে, তখন মিষ্টি নিয়ে যেও। আজ শুধু চুপচাপ শুনে আসো— নানাজি কী বলে ?

মাথা দুলিয়ে এবাদ সাইকেল চালিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকার কেটে এবাদের মোটরসাইকেলের ছুটে চলা আলো উঠানে দাঁড়িয়েও অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পায় মুক্তা ও তার শাশুড়ি। আওয়াজ এবং আলোটা মিলিয়ে যাওয়ার পর মুক্তা শাশুড়িকে বলে, আমার সন্দেহ হইতেছে মা। আমার নানা-মামারা আপনার ছেলেকে অপমানও করে যদি ?

করুক মা। লাথি-গুড়ি দিয়াও যদি ডাকাইতটাকে জামাই হিসেবে মেনে নেয়, সেটাই হইবে ওর বড় কপাল।

রাতের খাওয়া শেষ হলে মুক্তা তার শূন্য ঘরে একা টেবিলে আয়না রেখে লণ্ঠনের আলোয় নিজেকে দেখে। এ বাড়িতে আসার পর আজই প্রথম সাজতে ইচ্ছে করছে তার। এবাদ নানার বাড়ি থেকে জামাই আদর পেয়ে ফিরে এলে রাজকন্যা এবং রাজত্ব লাভের আনন্দে ডাকাতটা পাগল হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। শরীর খারাপ থাকায় তিন রাত অতি কষ্টে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে মুক্তা। আজ যদি অপমানিত হয়েও ফিরে আসে, মুক্তা ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে তার সমস্ত জ্বালা। আত্মীয় সমাজ দূরে ঠেলে দিয়ে এবাদ ডাকাতের বুকে আশ্রয় নিয়ে সুখী হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবে মুক্তা।

এবাদ ঘরে না থাকলেও মুক্তা ঘরে একাকী হওয়ার সুযোগ পায় কম। পান হাতে ঘরে এসে পেয়ারি ভাবির ভাবনায় ঢুকে পড়তে চায় যেন।

এত রাইতে সাজগোজ কেনে গো ?

যা তো, সোহরাব ঘুমিয়ে গেছে কিনা দেখ। ওর বই খাতা ও ঘরে নিয়ে যা। আর তোর ভাইজানের জন্য এক খিলি পান এনে রাখ।

ননদকে তাড়িয়ে দিয়ে মুক্তা সুটকেস খোলে। ক্রীম-পাউডার-লিপস্টিক-নেইলপলিশ ছাড়াও

www.pathagar.com

এবাদ দামী সেন্টের শিশি এনেছে একটা। পেয়ারি এর মধ্যে কী কী সরিয়েছে সেই জানে। মুক্তা মুখে ক্রীম ঘষে। চোরের মতো সতর্কতায় বুকে পেটে সেন্ট স্প্রে করে খানিকটা।

সোহ্‌রাবকে নিয়ে কোবাদ ঘরে আসে। ও ভাবি, সোহ্‌রাব বলে আজ আপনার সঙ্গে থাকবে।

চাচাও থাকব। তোমার লগে গল্প করব কইল।

এই বান্দর, আমি তাই কইছি ?

মুক্তা কোবাদের লজ্জা দেখে হাসে।

তোর আসলে মেয়ে হওয়া উচিত ছিল। তোর এতো শরম কেন রে ? আমি বাঘ না ভালুক। একা আমার ঘরে গল্প করতে আসলে আমি তোকে গিলে খাব ?

কোবাদ আরো লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বলে, না মানে লোকে কী ভাববে ?

লোক ? কোন লোক ?

ঠিক এই সময়ে দূরে কোথাও, একসঙ্গে অনেক মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার ধ্বনি কানে আসে মুক্তার। কান পেতে কোবাদকে জিজ্ঞেস করে সে, কীসের আওয়াজ রে ? কারা চেঁচায় ?

কোবাদ মুক্তার দিকে তাকিয়ে কেবল মুক্তাকে দেখে এবং আওয়াজের বদলে কান দিয়েও মুক্তার শরীর থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত গন্ধটা ভেতরে ঢোকে তার।

আঙিনা থেকে শাশুড়ির চড়া কণ্ঠে একই প্রশ্ন শোনা যায়, কোনো গ্রাম আগুন লাগল নাকি বাহে ? কীসের চিল্লাহাল্লা ?

পাশের বাড়ি থেকে চেঁচিয়ে জানতে চায় একজন, কোণ্ঠে ডাকাইত পড়লো বাহে ?

কোবাদের পিছু পিছু মুক্তাও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ির সবাই খুলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকায়। দূরবর্তী ধ্বনির উৎস ও বৈশিষ্ট্য বুঝতে পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে তাদের। রাতের নিস্তব্ধতা চিরে ছুটে আসা চিৎকার ধ্বনি এর মধ্যে ঠাকুরপাড়ার অনেক মানুষের ঘুম ভাঙিয়েছে। চিৎকার করে আদিগন্ত অন্ধকারে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় কেউ কেউ, কে বাহে। কাঁয় বাহে-এ-এ-এ...

গ্রামের কোনো বাড়িতে আগুন জ্বললে কয়েক মাইল দূরে থেকেও সেই সর্বনাশের রঙ চোখে পড়ে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার জন্য এবং নিজেদেরকে সংগঠিত করার জন্য গলা ছেড়ে চেচায়— বড়শিওয়ালা জাগো বাহে—

চারদিকে এরকম চিৎকার হইচই শুনে নিজেদের বাড়িতে ডাকাত-পড়ার আতঙ্কময় স্মৃতি মনে পড়ে মুক্তার। সেও এবার চিৎকার করে জানতে চায়, ও মা, আপনার বেটা এখনও আসে না কেন ?

প্রতিবেশী কয়েকজন ছুটে এসে এবাদের খোঁজ করে। এবং এর মিনিট খানেক পরই অচেনা কণ্ঠে গ্রামকাঁপানো চিৎকার কানে আসে সবার, হামার এবাদ ডাকাইতকে মারি ফেলাইছে বাহে। এবাদ ডাকাইত খতম হইছে—

জান্নাতি প্রথম চেঁচিয়ে আল্লা-মাবুদকে স্মরণ ও সঙ্গী করে একা অন্ধকারে ছুটে অদৃশ্য হওয়ার পর, কোবাদ প্রতিবেশী লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হুল্লোড় আওয়াজ লক্ষ করে সতর্ক পায়ে এগোতে থাকে।

www.pathagar.com

মুক্তা এক সময়ে টের পায়, তার পাশে কেউ নেই। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছে সে। আকাশে বাতাসে এবাদ ডাকাতের মৃত্যু-ঘোষণা শুনে শরীরে কাঁপন জাগে তার। কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢোকে সে। বিছানায় পড়ে বালিশ আঁকড়ে ধরেও তার মনে হয়, ভয়ঙ্কর এক অতল গহ্বরে বুঝি এক্ষুণি পড়ে যাবে সে।

এবাদ ডাকাত বাড়িতে এলে তার মা ও বোনের কণ্ঠচেরা শোকের মাতম বাড়ির আঙিনায় নতুন করে ভিড় রচনা করে। হামার এবাদ সোনাকে কাঁয় মারি ফেলাইল বাহে... কী দোষে মোর বেটা ভাল হয়েও খুন হইল রে... জান্নাতির এরকম সুরেলা ক্রন্দনধ্বনির পাশে পুরুষ কণ্ঠে ধমক— কান্নাকাটি করেন না বাহে। মরে নাই এলাও। ...বুক নড়ে... ঠ্যাং নড়ে... বাঁচি আছে এলাও... পুলিশ আসলে মড়া এবাদ ডাকাইতকে নিয়া যাবে... জোরে চিল্লাহাল্লা করলে পাবলিক আসি বাড়িতে আগুন দেবে... কোন শালা পাবলিকের এতো সাহস...

মুক্তা বিছানা থেকে নেমে বিস্রস্ত শাড়ির আচল কোমরে জড়িয়ে নেয় প্রথমে। উঠানের ভিড় হটিয়ে স্বামীর একান্ত পাশে এসে দাঁড়ায়। এবাদকে আঙিনার মাঝখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে। উপরের আকাশে অজস্র নক্ষত্র, আর নিচে তিনজনের হাতে লণ্ঠন ও কুপির আলো সত্ত্বেও স্বামীর পরিচিত মুখ চেহারা খুঁজে পায় না মুক্তা। সারা মুখে রক্ত। চোখ দু'টি চোখের জায়গায় নেই। সেখানে গলিত লালমাংস পীত রঙের পানি গড়িয়ে পড়ছে। নতুন সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরে গিয়েছিল এবাদ। ছিড়েফেড়ে লোপাট হয়েছে অনেক অংশ, যেটুকু আছে তাও রক্ত-কাদা-ময়লায় একাকার।

মুক্তার চোখ থেকে এক বিন্দু অশ্রু ঝরে না। কণ্ঠ থেকে কান্না নয়, বরং হিংস্র জিজ্ঞাসা সবাইকে কাঁপিয়ে দেয়— কে আমার স্বামীর এমন দশা করল ? কারা আমার স্বামীকে এভাবে মেরেছে ?

ভিড়ের নানা কণ্ঠে জবাব আসে, একজন নয়, শত শত মানুষ। এবাদকে মারার জন্য ওকড়াবাড়ি যাওয়ার পথে পাকুড় গাছ তলায় ঘাপটি মেরে ছিল। এবাদের মোটর সাইকেল কেড়ে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর বিলের পানিতে ফেলে দিয়েছে। লাঠি দিয়ে এবাদের মাথায় আঘাত করেছে। তারপর চোখে এসিড ঢেলে দিয়েছে। তারপর এবাদকে পাকুড় গাছ তলায় শুইয়ে দিয়ে দশসেরী ওজনের পাথর দিয়ে হাত ও পা ভেঙে দিয়েছে। দেখার জন্য দশ গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছিল পাকুড় গাছ তলায়।

চারদিকের কোলাহল ছাপিয়ে এবাদের যন্ত্রণাবিকৃত কণ্ঠ মুক্তাই প্রথম শুনতে পায়, মুক্তা আমাকে বাঁচাও। গরুগাড়িতে করে আমাকে জলদি টাউনের হাসপাতালে নিয়ে চলো... মুক্তা... ও মা... মা রে ! আমাকে বাঁচান বাহে...

সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে এবাদ এভাবে তার বাঁচার পথ নির্দেশ করে আতঙ্ক-উত্তেজনায় বিহ্বল ভিড়কে নেতৃত্ব দেয় যেন। নির্দেশ পালনের জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে মানুষগুলি।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে এবাদের বাড়ির খুলিতে ছইঘেরা গরুগাড়ি আসে। গরু দু'টির গলায় ঘন্টা বাঁধা। বাজারে ওষুধের দোকান করে— এমন একজন ডাক্তারও আসে কোবাদের সাইকেলে চড়ে। ডাক্তারের কাছে ব্যান্ডেজ ছিল না। মুক্তার নতুন শাড়ির ত্যানা নিয়ে সেই ডাক্তার উপস্থিত দু'জন কম্পাউন্ডারের সাহায্য নিয়ে এবাদের চোখ ও অন্যান্য ক্ষতস্থান বেঁধে

www.pathagar.com

দেয়। একটি ইনজেকশনও দেয় সে।

এবাদকে লোকজন ধরে গরু গাড়িতে তোলার পর মুক্তা প্রথম গাড়িতে গিয়ে ওঠে। ছইয়ের দু'পাশের খোলা মুখ আলগা শাড়ি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। কোবাদ প্রথমে ছইয়ের বাইরে গাড়োয়ানের পিছে বসলে, লোকজন তাকেও ভেতরে ভাইয়ের পাশে বসার পরামর্শ দেয়। গাড়োয়নাকে সতর্ক করে দেয়া হয়, গাড়িতে এবাদ ডাকাত আছে— এমন কথা যেন ভুলেও রাস্তার লোকজনকে বলা না হয়। বড় রাস্তা পর্যন্ত এবাদের মা, বোন, ছেলে ও প্রতিবেশী লোকজন গাড়ির পিছে পিছে হাঁটতে থাকে। ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় উঠে গাড়িখানা শহরমুখী হলে, পুরো গাড়ি ও গাড়ির মানুষদের রক্ষার দায়িত্ব আল্লার ওপর ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফেরা ছাড়া কিছু করার থাকে না তাদের। জান্নাতি রাস্তার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছিল। তাকে কয়েকজন ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

মুমূর্ষু স্বামীকে নিয়ে শহরযাত্রার শুরুতে বেহুলার ভাসান মনে পড়ে মুক্তার। সাপে কাটা মৃত স্বামীকে নিয়ে সতী বেহুলা ভেলায় চড়ে ভেসে গিয়েছিল। দীর্ঘ যাত্রা শেষে দেবতাদের দরবারে পৌঁছেছিল বেহুলা। নেচে গেয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ফিরে পেয়েছিল স্বামীর জীবন। মুক্তাও তেমনি মরাণাপন্ন স্বামীকে নিয়ে অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে। হাসপাতালে পৌঁছে সে ডাক্তারদের পা ধরে কাঁদবে, গায়ের অলঙ্কার বেচে, পরিচিতজনদের কাছে ঋণ এবং প্রয়োজনে ভিক্ষে করে যোগাড় করবে চিকিৎসার খরচ। স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার সংকল্পই এখন বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

মুক্তার দায়িত্ববোধ রকেটের বেগে চলতে চায়, কিন্তু গরুগাড়ি চলে তার নিজস্ব গতিতে। তাদের গ্রাম থেকে জেলা-শহর প্রায় বিশ মাইল দূরে। বাড়ি থেকে রিকসায় বা সাইকেলে পাঁচ মাইল দূরে থানা সদরে প্রথম, তারপর সেখান থেকে বাস বা ট্রেনে চেপে মুক্তা শহরে যাতায়াত করত সব সময়। কিন্তু গরুগাড়িতে চড়ে যায় নি কখনও। গাঁয়ের মেয়ে হলেও গরু গাড়ির টানা ভ্রমণ পছন্দ নয় তার, চড়েও নি খুব একটা। গরুগাড়িতে উঠলে তার মাথা ঘোরে, বিরক্তি লাগে। কিন্তু এই ঘোর মফস্বলে মুমূর্ষু স্বামীর প্রাণ রক্ষার অভিযানে গরুর গাড়িই একমাত্র সহজলভ্য এম্বুলেন্স।

রিকসা ও মোটর সাইকেল পাওয়া যেত, কিন্তু তাতে বসে থাকারও সামর্থ্য হারিয়েছে মুক্তার জবরদস্ত পুরুষটি। বাসে বা ট্রেনে তাকে টেনে তোলা সম্ভব হয়তো, কিন্তু শোয়ানো যাবে না। মুক্তার ডাকাত স্বামীকে যারা মারধর করেছে, কবরে শোয়ানোর উপযোগী করার চেষ্টায় ক্রটি করে নি তারা। কবরে শোয়ার নিয়ত নিয়েই হয়তোবা এবাদের রক্তাক্ত লাশ বাড়িতে বয়ে এনেছিল এবাদের স্বপক্ষের লোকজন। কিন্তু বিকৃত বীভৎস শরীরে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেয়ে, তার বাঁচার আকুতিতে সাড়া দিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে নি কেউ।

দীর্ঘ যাত্রাকে কিছুটা আরামপ্রদ করে তোলার জন্য গাড়ির পাটাতনে খড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। খড়ের গদির ওপর কাঁথা বালিশ। ছইয়ের ভেতরে শায়িত এবাদ ডাকাত কিংবা তার বউকে কেউ যাতে চিনতে না পারে, সেজন্য ছইয়ের দু'দিকের খোলামুখ শাড়ি কাপড়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। কোবাদ যাত্রার শুরুতে গাড়োয়ানের পিছনে বসেছিল, কিন্তু তাকেও ভেতরে ঢুকতে বাধ্য করেছে লোকজন। কারণ পথে তাকে দেখেও এবাদ ডাকাতের বেঁচে ওঠার চেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে পুলিশ কিংবা স্থানীয় শত্রুরা। অপহরণ করতে পারে ডাকাতের যুবতী স্ত্রী মুক্তাকেও। বাইরের শত্রুর ভয় এবং ভেতরে আহত ভাই ও শোকার্ত ভাবিকে আগলে রাখার দায়িত্ব নিয়ে কোবাদ ছইয়ের অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে আছে, মুক্তা

www.pathagar.com

তাকে দেখতে পায় না।

কবরের মতো নিঝুম অন্ধকারে মুক্তা হাঁটু মুড়ে বসে, ছইয়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ধ্যান করছে যেন। গাড়ি গাঁয়ের সীমানা পার না হতেই তার মন শহর হাসপাতালে পৌঁছে যায়, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে, স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে যা যা করা দরকার, তার সবই অতি দ্রুততায় সম্পন্ন করে ফেলে মুক্তা, কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে আধা মাইল পথও অতিক্রম করতে পারে না। যতই ছটফট করুক সে, সকালের আগে শহরে পৌঁছতে পারবে না তারা। তার মানে সারা রাত গাড়িতে বসে থাকতে হবে। ততক্ষণ এবাদ কি বেঁচে থাকবে ? এই প্রশ্ন মনে যে ত্রাস ও হতাশা জাগায় তার ভার সইতে না পেরে মুক্তা গাড়ির গতিতে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে মাথা ঢলে পড়ার শব্দের সঙ্গে মুখ ফস্কে ধ্বনি বেরয়— হায় খোদা!

কী হইল ভাবি ? শক্ত হয়ে বসেন। আপনি ভেঙে পড়লে আমি আর সহ্য করতে পারব না।

চাপা গলায় ভাবিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেবর নিজেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কান্নার আওয়াজ গলা ও নাক দিয়েও বেরয়।

ছইয়ের বাইরে গাড়োয়ান লোকটি মাঝে মধ্যে কথা বলে তার বলদ দু'টিকে জোরে চলার উৎসাহ দিচ্ছিল। 'হুট হাট' বলে কড়া গলায় ধমক, কখনওবা পেন্টির আঘাত করছিল, গরু শাসনের অনুরূপ মেজাজ নিয়ে যাত্রীদের সতর্ক করে, খবরদার বাহে। কাঁদাকাটি করলে বিপদ বাড়বে। মনে মনে খালি আল্লাক ডাকো। অতঃপর বলদ দুটিকেও আল্লার নামে জোরে হাঁটার মিনতি জানাতে থাকে সে।

দেবরের ফোঁপানো কান্নার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পরও একান্ত পাশে তার অস্তিত্ব অনুমান করে মুক্তা জড়সড় হয়ে বসে। পা মেলে বসার উপায় নেই। তাতে স্বামীর শরীরে আঘাত লাগতে পারে। অচেতন মানুষটির জ্ঞান ফেরার লক্ষণ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ বোঝার জন্য চোখ-কান মেলে বসে থাকে মুক্তা। কিন্তু কাঁধের কাছে কোবাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলার ফোঁস ফোঁস ধ্বনি শুনতে পায় কেবল।

মুক্তা জানে, কোবাদ ভাইয়ের বিপরীত স্বভাবের— যাকে বলে খুবই ভালো ছেলে। ভাইকে ভয় ভক্তি করে খুব। সে কারণে সমবয়সী হয়েও ভাবির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তুলনাহীন। মুক্তা ভেঙে পড়লে লক্ষণের মতো দেবরটি তার ডুকরে কেঁদে উঠবে সন্দেহ নেই। আর সে জন্যে মুক্তা নিজেকে শক্ত রাখতে পাথরের মতো স্থির ও ধৈর্যশীল থাকতে চায় শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কাঁচা রাস্তায় গরুগাড়িখানা নিজেই বেশ দোল খায়। চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের ছই দোলার গিড়গিড় আওয়াজ, থেকে থেকে গাড়োয়ানের হুটহাট ও গরু দুটির গলায় বাঁধা ঘন্টার টুংটাং ধ্বনি স্থির শরীরে এক ধরনের অস্থিরতা জাগায়। গাড়ির দুলুনিতে এবাদের আহত শরীরে কি যন্ত্রণা বাড়ছে ? জ্ঞান হারালে কি মানুষের যন্ত্রণাবোধও লোপ পায় ? গাড়িতে তোলার আগে বেহুঁশ অবস্থা থেকেও হঠাৎ তীক্ষ্ণ 'উহরে' আর্তনাদ তুলেছিল, বিকৃত কণ্ঠে মুক্তার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কথাও বলেছিল, কিন্তু গাড়িতে ওঠানোর পর থেকে অনেকক্ষণ হলো তার শরীরে সাড়া নেই। মুক্তা চাপা কণ্ঠে দেবরকে ডাকে।

এই কোবাদ, দেখ তো তোর ভাইজানের নাড়িটা টিপে দেখ।

কোবাদ অন্ধকারে নড়ে চড়ে বসে। তার হাঁটু মুক্তার এক হাতে এবং তার একটি হাত মুক্তার পা ছোঁয়। অন্ধকারে কোবাদ ভাইয়ের হাত খোঁজে। মুক্তা শায়িত স্বামীর পায়ের দিকে, তার

www.pathagar.com

আহত পা বাঁচিয়ে সরে বসার চেষ্টা করে। কয়েক মুহূর্ত বাদে কোবাদ চাপা স্বরে আর্তনাদ করে, ও ভাবি, ভাইজানের নাড়ি নাই।

দেবরের আবিষ্কার প্রত্যাখ্যান করে কান্না লুকানোর দৃঢ়তায় মুক্তা উচ্চারণ করে, নাহ। আমার এবাদ ডাকাতকে মরতে দেব না আমি। তারপর অন্ধকার হাতড়ে স্বামীর অবশ হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে, মুঠোর মধ্যে হাতের উষ্ণ রক্তপ্রবাহ অনুভব করে অধিকতর সরব গলায় ঘোষণা করে মুক্তা, এই তো নাড়ি চলছে।

আলতো করে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে কোবাদ ফিসফিসিয়ে জবাব দেয়, এই খানা তো আমার হাত।

বাইরে থেকে গাড়োয়ান মাথা ঘুরিয়ে জানতে চায়, কী হইল বাহে, মরি গেছে? মরা মানুষকে হাসপাতালে নিয়া আর লাভ কী?

মুক্তা লোকটিকে নির্দেশ দেয়— না, না, আপনি তাড়াতাড়ি চালান, আরো জোরে।

গাড়িওয়ালা আরো চড়া গলায় এবং ঘনঘন তার বলদ দুটিকে উৎসাহ ও উত্তেজনা যোগায়। ফলে গরুও যেন ঘোড়া হতে চায়। গাড়ি প্রবল নড়ে। গাড়োয়ানের হাঁকডাক, ঘন্টার টুংটাং, ছইয়ের দুলুনি ও চাকার গিড়গিড় আওয়াজ প্রবল হয়ে ওঠে। গাড়ির গতি বৃদ্ধির ফলে মুক্তার আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় যেন। নিজেকে সিদ্ধান্ত শোনায়, মৃত স্বামীকে নিয়ে ঘরে ফিরবে না সে। পথে কিংবা হাসপাতালে এবাদ যদি মরেও যায়, একা গ্রামে ফিরবে না আর। এবাদশূন্য গ্রামে আর কখনও মুখ দেখাবে না মুক্তা।

কোবাদের চাপা কান্না আবারও প্রবল হতে থাকে। বেসামাল কান্না নিয়ে ভাবির গায়ে ঢলে পড়ে সে এবং ভাবির গলা জড়িয়ে ধরে কান্নার উচ্ছ্বাসে বলতে থাকে, ভাইজান মরে গেলে আমাদের কী হবে ভাবি? আমাদের কে দেখবে?

ছইয়ের অবলম্বন পিঠ থেকে আলগা হওয়ায় মুক্তাও দেবরের গায়ে হেলান দিতে বাধ্য হয় এবং তার মাথায় সান্ত্বনার হাত রেখে নিজেও কান্না চাপার ব্যর্থ চেষ্টায় বলে, কাঁদিস না। মরবে না, মরতে দেব না তোর ভাইকে।

না মরলেও ভাইজান আর কোনোদিন চোখে দেখবে না ভাবি। হারামজাদারা চোখে এসিড ঢেলে দিয়ে ভাইজানকে অন্ধ করে দিয়েছে, হাত-পা ভেঙে দিয়েছে।

চুপ কর।

কোবাদ তবু চুপ করে না, মুক্তাকে ছেড়েও দেয় না। ফোঁপানো কান্নার আবেগে, কানে কানে প্রবল ফিসফিস স্বরে বলে, ভাবি গো, ভাইজানের কিছু হলে আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আপনি গেলে আমিও বাঁচব না। আপনি না থাকলে আমিও ও-বাড়িতে থাকতে পারব না।

মুক্তা জবাব দেয় না। অবস্থানের কারণে শরীরে অস্বস্তিবোধ জাগে। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে দেবরকে সরিয়ে দিতে পারে না, তাতে হয়তো বেসামাল ছেলেটি ভুলে আহত স্বামীর ক্ষতস্থানে আঘাত দিয়ে বসবে। নিজেও ব্যবধান বাড়াতে চটজলদি সরে আসতে পারে না মুক্তা, তাতে হয়তো মৃত কিংবা অর্ধমৃত স্বামীর দেহের ছোঁয়া লাগবে। এক হয়, কোবাদকে ধমক দিয়ে মুক্তা ছইয়ের বাইরে গাড়োয়ানের পিছে পাঠাতে পারে। কিন্তু এবাদ যদি সত্যই মরে গিয়ে থাকে? কবরের মতো দম বন্ধকরা অন্ধকারে একটা মৃত মানুষের পাশে কী করে

www.pathagar.com

সারা রাত একা বসে থাকবে মুক্তা ? ধাক্কা দেয়ার বদলে দেবরের কাঁধে মাথা রেখে মুক্তাও এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। কোবাদ তাকে পাল্টা সান্ত্বনা দেয়, কেঁদো না ভাবি। প্লীজ। শান্ত হও। শক্ত হও। আমি তো আছি।

আমার খুব ভয় করছে রে ? আমার কী হবে ?

আমি আছি ভাবি। আমি সারাজীবন তোমার পাশে থাকব।

দেখ তো আবার, তোর ভাইজানের জ্ঞান ফিরল কিনা ? বুকে হাত দিয়ে দেখ। সাবধান, চোখের কাছে হাত নিস না।

কোবাদ ভাবিকে ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে ভাইয়ের শরীর ছোঁয়। মুক্তা তার চাপা আর্তনাদ শুনতে পায় শুধু, কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন ভাইজানের ? হায় আল্লা শরীর একদম বরফের মতো হিম হয়ে গেছে!

আতঙ্কিত কোবাদ আগের অবস্থানে ফিরে এসে কম্পিত কণ্ঠে জানতে চায় , গাড়ি ফেরাতে বলব ভাবি ?

মুক্তা দৃঢ় কণ্ঠে সিদ্ধান্ত দেয়, নাহ।

কোবাদ আগের চেয়েও প্রবল বেগে মুক্তাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে কান্না লুকায়। মুক্তার পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরেছে। মাথাটাও খুব ঘুরছে। কোবাদের হাঁটুতে ভর দিয়ে সে পা খানিকটা সোজা করার চেষ্টা করে। ভাবির অস্বস্তিকর নড়াচড়া অনুভব করে কোবাদ গলায় কান্নার রেশ নিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হলো ভাবি ?

আমার মাথা ঘুরছে।

ঠিক আছে তোমার মাথাটা আমার বুকে রাখো।

পা ছড়াতে গিয়ে মুক্তার মাথা কোবাদের বুকে হেলে পড়ে। মাথাটা নিজের বুকে টেনে নেয় কোবাদ। মুখের ওপর উষ্ণ নিঃশ্বাস পতনের আঘাতে চমকে উঠে মুক্তা জানতে চায়, নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেছিস। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে না ?

কোবাদ একইরকম চাপা স্বরে জবাব দেয়, কিছু বোঝা যায় না ভাবি। গা একদম ঠাণ্ডা।

কীরকম একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে কোত্থেকে ?

মানুষ মরলে পচা গন্ধ হয়।

আমার ভীষণ ভয় করছে।

আমারও।

সান্ত্বনা দিতে কিংবা সান্ত্বনা পেতেও হতে পারে, মুক্তার ভীরু লাজুক দেবর ভাবির একটি হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। হাতে উষ্ণ চাপ ক্রমে কঠিন হয়ে উঠলে মুক্তার চকিতে মনে পড়ে, বাড়ি থেকে ছিনিয়ে আনার সময় তার ডাকাত প্রেমিক এভাবে শক্ত মুঠোয় হাতখানা চেপে ধরেছিল। উষ্ণ নিঃশ্বাস পতন গলার কাছে নেমে এলে মুক্তার কানে বাজে কাঁপা বিকৃত স্বর, তোমার গায়ে কী সুন্দর সুবাস! মুক্তার বুকের ঘ্রাণ উষ্ণতা লুট করার জন্য অদৃশ্য একটি হাত তার জামার ভেতরে ঢুকতে চাইলে ভয়ে কেঁপে ওঠে শরীর। তার ডাকাত স্বামী ভূত হয়ে কি এভাবে আক্রমণ করছে মুক্তাকে ? প্রথমে 'উহুম, নাহ নাহ' করে মুক্তা বাধা দেয়, কোবাদের চুম্বন ও আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে, কান্না থামে না তার।

www.pathagar.com

গাড়োয়ান বাইরে থেকে মাথা ঘুরিয়ে আবার জানতে চায়, কী হইল বাহে ? মরি গেছে ?

ছইয়ের বাইরে থেকে দেবরের কান্না-ভেজা জবাব শুনতে পায় মুক্তা, ভাবি কাঁদতেছে। কোনো সান্ত্বনাই আর মানতেছে না। মরুক আর বাঁচুক, ভাইজানকে হাসপাতালে নেবই।

আরো ভালো করে কাঁদার জন্য মুক্তা স্বামীর অচেতন শরীরের পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে। ছইয়ের ভেতরে তার কান্নায় ভাগ বসানোর মতো কোনো স্থান ফাঁকা থাকে না আর।

এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলে মুক্তা যখন গাড়িতে উঠে বসে, ছইয়ের ভেতরের অন্ধকার তখন ফিকে হয়ে এসেছে। সামানের পর্দাটি দিয়ে ভোরের আলোয় গাড়োয়ান পরীক্ষা করছে অচেতন এবাদকে। গাড়ি এখন পাকা রাস্তার ওপর দাঁড়ানো। তার মানে শহর আর দূরে নয়।

আল্লার অশেষ রহম। মরে নাই এখনও। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেওয়া লাগবে।

ভোরের নির্জন পাকা সড়কে গাড়িখানা এবার দ্বিগুণ গতিতে ছুটে চলে। গরুর গলার ঘন্টা ধ্বনি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির ঘন্টার মতো বাজতে থাকে। দিনের আলোয় আহত স্বামীকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে মুক্তা। গাড়িতে তোলার আগে তার শাড়ি কেটে চোখমুখ ব্যান্ডেজ করা হয়েছিল। গলিত চোখের রক্ত পানিতে ব্যান্ডেজ ভিজে গেছে। একটি পা ও হাত কখন কীভাবে ফুলে এমন ঢোল হয়েছে, একান্ত পাশে বসেও দেখতে পায় নি সে। গায়ের সাদা গেঞ্জিতে লাল-কালো-হলুদ দাগ। গোঁফের প্রান্ত ঠোঁটের ভেতর ঢুকে আছে। মুক্তা খুব অলতো করে নিজের হাতখানা স্বামীর বুকে রাখে।

সাত রাস্তার মোড়ে এসে গাড়ি থামায় গাড়োয়ান। শহরের ভেতরে হাসপাতালে গরুর গাড়ি ঢুকতে দেবে না পুলিশ। গাড়োয়ানের পরামর্শ মতো একটি ঠেলা গাড়ি ভাড়া করার জন্য কোবাদ ছোটাছুটি করে। গাড়ি থেকে নেমে মুক্তা রাস্তার মোড়ে কিছুক্ষণ দঁড়িয়ে থেকে শরীরের ভেতরে প্রাকৃতিক চাপ অনুভব করে। মনে হয়, এক্ষুণি নির্জনে নিজেকে একটুখানি আড়াল করতে না পারলে তার অসুস্থতা ও লজ্জা রাস্তার লোকজন দেখে ফেলবে।

কোবাদ ঠেলাগাড়ি নিয়ে এলে মুমূর্ষু এবাদকে ছইয়ের ভেতর থেকে নামিয়ে উদম ঠেলাগাড়ির ওপর শোয়ানো হয়। কোবাদ ভাইয়ের পাশে বসে ভাবিকেও আহ্বান জানায়, ওঠেন ভাবি। এখন আমাদের লজ্জা শরম করলে চলবে না।

মুক্তা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, তুই হাসপাতালে নিয়ে যা। আমি রিকসায় যাচ্ছি।

রিকসায় উঠে মুক্তা হাসপাতালে যাওয়ার বদলে, রিকসাওয়ালাকে তার ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবীর বাসার ঠিকানায় যেতে বলে।

সকালবেলা শাড়ি পরিহিতা মুক্তার বিস্রস্ত চেহারা দেখে তামান্না চমকে ওঠে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন তার কলেজে না আসা বা হোস্টেলে না ওঠার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। মুক্তাও তামান্নাকে কিছু না জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কোথা থেকে এলি, কার সঙ্গে এলি— ইত্যাদি প্রশ্ন শুনে ম্লান হেসে জবাব দেয়, আমার খুব বিপদ। তুই আমাকে কিছু টাকা ধার দে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। আমি ততক্ষণে হাতমুখটা একটু ধুই।

বাথরুম থেকে দেহমন গোছগাছ করে বেরুনোর পর মুক্তা যেমন সুস্থ বোধ করে, তেমনি

www.pathagar.com

স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাকে দেখে শুধু তামান্না নয়, তার বাবা-মায়েরও কৌতূহল নগ্ন হয়ে পড়ে। মুক্তাকে ঘিরে দাঁড়ায় সবাই। দেড় মাস আগে এবাদ ডাকাত মুক্তাকে বাড়ি থেকে কিডন্যাপ করে বিয়ে করেছে। সুখবরটা গ্রাম তোলপাড় করে শহরে-মুক্তার পরিচিত মহলেও ছড়িয়েছে দেখে সে খুব অবাক হয় না। তামান্নার বাবা উকিল। মুক্তার বাবার পরিচিত। এবাদের বিরুদ্ধে কেস করার বিষয়ে পরামর্শ নেয়ার জন্য উকিল বন্ধুর কাছে এসে মুক্তার বাবাই বলে গেছে সব। তাছাড়া দুর্ধর্ষ এবাদ ডাকাতের কাণ্ড কীর্তির খবর এ শহরের অনেকেই জানে।

মুক্তা তার ডাকাত স্বামীর বর্তমান দশার করুণ কাহিনী সংক্ষেপে জানিয়ে কান্নাকাতর কণ্ঠে দাবি জানায়, খালুজান, আমাকে এই বিপদে সাহায্য করতে হবে।

নিশ্চয় করব মা। তোমাকে সাহায্য না করলে কাকে করব ? কিন্তু তোমার এখন হাসপাতালে যাওয়া ঠিক হবে না।

কেন ?

ঘটনার সাথে তুমিও জড়িত। আরো খারাপ কিছু ঘটতে পারে। আমি তোমার আব্বাকে খবর দিচ্ছি। সে আসুক। তারপর তোমার জন্য যা ভাল হয় আমরা তাই করব।

কিন্তু আমার এখনই যাওয়া উচিত। ঠিক মতো চিকিৎসা না হলে ও বাঁচবে না।

ডাকাতটা মরে গেলে তুমি গিয়ে তো আর বাঁচাতে পারবে না। আর বেঁচে থাকলে চিকিৎসা হবে। সঙ্গে তার ভাই আছে বললে না ?

মুক্তাকে তার বান্ধবী নিজের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে, হাত-পা বেঁধে তোকে আমার ঘরে লুকিয়ে রাখব। কোনো অবস্থাতেই ঐ ডাকাতটার কাছে এখন যেতে দেব না তোকে।

ডাকাত হলেও সে তো আমার স্বামী। মানুষটা মরে যাচ্ছে আর আমি তোদের বাড়িতে পালিয়ে থাকব! আমার ভীষণ খারাপ লাগছে রে তামান্না।

বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে মুক্তা আবার কাঁদতে শুরু করেল তামান্না তাকে সান্ত্বনা দেয়, কী আর করবি বল! নিজেকে বাঁচাতে হলে মাঝে মাঝে পালিয়ে থাকতে হয়।

উপসংহার

এবাদ ডাকাতের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে ১৯৮৩ সালের বসন্তকালে। ততোদিনে জেনারেল জিয়ার ভোটে জিতে প্রেসিডেন্ট হওয়া, দল গড়া, বিদ্রোহী সেনাদের হাতে শাহাদাত বরণ এবং ক্ষমতা থেকে তার দলকে উচ্ছেদকরণের ঘটনাগুলি ঘটে গেছে এবং জেনারেল এরশাদের শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা দখলের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। সামরিক শাসন থেকে দেশেকে মুক্তি দিয়ে নিজেই গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য জেনারেল দলবল বাড়াতে শুরু করেছেন।

অন্যদিকে দলবল থেকে বিচ্ছিন্ন, নিরস্ত্র এবাদ একা ও চুপচাপ সেদিন বসে ছিল হাটখোলার একটি চায়ের দোকানে। চোখের সানগ্লাসটি এতো কালো যে, ভেতরে চোখ আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। তবে টেবিলের ওপর একটি চিকন বাঁশের লাঠি ছিল। চেয়ারের উপর

www.pathagar.com

পা তুলে দিয়ে, চশমার কালো চোখ দুটি বাইরে মেলে রেখে, দাঁত দিয়ে ডান ঠোঁটের গোঁফ কাটছিল এবাদ।

স্বাধীনতার পর এলাকার সবচেয়ে কুখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিটির সঙ্গে সেটাই ছিল আমার প্রথম সাক্ষাত। এর আগে গ্রামে যতবার এসেছি, এবাদকে সরাসরি চোখে দেখার সুযোগ ঘটে নি কখনও। কিন্তু এবাদ ডাকাতকে ঘিরে অজস্র গল্প-গাথা শুনেছি লোকমুখে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের তিস্তা তীরবর্তী গ্রামগুলিতে জীবন্ত কিংবদন্তীর মতো উত্থান ঘটেছিল এবাদ ডাকাতের। সেই নায়কের এমন করুণ পরিণতি দেখে আমি বেজায় চমকে উঠেছিলাম। অদম্য আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে বসেছিলাম তার পাশে।

কিন্তু এবাদ ডাকাত তখন এলাকাবাসীর কাছে অনেক পুরনো ঘটনার স্মারক চিহ্ন মাত্র এবং হাটখোলার বাজারের নিত্যদিনের এক চেনা দৃশ্য। এবাদের ছেলে হাটখোলার স্কুলে পড়ত। স্কুলে আসার সময় লাঠি ধরে অন্ধ পিতাকে সে-ই প্রতিদিন বাজারে টেনে এনে চায়ের দেকানে বসিয়ে দিত। ছেলের স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত বাজারে চায়ের দোকানেই বসে থাকত এবাদ। কেউ চা-পান-সিগারেট সাধলে না করত না, চেনা লোকদের কাছে চেয়েচিন্তেও খেত অনেক সময়। তার কথা হাসিমস্করা সবাইকে বুঝিয়ে দিত— অন্ধ হলেও এখনও মরে নি এবাদ ডাকাত। চশমা খুললে এবাদ ডাকাতকে দেখে শিউরে উঠবে না— এমন সুস্থ লোক কম আছে। চোখের জায়গায় গোলাপি রঙের দুটি গর্ত। চশমা ঢাকা মুখেও এসিড-পোড়া দাগ ছিল ডান ভ্রূ ও বাম দিকের গালে। কিন্তু মুখ, গোঁফ, দাঁত ও হাসি ছিল আগের মতো। চোখের যন্ত্রণায় কিংবা মনে কী যে দুরভিসন্ধি নিয়ে কে জানে, মাঝে মাঝে চশমার কালো পিচ রঙ গলে পড়ত মুখে। তখন চুপচাপ বসে থাকত এবাদ, আর দাঁত দিয়ে গোঁফ কাটত।

বাড়িতে ফেরার সময় বালক পুত্র আবার অন্ধ পিতাকে টেনে নিয়ে যেত বাড়িতে। অনেক সময় লাঠি ঠকঠকিয়ে একা একাও হাঁটাচলা করত এবাদ। শুধু চোখের জন্যে নয়, পায়ের কারণেও হাঁটার ভঙ্গি পাল্টে গিয়েছিল তার। ভাঙা পায়ের হাড়ে স্ক্রু দিয়ে জোড়া দেয়া হয়েছিল। ফলে ডান হাঁটুতে ভাঁজ প্রায় না ফেলে, খুব আস্তে আস্তে হাঁটত এবাদ।

শহরের হাসপাতাল থেকে তিন মাস পর বেঁচেবর্তে ফিরে আসার পর তাকে দেখার জন্য গ্রামে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড গণপিটুনির পরও দৃষ্টিহীন পা-ভাঙা এবাদ ডাকাতের বেঁচে থাকা ভয় ধরিয়েছিল অনেকের মনে। লোকেরা বলাবলি করত, চোখ নেই তো কী হয়েছে! প্রাণে বেঁচে আছে যখন, প্রতিশোধ না নিয়ে সে ছাড়বে না। নিজে অস্ত্র চালাতে পারবে না, কিন্তু তার সর্বহারা বাহিনীর ছেলেরা তো নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লোকদের এরকম ধারনার মধ্যে, অন্ধ এবাদ যখন লাঠি হাতে বাজারের চায়ের দোকানে আসতে শুরু করল, তাকে মারার ঘটনার সাথে জড়িত লোকেরা ভয়ে কাছে ঘেঁষত না। ডাকাত খতমের নায়কেরা এবাদ হাসপাতালে যাওয়ার পর অনেকদিন পুলিশের ভয়ে বাড়ি-ছাড়া ছিল। এবাদ থানায় কারো নামে কেস দেয় নি এবং কেস দেবে না— নিশ্চিত হওয়ার পর তারা গ্রামে ফিরেছে। কিন্তু এবাদের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় থেকে তারা মুক্ত হতে পারে নি অনেক দিন।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার মাসখানেক পর চায়ের দোকানে গুড়াতি ঘটকের সঙ্গে এবাদের সাক্ষাৎকারটি হাটখোলায় নতুন করে কিছুটা উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল। গুড়াতি এসেছিল এবাদ ডাকাতকে দেখার জন্য। এবাদ যথারীতি চায়ের দোকানে বসে ছিল

www.pathagar.com

চুপচাপ। এবাদকে দূর থেকে দেখে, তার কথা শুনে স্বগত মন্তব্য করেছিল গুড়াতি ঘটক, এত ডাং খাওয়ার পরে আন্ধা হয়াও ডাকাইতটার ডাট কমে নাই। আল্লা উহার জানটা কী দিয়া বানাইছে বাহে!

চায়ের দোকানের বাইরে গুড়াতির কণ্ঠ শুনে কান খাড়া হয়েছিল এবাদের। পরিচিত এক যুবককে অনুরোধ করেছিল, যেমন করেই হোক গুড়াতিকে তার কাছে ধরে আনার জন্যে। চা খাওয়ানো এবং জরুরি কথা বলার ছল করে ছেলেটি গুড়াতিকে টেনে এনেছিল স্টলের ভেতর। এবাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে ভেতরে এসেছিল লোকটা। কিন্তু চা খাওয়া আর হয় নি। এবাদ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার আগেই টেবিল উল্টে দিয়ে ভো দৌড়। পেছন থেকে এবাদ অনেক ডেকেছে, হেসে অভয় দিয়েছে, কিন্তু গুড়াতি ঘটক আর ফিরেও তাকায় নি।

যারা ভাবত— প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবাদ হাটখোলায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে, এবাদের কোমরে গোপন অস্ত্র থাকার ব্যাপারেও ঘোরতর সন্দেহ ছিল তাদের। বাজি ধরেছিল কেউ কেউ। অতঃপর একদিন কয়েকজন মিলে ঠাট্টা-মস্করার ভঙ্গিতে এবাদের জামা-কাপড়-শরীর হাতিয়ে দেখে আতঙ্কমুক্ত হয়েছে সবাই। শত্রু-মিত্র চিনতে পারে না, সে অস্ত্র রেখে করবেই বা কী! তবে চোখ উপড়ে নেয়ার পরেও একদিন এবাদ পূর্বের এবাদ ডাকাতের মতো দুঃসাহসী কথা বলার অপরাধে একজন তার গালে দুটি চড় মেরেছিল, কিন্তু পাল্টা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে নি এবাদ। আহত গালে হাত রেখে কালো চশমা মেলে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল শুধু।

এরপর এবাদ ডাকাতকে ঘিরে লোকজনের ভয়, ঘৃণা ও প্রতিহিংসা দিনে দিনে কমে গেছে। কারণ লোকের দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে কোনোমতে দিন গুজরাণ ছাড়া কিছুই করার ছিল না অন্ধ এবাদের।

চায়ের দোকানে এককালের দুর্ধর্ষ এবাদ ডাকাতকে দেখে আমার যত আগ্রহ ও কৌতূহল জেগেছিল, আমার পরিচয় পেয়েও তেমনি আগ্রহে জ্বলে উঠেছিল এবাদ। আমার সঙ্গী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই যে এবাদ ভাই, অমুকের ছেলে তমুক এসেছে, ঢাকায় থাকে, তোকে নিয়ে বই লিখবে। তাছাড়া তোর মুক্তার খবর ইনি সব জানে।

এবাদ আমার হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলেছিল, বহুদিন পরে দেখা। আপনার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে। এখানে হবে না, চলেন বাইরে কোথাও নিরিবিলিতে গিয়ে বসি।

ঠিক আছে, আমি আপনার বাড়িতে যাব। তখন সব কথা হবে।

ঠাকুরপাড়ায় এবাদের বাড়িতে গিয়েও আমি চমকে উঠেছি। কারণ এবাদের মতো তার বাড়ির চেহারাও বেশ পাল্টে গেছে। বছরখানেক হলো মারা গেছে এবাদের মা। কোবাদ বাড়িতে নেই। হাসপাতাল থেকে ভাইকে সুস্থ করে বাড়িতে আনার পর নিজেই বাড়িছাড়া হয়েছে সে। কোথায় থাকে, কী চাকরি করে ছোট ভাই— এবাদ সঠিক জানে না। পেয়ারি দুই সন্তান নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে সংসার করছে মন দিয়ে। ছোট্ট ভিটায় একটি ঘর ছাড়া নিজের বলতে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না এবাদের। নূরীর মা নামে এক সর্বস্ব হারানো ভিখিরিণি আগলে রেখেছে কানা এবাদের ঘর-সংসার। আকালের সময় এবাদ ডাকাত অনেক সাহায্য করেছিল নূরীর মাকে। সেই ঋণ শোধ করতেই যেন নূরীর মা ফকিরনী আশ্রয় নিয়েছে

www.pathagar.com

এবাদের বাড়িতে। এবাদ ও তার ছেলেকে রেঁধে খাওয়ায়। ঘরে চাল না থাকলে ভিক্ষা মাগতে দশ গ্রাম ঘোরে।

নূরীর মা ফকিরনীর সঙ্গে এবাদও একদিন ভিক্ষে করতে গিয়েছিল সজনা গাঁয়ে। আগে কোমরবাঁকা নূরীর মা, পিছে লাঠি হাতে কানা এবাদ। কিন্তু এবাদের ফকির বেশ সহজে মেনে নিতে পারে নি সজনার বড়বাড়ির লোকেরা। ভিক্ষে দেয়া দূরে থাক, গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল দু'জনকেই।

সেই ঘটনার সূত্র ধরে আমি জানতে চেয়েছিলাম, মুক্তার সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি? সে ছিল না বাড়িতে?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দিয়েছে এবাদ, না। মুক্তাকে দেখার জন্যেই তো বেহায়া ফকির সেজে শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হয় নাই।

মুক্তা সেই যে আপনাকে নিয়ে হাসপাতালে গেল, তারপর আর কখনও দেখা হয় নি?

অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি তো শুধু মুক্তাকেই দেখি, কিন্তু সে আমাকে একবারও দেখতে আসে নি।

কেন?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা কেউ দিতে পারি না। নীরব থেকে দু'জনই হয়তো সেই মেয়েটির কথা ভাবি।

মুক্তা এখন কোথায় আছে জানেন?

হ্যাঁ জানি। বছরখানেক হলো তার বিয়ে হয়েছে। ছেলে ঢাকায় চাকরি করে। সুখেই আছে মুক্তা। আমি তার বাসার ঠিকানাও যোগাড় করেছি।

এরপর এবাদের ভেতরে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। আমার হাত চেপে ধরে আকুল কণ্ঠে বলতে থাকে, 'আপনি আমার একটা উপকার করেন, হাতে পায়ে ধরি আপনার, এক অন্ধ অসহায় মানুষের শেষ মিনতিটুকু রাখেন— মুক্তার সঙ্গে আমার একবার, শুধু একবার দেখা করার ব্যবস্থা করে দেন আপনি।

এবাদের এই আবেগময় আকাঙ্ক্ষার উৎস আমি জানি না। মুক্তার সঙ্গে একবার দেখা করে কী লাভ হবে, কী কথা সে বলতে চায়, নাকি প্রতিশোধ নিতে চায়— এসব প্রশ্ন তাকে করা হয় না। কারণ এবাদ ডাকাতের এই অন্তিম ইচ্ছা পূরণের সাধ বা সাধ্য কোনোটাই ছিল না এই লেখকের।

www.pathagar.com

জন্ম : ১৭ ভাদ্র, ১৩৬০, রংপুরে।

সাহিত্য সাধনাকে জীবনের প্রধান ব্রত করে লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন সত্তর দশকে। ১৯৮২ সালে প্রথম গ্রন্থ 'অবিনাশী আয়োজন' প্রকাশিত হলে ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক হিসেবে অর্জন করেন ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার।

অজস্র লিখে শুধুই বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি বা সাময়িক বাজার দখলের পক্ষপাতী নন তিনি। বরং নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অঙ্গীকারের প্রতি সৎ থেকে লেখায় বৈচিত্র্য ও গুণগত মান অর্জনে বিশ্বাসী। এ যাবত কথা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য যথাক্রমে বাংলা একাডেমী, ফিলিপস ও আলাওল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শিশুতোষ গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : উপন্যাস— তমস, নগ্ন আগন্তুক, প্রতিমা উপাখ্যান, আবাসভূমি, দাঁড়াবার জায়গা, ভাঙনের সময় ভালোবাসা, ফুল খেলা। গল্পগ্রন্থ—অবিনাশী আয়োজন, মৃত্যুবাণ, উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা, অপারেশন জয় বাংলা। শিশুতোষ গ্রন্থ— ছোট্ট এক বীর পুরুষ, যুদ্ধে যাওয়ার সময়, নান্টুর মেলা দেখা।

www.pathagar.com